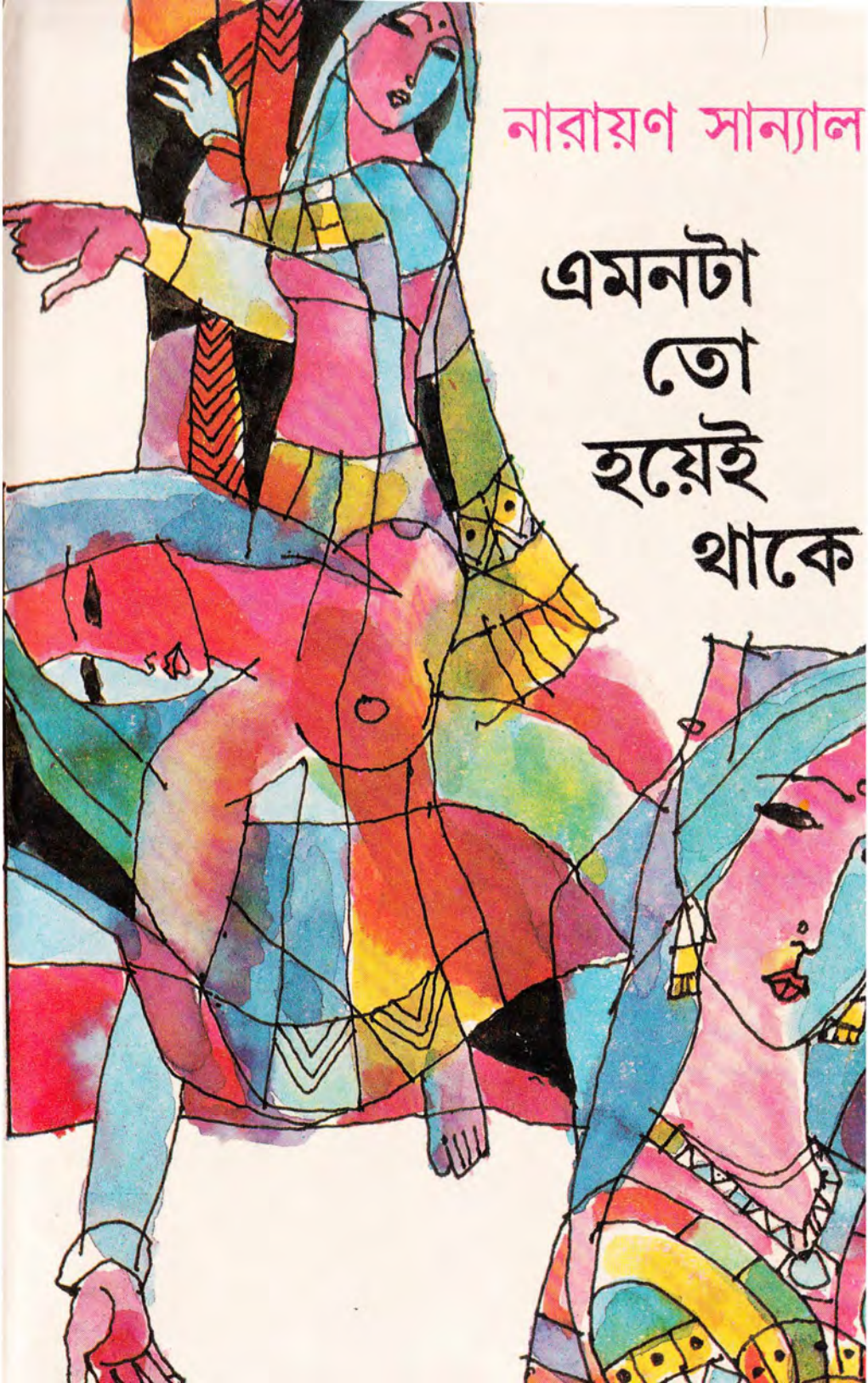
নারায়ণ সান্যাল

এমনটা তো হয়েই থাকে



‘এমনটা তো হয়েই থাকে’

নারায়ণ সান্যাল

দে’জ পাবলিশিং ।। কলকাতা 700 073

EMONTATO HOYEI THAKE
by NARAYAN SANYAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 100.00

ISBN 978-81-295-1510-0

রচনাকাল : মে-জুন 1992
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি 1993, মাঘ ১৩৯৯
পঞ্চম সংস্করণ : মে 2012, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

গ্রন্থ-ক্রমিক : 91
প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র
অলঙ্করণ : সুধীর মৈত্র ও লেখক
প্রুফ নিরীক্ষা : শ্রীমতী সুচিত্রা সান্যাল ও সুবাস মৈত্র

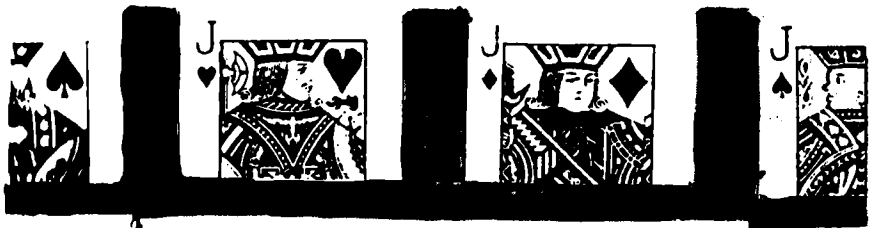
১০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কম্পোজিশান : প্রেস সিসেম
৪১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩



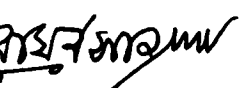
।। উৎসর্গ ।।

পার্টিগত, পরিবারগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে সংবিধানকে কব্জা করে যাঁরা 'রাজনীতি-ব্যবসায়ে' মুনাফা লুটছেন— কী ডান, কী বাম—তাঁদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে স্বাধীন ভারতে যাঁরা অপ্রত্যক্ষ-সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, যেমন :

- সফদার হাশমি, নাট্যশিল্পী, নাট্যকার
- বিজন বসু, এঞ্জিনিয়ার
- ডাক্তার শ্যামাপদ রায়চৌধুরী, চিকিৎসক
- বিনোদ মেহ্‌তা, ডি. সি. পোর্ট
- ঐ অফিসারের মৃত্যুঞ্জয়ী দেহরক্ষী
- মুক্তি সেন, ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার
- অনিতা ধাওয়ান, স্বাস্থ্যদপ্তরের অফিসার
- অবনী জোয়াদ্দার, সরকারী-গাড়ির চালক
- শঙ্কর গুহ-নিয়োগী, আদর্শ শ্রমিকদরদী

এবং আরও অনেকে যাঁদের কথা জানতে পারিনি, যাঁরা 'Unsung, Unwept, Unlamented' অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন.....
তাঁদের উদ্দেশে

শ্রদ্ধাবনম্র



31.12.92

।। কৈফিয়ৎ ।।

দুটি গতরে-সতরে কিস্‌সাকে গাঁটছড়ায় বেঁধে একই কেতাব-কারাগারে বন্দী করা ফেলা এ অধম কথাসাহিত্যিকের তরফে কোনও 'নবীন কায় নায়' —মানে, নতুন-কথা নয়। এমনটা তো হতেই পারে। হয়েছেও। যেমন ধরুন ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'প্রবঞ্চক'। ব্যাপারটা কী জানেন? দু-দুজন সাময়িকীর নাছোড়বান্দা সম্পাদক আছেন যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে 'মনসুন' এসে পৌঁছানোর আগেই আমকে পত্রবাণে বিদ্ধ করেন: পূজাসংখ্যার জন্য উপন্যাস লেখার তাগাদায়। 'উপন্যাস' অবশ্য এখানে একটা যোগরূঢ় শব্দ। অর্থাৎ আন্দাজ বিশ-হাজার শব্দের বড় গল্প।

এ বছরও তাই হল। ফেঁদে ফেললাম দুটি কাহিনী। 'নবকল্লোল' আর 'প্রসাদ'-এর জন্য। দুটি কাহিনীই পুরাতন(?) ভারতের দুই প্রান্তের; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখি, দুটি একই মেজাজের। দুটিতেই আছেন পরাধীন ভারতের দু-জন মহাপরাক্রমশালী গদিয়াল ব্যভিচারী দুঃশাসক। কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যে তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে চরম অপশাসন করে গেছেন। রাজনৈতিক ঝামেলা এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার এদের 'দুঃশাসকতা' দেখেও দেখতেন না। কিন্তু একই মেজাজের এমন দুটি কিস্‌সা কেন পয়দা করল আমার কলম?

প্রাক্-পূজাকালে—সেই যখন পশ্চিমবঙ্গের আকাশখানি ছিল ঘন কালো মেঘে ছাওয়া, মাঝে মাঝে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ত আকাশের অশ্রু, দিগন্তের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে গুমরে মরত মেঘগর্জনের বুকচাপা ফরিয়াদ, তখন আমার কী জানি কেন মনে হয়েছিল একটা কথা: দেশের যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের নির্বাচিত কর্তা তাঁরা এই স্থবিরা বিংশশতাব্দীর অন্তিম দশকটাকে বুঝি চিহ্নিত করেছেন 'নারীনির্যাতন দশক' হিসাবে। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলেই দেখতে পাই গদিয়াল দুঃশাসনের হাসি-হাসি মুখ— দ্রৌপদীর বস্ত্রাপহরণের উল্লাসে উচ্ছ্বসিত। কারও হিম্মৎ নেই প্রতিরোদ করার। পথে-প্রান্তে, স্টেশনে, পুলিসথানার ভিতরে বিবস্ত্রা ধর্ষিতা দ্রৌপদীর দল আর্তনাদ করছে, অশ্রু ও রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, আর তারপর, কী আশ্চর্য—কী অপরিসীম আশ্চর্য—'বামি'র হাতের দীপশিখাটির মতো তারা চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। যদি কোনও দুঃসাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে: এ সব কী হচ্ছে?

শোনে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর: নবীন কায় নায়! অসহ্ ঝালে অন্তে!

: নতুন কথা কিছু নয়। এমনটা তো হয়েই থাকে।

'নারী-নির্যাতন দশক'-এর অশুভ উদ্বোধন: বানতলায়।

ত্রিশে মে, 1990— দশকের বয়স তখন মাত্র পাঁচ মাস।

ক্যানিবল-অধ্যুষিত গভীর অরণ্য নয়। ক্যাডার-অধ্যুষিত কল্লোলিনী কলকাতার উপকণ্ঠে একটি গ্রাম। একটা সরকারী মারুতি ম্যাটাডর ভ্যান চালিয়ে শহরে ফিরছিল সরকারী ড্রাইভার, অবনী জোয়াদ্দার। গাড়ির ভিতর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তরের একজন মহিলা অফিসার, কেন্দ্রীয় সরকারের আর একজন মহিলা অফিসার এবং গাড়ির বাইরে প্রকাণ্ড রেডক্রস্-চিহ্ন, তদুপরি বিজ্ঞপ্তি— এটি স্বাস্থ্যবিভাগের সরকারী গাড়ি। বানতলায় সেদিন হাট হচ্ছে। হাটের মাঝখানে কে বা কারা, কী-জানি কার গোপন নির্দেশে, মার-মার করে তেড়ে এল। অবনী ঐ নারীমাংসলোলুপদের থাবা থেকে তার সওয়ারদের প্রাণে বাঁচাতে জোরে গাড়ি ছোটালো; কিন্তু পালাতে পারল না। প্রচণ্ড ইষ্টকবর্ষণে সে দিশেহারা হয়ে পড়ায় বাঁকের মুখে গাড়ি উল্টে গেল। ক্যানিবলরা দলে দলে ছুটে এল। সরকারী ছাপমারা গাড়ি থেকে হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নামালো তিনজন আরোহীকে। মহিলা দুজনকে বিবস্ত্রা করে হত্যা করতে চাইল ওরা— একজন অবশ্য পরে প্রাণে বেঁচে যান। অনিতা ধাওয়ান নিহত হন ঘটনাস্থলে। অবনীকেও ওরা হত্যা করে।

হাটের মাঝখানে এই নারকীয় অপ্রতিবাদ-বীভৎসতা বোধ করি নারী-নির্যাতনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। সমস্ত দেশ— শিশু থেকে বৃদ্ধ, আমীর থেকে ফকির, সি. পি. এম. থেকে কংগ্রেস, যখন পরদিন ধিক্কারে মুখর, তখন দেখা গেল একটিমাত্র হাসিমুখ ব্যতিক্রম। এ রাজ্যের যিনি নির্বাচিত শাসক তিনি সাংবাদিকদের বললেন: 'এমনটা তো হয়েই থাকে।'

পরদিন—একমাত্র-ব্যতিক্রম বাদে—প্রতিটি সংবাদপত্র ঐ মতামতটি মুদ্রিত করল 'উইদিন কোট্স্'। বক্তা নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

তার পরদিন শাসকদলের নিজস্ব পার্টি-পেপারে ছাপা হল: মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু নাকি 'ও-কথা' বলেননি। সংবাদিককেরা সবাই হয় ভুল শুনেছেন অথবা সজ্ঞানে বানিয়ে-বানিয়ে মিছে কথা লিখেছেন!

বুর্জোয়া-মালিকানার সাংবাদিক বনাম নির্বাচিত কমরেড মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশ্ন হল: সচ্ বাৎ বলার হকদার কোন্ জন? কাকে বিশ্বাস করব?

শেক্সপীয়ার তাঁর 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় চারশ বছর আগেই লিখে গেছেন: Yet, Brutus... is an honourable man! বটেই তো! রোমান সেনেটার ব্রুটাস ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁর উক্তি—' পদাধিকারবলে— বেদবাক্য।

কিন্তু মুশ্কিল হল এই— আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, একই যুক্তিতে যিনি পদাধিকারবলে বেদবাক্য-বলার হকদার— সেই শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অমৃতবাজার পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন:

> After the gruesome Bantala incident Mr. Jyoti Basu, passing through Calcutta just for a day while returning from Vietnam and going to attend the lavish display staged for pampering his ego by feudal Bhutan, made a casual statement to the Press to the effect that there was nothing unusual about the incidents which had just happened at Bantala. If this is not open instigation to criminal and antisocial elements, I do not know what is."

অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঐ বাক্যটি বলেছেন এবং তার মূল উদ্দেশ্য: বানতলায় শাসকদলের যেসব অপরাধজীবী বন্ধু আছেন তাঁদের আড়াল করা, রক্ষা করা।

বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির সাংবাদিকেরা সবাই দলবেঁধে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ইচ্ছামতো শব্দ বসিয়েছেন কি না সেটা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা শক্ত। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে প্যারেড-গ্রাউন্ডে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বামফ্রন্ট আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এবং 1.12.92 তারিখে 'বর্তমান' পত্রিকায় শ্রীবরুণ সেনগুপ্তের জবাব। 'বর্তমান' পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের কয়েক জনের রাতারাতি কুবের-ঈর্ষিত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়ার বিষয়ে নানান রিপোর্ট ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছে। প্যারেড-গ্রাউন্ডের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন; 'বর্তমান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত রাজ্যসরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই এই প্রতিক্রিয়া। পয়লা ডিসেম্বর 'বর্তমান'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় বরুণ সেনগুপ্তর একটি চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয় "ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বরুণ সেনগুপ্তর জবাব"। প্রবন্ধটির সাব-হেডিং ছিল, "বয়স যত হচ্ছে তত আপনার মিছে কথা বলার অভ্যাস বাড়ছে কেন?" বরুণবাবু প্রসঙ্গত লিখেছেন:

> জ্যোতিবাবু, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস্‌কে লিখুন একটা কমিশন বসাতে। সেখানে আপনি আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ পাঠান। আর, আমি শুধু আপনার তিনজন আত্মীয়ের 'বিড়ম্বনা' হওয়ার কাহিনী জানাব্ সেই কমিশনকে। সেই কমিশন তদন্ত করবে। যদি দেখা যায়, 'বর্তমান' ও আমার সম্পর্কে আপনার অভিযোগ সত্য; জ্যোতিবাবু, তাহলে আমি আপনার ছেলে চন্দন বসুর নামে 'বর্তমান' কাগজের সব সম্পত্তি লিখে দেব। আর যদি দেখা যায় আমার অভিযোগগুলি সত্য, তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন তো?"
>
> লিখেছে:, "আমরা তো অন্য যে কোন সমবয়স্ক বাংলা কাগজের চেয়ে বছরে গড়ে পনের লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন কম পাই। কৈ, বুদ্ধদেববাবু বা তাঁর পরিবারের দুর্নীতি নিয়ে আমরা কি কোনদিন লিখেছি? লিখেছি:

ওঁর আত্মীয়স্বজন সব কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন? না, তা আমরা লিখিনি। জ্যোতিবাবু, কেউ চুরি না করলে তাঁকে চোর বলব কেন? বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরিবার টাকা বানাবার ধান্দায় রাজনীতিতে নামেননি। কিন্তু আপনার পরিবারের লোকজন কোটি কোটি টাকা বানাবার ধান্দায় নেমেছেন। আর গত ষোলো বছরে তাঁদের দু-একজন বিড়লাদের মতো ধনবান হয়ে উঠেছেন। জ্যোতিবাবু, একজনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সুযোগে ও সেই মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যে তাঁর পরিবারের লোকজন যদি কোটি কোটি টাকা বানান তাহলে খবরের কাগজ তা লিখবে না? জ্যোতিবাবু, তাহলে খবরের কাগজ চালানো কেন? খবরের কাগজের কী দরকার?

মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এ চ্যালেঞ্জের কোনও জবাবই দেননি। স্রেফ উপেক্ষা!

সেই নীরবতার পশ্চাৎপটে আমরা দেখছি, কমরেড বসুর সুশাসনে এই পশ্চিমবঙ্গের আকাশ থেকে সব কালিমা ক্রমে ক্রমে মুছে যাচ্ছে, বিদ্যুৎচমক বন্ধ, মেঘগর্জন বেআইনি! দিনে দিনে সার্থক হচ্ছে রবিঠাকুরের সেই বাণী:

"নীলগগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা!"

আসল কথা: কে কী বলেছেন সেটা নয়। আসল কথা: মানুষে কী বিশ্বাস করেছে। মারী আঁতোনিয়েৎ বলেছেন-কি-বলেননি এটা অবান্তর। তাঁর আচরণ থেকে লোকগাথা কথাটা বিশ্বাস করেছে। হেলিকপ্টারপ্রতিম প্রাসাদচূড়ার উচ্চতায় বসে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'রুটি, ফুরিয়েছে তাতে কী? ওরা রুটির বদলে কেক খেলেই পারে।' চতুর্দশ লুই বলেছেন-কি-বলেননি সেটা অবান্তর। ইতিহাস বিশ্বাস করেছে দুঃশাসকের সেই অনবদ্য উক্তিটি: আমার শাসনকালের পরে দুর্ভিক্ষই আসুক, অথবা মহামারী, প্লাবন—আমি ভ্রূক্ষেপ করিনা।

পার্টি কাগজ যাই বলুক, সারা পশ্চিমবঙ্গ কথাটা বিশ্বাস করেছে: এমনটা তো হয়েই থাকে!

একটা ঘটনার কথা বলি।

ডব্‌ল্‌-ডেকার বাসখানা রাজাবাজার অতিক্রম করার পর একটি রাজনৈতিক পার্টির কিছু কর্মী বাসের ভিতর কালেক্‌শন করতে উঠল— কিউবার নিপীড়িত জনগণের সাহায্যে—'ফান্ড'। এক বৃদ্ধের নাকের ডগায় পার্টি-ক্যাডার যখন লালপতাকা-আঁকা বাক্সটা মেলে ধরল তখন বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, "কিউবা"-র জন্য আমি কলকাতায় বসে চাঁদা দেব কেন? সেখানে কী এমন হয়েছে? কর্মীছেলেটি অবাক হয়ে বললে, "সে কী! আপনি জানেন না? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পাশবশক্তি কিউবার উপর কী নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে, তা শোনেননি?" বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বললেন, "এ আর নতুন কথা কী, বাবা, পাশবশক্তি যার আছে সে তো দুর্বলের উপর পৈশাচিক আক্রমণ করবেই! বানতলায় দেখনি? এমনটা তো হয়েই থাকে।"

এলাকাটা পার্টির কব্জায়। অথচ ছেলে দুটি মাথা নিচু করে বিনাবাক্যব্যয়ে বাস থেকে নেমে গেল। তাই আশঙ্কা হয় — সবাই কথাটা বিশ্বাস করেছে।

পরাধীন ভারতে 'বাওলা-মার্ডার কেস'-এ — আপনারা এখনি দেখবেন — শাসকদল-নিয়োজিত তিন-তিনটি অপরাধজীবীকে ফাঁসির দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই কিন্তু ঐ পৈশাচিক নাটকের যবনিকাপাত ঘটেনি। যে দুঃশাসকের নেপথ্য-ইঙ্গিতে ঐ তিনটি ভাড়াটে গুণ্ডা হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত করেছিল সেই মূল নিয়ামক গদিয়ালটিকে প্রায় কানে ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল বিদেশী সরকার। আর আজ স্বাধীন ভারতে?

বানতলায় ফৌজদারী মামলার অবসানে তিন-তিনটি অপরাধী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। ঐ ফৌজদারী মামলার অবসানের পর দত্ত-কমিশন বর্তমানে তদন্ত করে চলেছেন: কেন এমনটা ঘটল। চৌদ্দই নভেম্বর '92 আনন্দবাজার থেকে কিছু উদ্ধৃতি শোনাই:

> "তিলজলা থানার কিছু পুলিশ-অফিসার বানতলায় নারী-নির্যাতনের ঘটনার পরে ও. সি.-র কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, দত্ত-কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে তাঁরা সেই বিবৃতির অংশবিশেষ অস্বীকার করেছেন বলে তিলজলা থানার ও. সি. অমল বিশ্বাস শুক্রবার কমিশনের সামনে জানিয়েছেন। তিনি জানান, আদালতে ঐ ঘটনা নিয়ে ফৌজদারী মামলা চলার সময় তিলজলা থানার পুলিশ অফিসারেরা তাঁদের আগেকার বিবৃতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এখন কেন দত্ত-কমিশনের সামনে তাঁর থানার অফিসারেরা আগেকার বিবৃতি অস্বীকার করেছেন, তার কোন জবাব ঐ ও. সি. দিতে পারেননি।...
>
> "পুলিশ অফিসারেরাও এইভাবে নিজেদের লিখিত বিবৃতি অস্বীকার করে অভিযুক্তদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন কি না, সরকারি আইনজীবী ও. সি.র কাছে তা জানতে চান। অমল বিশ্বাস তা অস্বীকার করলেও কেন যে পুলিশকর্মীরা তাঁদের আগেকার বিবৃতি থেকে সরে এলেন, তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।.....
>
> "মারুতি ভ্যানটি যে স্বাস্থ্য-দপ্তরের এবং তা যে পরিবার-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত, তা বুঝেও সেটিকে আক্রমণ করার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে, তা ও. সি.-র কাছে জানতে চান কমিশনের আইনজীবী।... ইউনিসেফ-এর সরবরাহ করা ওষুধ চুরি হয়ে যাচ্ছে, এমন অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্য-দফতরের অফিসাররা যে সেদিন বানতলার দিকে তদন্তে যাচ্ছিলেন, সেরকম কোনও খবর তাঁর জানা ছিল না বলে জানান ও. সি.। তদন্তের মধ্যে তাঁরা তাই এই ব্যাপারটিকে আনেননি। বানতলার ঘটনার খবর থানায় প্রথম যিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই অরবিন্দ মণ্ডলের ভাই ভুলু মণ্ডলের আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে নারী-নির্যাতনের ঘটনার সম্পর্ক থাকার কথাও অস্বীকার করেন ও. সি.।"

ইউনিসেফের সরবরাহ-করা ওষুধ চুরি সম্বন্ধে বর্তমান সাহিত্যসেবীর মন্তব্য করার

কোনও অধিকার নেই। প্রথমত, রাজ্য প্রশাসন তদন্তের মধ্যে এই ব্যাপারটিকে আদৌ আনেননি, সে-রকম কোন খবর ওঁদের জানাই ছিল না; দ্বিতীয়ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুরারিমোহন দত্ত এ নিয়ে তদন্ত করছেন। ব্যাপারটা সাব-জুডিস্!

☆ ☆

সেপ্টেম্বর বিরানব্বই-এর তৃতীয় সপ্তাহ। অর্থাৎ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত দুটি কাহিনী রচনার পরবর্তীকালের ঘটনা কিন্তু বর্তমান 'কৈফিয়ৎ' রচনার পূর্বেকার একটি রাত্রি। ফুলবাগান থানায় কর্তব্যরত পুলিস, শ্রীনীলকমল ঘোষ-মহাশয়, তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় পুলিসের গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন একজন পথপ্রান্তের ঝুপড়ির বাসিন্দাকে। থানার ভিতর পাঁচ-সাতজনের সাহচর্যে তিনি সে রাত্রের ডিউটি সারলেন! গণধর্ষণ। পরদিন প্রত্যেকটি সংবাদপত্র প্রতিবাদে, ধিক্কারে মুখর। শুধু অবিচলিত আমাদের হাসিমুখ মুখ্যমন্ত্রী। এবার তিনি বললেন, "বিগত দশবছরে এমন ঘটনা নজিরবিহীন।" একই নিশ্বাসে মুখ্যমন্ত্রী ভূয়সী প্রশংসা করলেন পুলিস বাহিনীকে, কারণ পুলিস কমিশনার শ্রীতুষার তালুকদার থানার শ্রীঘোষ এবং অন্যান্য অপরাধীদের চট-জলদি গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। কী বীরত্ব! কী প্রশংসনীয় তৎপরতা! পুলিসরা চোরের কায়দায় পালাতে পারেনি!

কিন্তু ওটা কী বললেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী?

দশ বছরে এমন পুলিসী তাণ্ডব আর ঘটেনি?

স্মৃতিবিভ্রম সন্দেহ নেই। কারণ শেক্সপীয়ার বলে গেছেন, Yet, Brutus... is an honourable man....

বানতলার নৃশংস ঘটনার পরের সপ্তাহে সাতই জুন হুগলীর সিঙুর থানার ঘটনাটার কথা কি মনে পড়ল না কমরেড বসুর?

কাকলী সাঁতরা। বয়স একুশ। সাতই জুন সন্ধ্যায় সিঙুর থানায় এসেছিল কী-একটা এজাহার দিতে। কর্তব্যরত য়ুনিফর্মধারী পুলিস পেল মওকা। ওকে বলল, ভিতরের ঘরে এস, ডায়েরি লেখাতে হবে। ব্যাস! পুরো দুটি দিন— আটচল্লিশ ঘন্টা, থানার বিভিন্ন পুলিস অফিসার ও পুলিসকর্মী পর্যায়ক্রমে ঐ নারীদেহটা দলিত-মথিত করে। কতজন পুলিস তা কাকলী পরে মনে করতে পারেনি। বোধকরি মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য ছোটগল্প 'দ্রৌপদীর' নায়িকা গুণে বলতে পারত, কতজন পুলিস। নয় তারিখ দুপুরে মেয়েটির জীবনাশংকা দেখা দেওয়ায় বর্বরদল ক্ষান্ত হয়। কারও নাম বললে খুন করে ফেলা হবে বলে শাসিয়ে কাকলীকে ওরা স্ট্রেচারে করে পৌঁছে দেয় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুকে জানানো হয় মেয়েটি পাগল এবং অজ্ঞাতপরিচয় কর্তৃক ধর্ষিতা। ডাক্তারবাবু কাকলীর অবস্থা খারাপ দেখে তাকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এগারো তারিখে। সেই সদর হাসপাতালের মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসক

কাকলীকে পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে, কাকলীর বিন্দুমাত্র পাগলামির লক্ষণ নেই মানসিক দিক থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুস্থ— দেহ অবশ্য ক্ষতবিক্ষত।

কাকলীর মর্মন্তুদ নির্যাতন-কাহিনী জানাজানি হয়ে যাওয়ায় প্রায় হাজারখানেক লোকের একটা মিছিল থানার সামনে জমায়েত হয়, প্রতিবাদ জানাতে। পুলিস যথারীতি গুলি চালায়। বিশ বছরের একটি তরুণ গুলিতে নিহত হয়। জনা-ত্রিশেক আহত। স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিবাদে 'বন্‌ধ্‌' ডাকে। এই বন্‌ধ্‌-এ সামিল হয় ফরোয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি। স্থানীয় সি. পি. আই(এম.) পার্টিও। বাধ্য হয়ে পাঁচজন পুলিসকে সাসপেন্ড করা হয়। তার ভিতর ছিলেন ঐ থানার ও.সি.ও।

স্থানীয় জনগণের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ প্রশমিত হল। বছর ঘুরল। তারপর এ বছর কেসটা তুলে নেওয়া হয়। হেতু? প্রথমত, বলাৎকার যে করা হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবু রোগিণীর দেহে বলাৎকার-চিহ্ন দেখেছেন বলে মৌখিক জবানবন্দি নিয়েছেন বটে কিন্তু —হুঁ হুঁ বাবা— লিখিত প্রাথমিক রিপোর্টে তো সেকথা লেখার হিম্মৎ হয়নি। সাংবাদিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ডাক্তারবাবু পরে বলেছিলেন, "I had to do this under pressure."

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্মরণে আসেনি এই ঘটনাটা, যখন তিনি বলেন, পুলিসের বিগত দশ বছরের ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেনি।

তারপর ধরুন, সিঙুর থানার ঐ ঘটনার পরের সপ্তাহের কথা। তারকেশ্বরে পুলিসের য়ুনিফর্ম পরা কন্সটেব্‌ল-অন-ডিউটি শ্রীপ্রশান্ত গুপ্ত যে কাণ্ডটা করলেন। তারকেশ্বর এস্টেটের আউটপোস্টের কাছাকাছি একটা পাকা বাড়ির রোয়াকে নিদ্রিতা ছিল একটি তীর্থযাত্রিণী। সে যুবতী এবং একাই এসেছিল কী-একটা মানত করায়। প্রশান্ত গুপ্ত মহাশয় মত্তাবস্থায় তাকে বলাৎকার করেন। প্রাথমিক এহাজারে তিনি অপরাধ স্বীকারও করেন। বাঁধা ফর্মুলা: তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড। বাঁধা ফর্মুলা: মামলা চলাকালে অভিযোগকারিণী মহিলাটিকে উপস্থিত করা যায়নি। যেন 'বামি'-র হাতের দীপশিখাটি।

অগত্যা সাস্‌পেনশন অর্ডার তুলে নিতে হল। ক্যা কিয়া যায়? অভিযোগকারিণী স্বয়ং যেখানে বেপাত্তা। মাননীয় প্রশান্ত গুপ্ত মহাশয় স্বপদে পুনঃবহাল হন। বকেয়া মাহিনা পেয়ে যান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতি থেকে এই মহিলাটিও নিঃশেষে মুছে গেছেন: 'হারিয়ে গেছি আমি!'

ওখানেই শেষ নয়। এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা। ধরুন গত বছর উনত্রিশে আগস্ট মেদিনীপুর জেলার কন্টাইয়ের ঘটনাটি। হোটেলের ঘরে পরপর পাঁচজন একটি নাবালিকাকে বলাৎকার করে। সংবাদে বলা হয়েছিল 'টীন-এজার'। পাঁচজনের ভিতর একজন ছিলেন ঐ এলাকার পুলিসের কর্তব্যরত অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর!

পরদিন এই ঘটনা নিয়ে কাঁথি শহর তোলপাড় হয়ে ওঠে। পুলিস চারজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও মেয়েটি ঐ অ্যাসিস্টেন্ট সাবইন্সপেক্টারকেও চিহ্নিত করে, তবু তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। দুর্জনে ব'লে, তার নাকি একটি বিশেষ হেতু ছিল।

খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। আলোচ্য আরক্ষা-পুংগবটি ছিল স্থানীয় নন্-গেজেটেড পুলিস কর্মচারী সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য; আর ঐ সমিতি হচ্ছে স্থানীয় সি.পি.আই.(এম.) দলের অনুগ্রহভাজন। সাব ডিভিশনাল পুলিস-অফিসার (SDPO) ও-কথায় কান না দিয়ে স্বয়ং সেই পুলিসটিকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগী হন এবং ঐ NGPKS-কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন!

একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে হাওড়ায় একটি থানার লক-আপে!

এবং এইতো সেদিন হাওড়া স্টেশনে। এবারেও নির্যাতিতা নিখোঁজ।

রাত তখন সাড়ে দশটা! মেয়েদের শৌচাগার থেকে বার হয়ে এলেন একটি যুবতী বধূ। সঙ্গে তাঁর ন-বছর বয়সের ননদ। কর্তব্যরত সাব-ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন খোঁজ-খবর নিতে। বাচ্চা মেয়েটাকে নিচে দাঁড় করিয়ে মহিলাটিকে সঙ্গে করে পুলিস-সাহেব দ্বিতলে উঠে এলেন। সেখানে কজন টিকিট-কালেকটারও উপস্থিত। মহিলাটির উপর পুলিস ও রেলকর্মী যৌথ বলাৎকারে সামিল হল।

রাত দেড়টার সময় একজন হোমগার্ড ক্রন্দনরতা মহিলাটিকে আবিষ্কার করে। হোমগার্ড দুটি মেয়েকে নিয়ে হাওড়া জি. আর. পি.-তে যান এফ. আই. আর. করাতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঐ সাব্ইন্সপেক্টর। তাঁকে সনাক্ত করেন মহিলাটি। কিন্তু উপস্থিত সব কজন পুলিস ভয় দেখায় এজাহার করলে 'জানে মেরে দেওয়া হবে'। ফলে সেরাত্রে এজাহার লেখানো যায় না।

পরদিন স্টেশনে বহু কুলী, হোমগার্ড, হকাররা দল বেঁধে হৈ চৈ শুরু করে। ফলে সিনিয়ার পুলিস অফিসার এসে সামাল দেন। দুজন টিকিট-কালেকটার এবং ঐ সাব-ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়।

কিন্তু ঐ: নবীন কায় নায়। নতুন কথা কিছু নয়! মহিলাটি পুলিসের ভয়ে না-পাত্তা। সবাই বেকসুর খালাস।

প্রশ্ন হচ্ছে: কীভাবে অবক্ষয়ের এই চূড়ান্ত নরকে উপনীত হতে পারে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী? কার নেপথ্য ঔদাসীন্যে? কার স্বার্থে? কেন?

ফুলবাগান-কেসের পর রাজ্য পুলিসের এক প্রাক্তন ডাইরেকটর-জেনারেল শ্রীঅরুণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিককে বলেন, "শাস্তির ভয়টা উবে গেলে একটা বেপরোয়াভাব দেখা দেয়, পুলিসবাহিনীতেও। তাই শাস্তিটা জরুরী। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। না হলে শৃঙ্খলা ভাঙবেই।" আর এক প্রাক্তন পুলিস কমিশনার শ্রীনিরুপম সোম নাকি ঐ সাংবাদিককেই বলেছিলেন, "ফুলবাগানের মতো ঘটনা কলকাতায় কখনো ঘটেনি। অপরাধীদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা উচিত।"

সাংবাদিক' এরপর বলছেন, 'নিরুপমবাবু এর বেশি কিছু বলতে না চাইলেও সম্ভবত তিনি নিজেও ভুলতে পারবেন না, খোদ লালবাজারে তাঁকে ঘিরে তাঁরই অধস্তন পুলিশ কর্মীদের বিক্ষোভের নামে তাঁকে চূড়ান্ত হেনস্থা ও অপমান করার ঘটনাটি। যেমন ভুলতে পারবেন না পুলিশ ব্যারাকে পুলিশের পদস্থ অফিসার কালী

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেল্ট খুলে দেওয়া, পার্থ ভট্টাচার্যের টুপি খুলে নেওয়ার মতো, পুলিশের ব্যারাকে ব্যারাকে পদস্থ অফিসারদের অপমানের কথাও। কোথাও তেমন সাজা হয়নি, কারও।'

কিন্তু হয়নি কেন? কেন এমনটা হল? ইংরেজ শাসকদের হাতে-গড়া অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এমন একটি বাহিনী তিল তিল করে কেন এমন বাধনছেঁড়া নীতিহীন হয়ে পড়ল?

☆ ☆

ফুলবাগান কেস-এর পর কলকাতার ট্রাফিক পুলিস প্রথম কদিন নানা ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিস ভারতের যে কোন রাজ্যের পুলিসের চেয়ে যোগ্যতার বিচারে কোন অংশে কম নয়। আজ তারা ঢোঁড়া সাপ; কিন্তু এককালে তাদের পূর্বসূরীরাই—প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে—ছিল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুলিস, শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা। তার হেতু সর্বভারতীয় মানদণ্ডে বঙ্গদেশেই ছিল শতাব্দীর প্রথমার্ধে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। আর তাই বিদেশী শাসক সেরা পুলিস-অফিসার, সেরা গোয়েন্দাদের সমবেত করেছিল কলকাতার কাছেপিঠে। যে ভাবে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, মেদিনীপুরের একাধিক বিপ্লবী, মুড়াগাছার বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতিকে পুলিস খুঁজে বার করে তাতে তাদের স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

তাহলে আজ তাদের এই চরম অবক্ষয়ের মূল হেতুটি কী?

পুলিসের পকেট মারলে, তার মাথা থেকে টুপি, মাজা থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিলে অসহায় পুলিস কিছু করতে পারে না। ক্যাবলার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে! কেন? তার হেতুটি মর্মান্তিক!

কিন্তু সেই মূল হেতু এবং অবক্ষয়ের ধারাবাহিকতার অনুসন্ধানের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার পুলিস কী পরিমাণে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে তার দু-চারটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এসব কাহিনী—কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা, তথ্য—আপনাদের জানা, তবু যেহেতু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তারা আর ফিরে আসে না, তাই আমরা সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভুলে যেতে বসেছি।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে 1986-এর বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঘটনাটি। ডাক্তার শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং তাঁর কন্যা দেবশ্রী ওরফে 'মৌ'-এর অন্তর্ধান। আজ থেকে বছর ছয়েক আগে ঐ মে মাসের ত্রিশ তারিখে দেবশ্রী নিখোঁজ হয়। পুরুলিয়ার মানবাজারের সত্যনারায়ণ সেনের সঙ্গে। শ্যামাপদবাবুর ধারণা হয়েছিল পুলিসের তা-বড় তা-বড় মহল জানে যে, ওঁর মেয়ে কোথায়। পুলিস ব্যর্থ হবার পর তিনি একক প্রচেষ্টায় কন্যার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন। গোটা পুলিস বাহিনী ব্যর্থ হলেও ডাক্তারবাবু একা সাফল্যলাভ করেন। মেয়ের

সন্ধান পাওয় যায়, কিন্তু পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে, চারজন পদস্থ পুলিসের উপস্থিতিতে চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে উদ্ধার পাওয়া দেবশ্রী ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। আত্মহত্যা করে। শ্যামাপদবাবু এ ঘটনাকে সাজানো বলে মনে করলেন, কারণ পুলিসের রিপোর্ট মোতাবেক অকুস্থলে তিনি এক সপ্তাহ কাল বহু খরচে তন্নতন্ন করে কন্যার কথাকথিত মৃতদেহ অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পুলিস কর্তাদের কাছে এ তথ্য জানান। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন। সি. আই. ডি. রিপোর্ট যে সাজানো, নির্জলা মিথ্যে, এ-কথা তাঁদের মুখের উপর বলে দিয়ে পুনরায় কন্যার সন্ধানে রওনা হয়ে পড়েন। উড়িষ্যা থেকে তিনি কী তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা আর জানা যায়নি। কারণ সেবার ফেরার পথে হাওড়ার একটি হোটেলে শ্যামাপদবাবুকে—কে বা-কারা—কোন উদ্দেশ্যে জানা যায় না— হত্যা করে বসে। এ নিয়ে শক্তিশালী চিত্র পরিচালক শ্রী তপন সিন্‌হা একটি অনবদ্য চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন। তার শেষদৃশ্যটা অবশ্য অন্যরকম— না হলে হয়তো সেন্‌সার আটকাত। সে ছবিতে তাই দক্ষ পুলিসদল অপরাধীকে ঘিরে ফেলে, গুলি* বিনিময়কালে সে হত হয়। সৌমিত্র—অর্থাৎ শ্যামাপদর ছায়া, তাঁর হারানো কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমরা চোখের জল সামলাতে পারিনি। বাস্তবে তা ঘটেনি আদৌ।

বাস্তবে ঐ প্রয়াত ডাক্তার শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর বিধবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি লিখেছেন অতি সাম্প্রতিক কালে (পশ্য, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার 29.11.92) যার মর্মার্থ : তাঁর প্রতি এই বামফ্রন্ট সরকার যেসব দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন সেজন্য তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। উপসংহারে তিনি বলেছেন, "আপনি প্রশাসন-বিভাগের পুরোধা, স্বাধীন ভারতের একজন গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসাবে আমার বিনীত অনুরোধ এবং দাবী আমার কেসটিকে এবার সি. বি. আই-কে দেওয়া হোক। এবং এর একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট আমাকে জানানো হোক। নমস্কারান্তে...."

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রাজ্য-পুলিস, পুলিস-প্রধান, পুলিসমন্ত্রী এবং প্রশাসন বিভাগের পুরোধার কর্মদক্ষতার বিষয়ে দেবশ্রী-জননীর আশাভরসার শেষ বিন্দুটিও নিঃশেষিত।

কিনারা হয়নি—অথবা কিনারার চেষ্টা করা হয়নি এমন অসংখ্য কেস একের পর এক তুলে ধরা যায়। দু-একটি অত্যুজ্জ্বল 'কেস'-এর নজির লিপিবদ্ধ করি :

---

*গুলিটি কিন্তু পুলিস নিক্ষিপ্ত নয়। সে নেপথ্যচারীর পরিচয় পরিচালক— সহজবোধ্য হেতুতে—দিতে পারেননি।

আপনারা নিশ্চয় জানেন, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে শহর কলকাতায়, পথ-দুর্ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যদিও লন্ডন-নিউইয়র্ক-টোকিও- পারীতে যে গড়-গতিতে গাড়ি দৌড়ায় কলকাতায় যায় তার এক-চতুর্থাংশ গড়-গতিতে। কারণ একাধিক। রাস্তা-মেরামতিতে গাফিলতি, গাড়ি চালক ও পথচারীদের আইন-শিকেয় তুলে রাখার মনোভাব, ট্রাফিক পুলিসের 'খৈনীব্রেক' ইত্যাদি। বোধ করি সবচেয়ে বড় অবদান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদাদের মদতে ফুটপাত-দখল-করা-স্টল-বানানো (প্রসঙ্গত, কম্যুনিস্ট দলের শাসনে ত্রিবান্দ্রম শহরে এ রকম ফুটপাত-দখল করা স্টল একটিও নেই)। ফলে পথচারীরা ফুটপাত ছেড়ে পথ দিয়ে চলে। তারা চাপা পড়ে। মরে।

তারপর বাঁধা ফর্মূলা। প্রথমে 'বন্‌ধ্'! ঐ রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করা হয়। পার্টির দাদারা আসেন। প্রতিশ্রুতি দেন ঐখানে একটি 'বাম্প্' বানানো হবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী হতে পারত? ব্যাস্! সব সমস্যার সমাধান। কলকাতা শহরে যে-কোন রাস্তায় 'বাম্প্' গুণে বলে দেওয়া যায়, কোথায়-কোথায় পথদুর্ঘটনায় কটি তাজা প্রাণের ক্ষয় হয়েছে।

নিহত মানুষটি পাড়ার প্রিয়জন হলে এর বিকল্প হিসাবে রাস্তার অংশবিশেষ ঐ নিহত মানুষটির নামে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, যেখানে প্রশাসনের হিমালয়ান্তিক অক্ষমতাকে চাপা দেওয়ার প্রয়োজন, সেখানে বড় রাস্তার নামটাই পাল্‌টে যায়।

এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ: বিজন সেতু।

কলকাতায় একাধিক সেতু: বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিজড়িত। কিন্তু 'বিজন-সেতু'? আপনারা হয়তো জানেন 'বিজন' কে, কেন সেতুটার ঐ নাম। আগামী প্রজন্ম কি তা জানবে? বোধহয় না। ধরুন আমার কথাই। আমার পাড়াতেই একটা রাস্তা আছে। শরৎ বোস রোডে অবস্থিত পদ্মপুকুরের কাছাকাছি। তার নাম 'আশু বিশ্বাস রোড'। এই ৺আশু বিশ্বাস যে কে ছিলেন অনেক সন্ধান করেও জানতে পারিনি।*

---

* আমি এক ৺আশু বিশ্বাসের সন্ধান রাখি, যিনি ঐ পদ্মপুকুর অঞ্চলেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে থাকতেন তিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত পাব্‌লিক প্রসিকিউটার। আমার ধারণা— ভুল হলেই আনন্দিত হব— বিদেশী শাসক তাঁর নামেই রাস্তাটা চিহ্নিত করেছিল। এই আশু বিশ্বাস একের-পর-এক বিপ্লবীদের ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে দিতেন। গুপ্ত-সমিতিতে স্থির হল, ঐ আশু বিশ্বাসকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। লটারি করায় দায়িত্বটা যাঁর উপর বর্তালো, তাঁর নাম চারুচন্দ্র বসু। মাত্র সতের বছর বয়স তাঁর থাকতেন 130 নং রসা রোডে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর দক্ষিণহস্তের তালুটা জন্ম থেকেই বিকৃত। ডান হাতে আঙুল ছিল না। কিশোর চারুচন্দ্র তাঁর ডানহাতে পিস্তলটা বেঁধে আলোয়ান-গায়ে অপেক্ষা করছিলেন আদালতের বাহিরে। আশু বিশ্বাস মহাশয় আদালত থেকে নির্গত হওয়া মাত্র চারুচন্দ্র আলোয়ান থেকে পঙ্গু ডানহাতটা বার করে, বাঁ-হাতে ট্রিগার টেনে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেন। কয়েকটি কন্সটেব্‌ল্ এসে তাঁকে ধরে ফেলে। অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও চারুচন্দ্র তাঁর বিপ্লবী নেতার নাম বলেননি। চারুচন্দ্র বলেন

আশু বিশ্বাসের কথা থাক। বিজন বসুর কথা শুনুন:

বিজন বসু কৃতি ছাত্র। এঞ্জিনিয়ার। বয়স পঁয়ত্রিশ। সি. আই. টি. তে কর্মরত। অবিবাহিত। একা থাকতেন। শ্যামপুকুর থানা অঞ্চলে, গণেশ মিত্র লেনে। দোশরা আগস্ট— মাসমাহিনাটা পকেটে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন সন্তোষপুরে। জ্যাঠতুতো বোনের বাড়িতে। যাদবপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপেন বাড়ি ফেরার জন্য। সেটা বিয়ের তারিখ। বগিতে অনেক মহিলা ছিলেন বিয়েবাড়ি ফেরত। তাঁদের গায়ে গয়না। সোনার না মেকি বলা শক্ত। ট্রেন যখন রাত নয়টা নাগাদ ঢাকুরিয়া স্টেশানে পৌঁছায় তখন ঐ কামরায় উঠে পড়ে একদল অপরাধজীবী। দুর্জনে বলে, তারা নাকি নৈতিক দাদাদের মদতে অপরাধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত— এ লাইনের নামকরা মস্তানপার্টি। ডাকাতেরা ছোরা-পিস্তল উঁচিয়ে যখন মহিলাদের গা থেকে গহনা খুলে নিতে উদ্যত তখন বিজনবাবু বাধা দেন। একাই। মরিয়া হয়ে ডাকাতেরা সদলে তাঁর টুঁটি টিপে ধরে। ছোরার আঘাতে আঘাতে তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে। চলন্ত গাড়ি থেকে গড়িয়ে তাঁর মৃতদেহটা রেললাইনে ফেলে দেয়।

[বাকি ঘটনাটা বলার আগে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা পেশ করি। মাসখানেক আগে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে একটি বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: বাঙালীরা কি জাতিগতভাবে ভীতু হয়ে যাচ্ছে? আধডজন বাঙালী বুদ্ধিজীবী— নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা বিখ্যাত— এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানান। সবাই মোটমুটি সিদ্ধান্তে আসেন—হ্যাঁ, ব্যাপক আর্থসামাজিক অবক্ষয়ের হেতুতে, মূল্যবোধের অবনতিতে, বাঙালী জাতিগতভাবে ভীতু হয়ে যাচ্ছে। সেই হাফ আ-ডজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর আলোচনায় বা প্রবন্ধকারের উপসংহারে 'বিজন বসু'র প্রসঙ্গ যথাযথ মর্যাদায় আদৌ উল্লিখিত হয়নি।]

ঢাকার পাঁচকড়ি সান্যালের আদেশে তিনি আশুবাবুকে হত্যা করেন। পুলিসের প্রহারে তিনি স্বীকার করেন পাঁচকড়ি সান্যাল থাকেন বেনেটোলা লেন-এ। নাম ও ঠিকানা দুটোই বানানো। আদালতে চারুচন্দ্র বিচারককে বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আশু বিশ্বাসকে আমিই মেরেছি। কারণ আশুবাবু ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষদের ফাঁসি দেওয়ায় আনন্দ পেতেন। হজুর, আমাকে ফাঁসি না দিয়ে যদি ছেড়ে দেন তবে ঐ আশু বিশ্বাসের মত ব্রিটিশের পোষা কুকুরদের আমি একের-পর-এক হত্যা করব। অর্থাৎ যতদিন আমার বাঁ-হাতটা কার্যকরী থাকবে।"

....উনিশে মার্চ, 1909 আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সতের বছরের চারুর ফাঁসি হয়।

কোনও কলকাতা-বিশেষজ্ঞ অথবা কর্পোরেশনের কাউন্সেলার যদি আমাকে জানান যে, ভবানীপুর অঞ্চলের ঐ রাস্তাটি সেই আশু বিশ্বাসের নামে নয়, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে আমার ভ্রান্তি অপনোদকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে রাস্তার নামধারী আশুবাবুর পরিচয়টা জানাব।

আর যদি আমার অনুমান নির্ভুল হয়, তাহলে কোনও কাউন্সেলারকে কিছু কষ্ট করতে হবে না। আমি জানি, তাঁরা কী পরিমাণ ব্যস্ত কলকাতাকে কল্লোলিনী করে তুলতে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও কেন যে রাস্তার নামটা 'আশু বিশ্বাস রোডের' পরিবর্তে 'চারুচন্দ্র বসু রোড' করা যায়নি তা আমার জানা। আপনারাও কি জানেন না?

ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষসাক্ষী তাঁরা কেউ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে প্রশাসনকে কিছু জানালেন না। যে-যার গা বাঁচিয়ে চলে গেলেন নিজ-নিজ আবাসে। তাঁরা জানতেন, কার মদতে, কার ছত্রছায়ায় ঐ অপরাধজীবীরা এভাবে রেলগাড়িতে ডাকাতি করে থাকে। একটি মাত্র ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে পেট্রাপোলের বাসিন্দা বৈষ্ণব দাসানুদাস: প্রভুচরণ দাস। তিনি বোধকরি এই শহরের হাল-হকিকৎ ঠিক মতো জানতেন না। তাই 'জয় গৌর' বলে তিনি এগিয়ে এলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রেলপুলিসকে সবিস্তারে ঘটনাটি বিবৃত করলেন। ডায়েরি লেখা হল রেলপুলিসের খাতায়। তখন রাত দশটা।

যে-কোন সভ্য দেশে এর পর রেলপুলিস অনুসন্ধানে যেত। শেয়ালদা আর ঢাকুরিয়ার দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর। ট্রলি নিয়ে তদন্তে গেলে সেই রাত্রেই মৃতদেহটা উদ্ধার করা যেত। তা কেউ যায়নি। ভাবখানা: এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা!

আগেই বলেছি, বিজন ছিলেন অকৃতদার। একা থাকতেন। তবু তাঁর বন্ধু-বান্ধব নিশ্চয় ছিল। তাঁরা পুলিসে খোঁজ নিতে গেলেন। 'মিসিং স্কোয়াডে' এজাহার লিখিয়ে এলেন। এতক্ষণে রেল-পুলিসের টনক নড়ল: 'তাই তো! সে রাত্রে সেই ফোঁটা-কাটা বোষ্টমটা কী যেন এজাহার দিয়ে গেস্‌ল না? দেখ, দেখ, খাতাপত্র উল্টে দেখ....'

ঘটনার ছয়দিন পরে এন. আর. এস. হাসপাতালের মর্গে পাওয়া গেল এক বেওয়ারিশ লাশ। প্রমাণিত হল গলা-পচা মৃতদেহটা বিজনবাবুর। ঘটনার সাতদিন পরে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেলেন বিজন বসু। রেল-পুলিস ও প্রশাসনের প্রথম প্রচেষ্টাই হল কীভাবে কেলেঙ্কারিটা চাপা দেওয়া যায়। কেমন করে প্রমাণ করা যায়— এটা হত্যা নয়! একটা নিছক অ্যাক্‌সিডেন্ট!

কিন্তু তা হল না। হেতুটি মারাত্মক। ডক্টর সি. সি. মল্লিক। এন. আর. এস-এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। সেই গলা-পচা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি বলে দিতে পারলেন যে, মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধ করায়। এছাড়া মৃতের দেহে অন্তত পঁয়ত্রিশটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রভুচরণ দাসের এজাহার 'করোবোরেটেড্' হল!

হুম্‌কি দিল সি. আই. টি. অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন: বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর ঐ রেলপথের কুখ্যাত অপরাধজীবী ডাকাতদের ধরতে না পারলে কর্মবিরতি শুরু করা হবে। সি. আই. টি.-র তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রী জে. সি. তালুকদারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসলেন সরকারের প্রশাসন ও পুলিস কর্তারা।

নীট ফল: রেল পুলিসের ও. সি. সতীশ চৌধুরী সাসপেন্ডেড!

আর কী করা যেত বলুন? ঐ লাইনে যারা অপরাধজীবী হিসাবে চিহ্নিত তারাই ইলেকশনের সময় সব ফেলে ছুটে আসে। তাদের মাজায় তো দড়ি বাঁধা চলে না!

অনেক পরে যখন বালিগঞ্জে ফ্লাইওভার হল, তখন সদাশয় বামফ্রন্ট সরকার

নামাদুন স্মরণ করেছিলেন বিজনবাবুকে। 'বাম্প্' নয়, রাস্তার নাম নয়, অ্যাক্কেরে পেড়ুন নাম! অকৃতদার বিজন বসু জীবিত থাকলে আর কী আশা করতে পারতেন? মস্তানপার্টির হাতে মরে ধন্য হতে না পারলে এমন একটা জব্বর সেতু তাঁর নামে চিহ্নিত হত? আপনারাই বলুন?

☆ ☆

টি. সি. পোর্ট বিনোদ মেহ্তা আপনাদের কাছে অপরিচিত নন। ভদ্রলোক এমনিতে ভালই ছিলেন। তবে তাঁর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অবসেশন ছিল! তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, পুলিসের কাজ বুঝি কবিগুরুর ঐ লাইনটা সার্থক করতে: 'দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো।' আসলে ওটা যে ছাপার ভুল— লাইনটা হবে: 'দুর্জনেরে রক্ষা কর, দুর্বলেরে হানো'— এই ব্যাপারটাই ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি। ফলে স-দেহরক্ষী প্রাণ দেন! সেই সূত্র ধরে তা-বড় তা-বড় রাজনৈতিক নেতাদের— যাঁরা পোর্টএর চোরা-কারবারের নেপথ্য নায়ক— তাঁদের মুখোস যাতে খুলে না পড়ে—অন্তত সরকারের বিরোধীপক্ষের নেতাদের সেটাই বক্তব্য — পুলিস-হাজতে পিটিয়ে মেরা ফেলা হল ইদ্রিস মিঞাকে। 'নবীন কায়দায়' পুলিসের হেপাজতে থেকেই এককালে কেনেডি-হত্যার মূল আসামীকে, এবং তস্য-হত্যার প্রত্যক্ষ আসামীকে হত্যা করা হয়েছিল। ঝামেলা বাধল অন্য কারণে। খবর পাওয়া গেল, অতি উচ্চপদস্থ একজন পাব্লিক-সার্ভেন্ট, বিধানসভার অধ্যক্ষ, কলিমুদ্দিন শামস্-সাহেব ট্রেনের বাতানুকূল-করা কামরার টিকিট কেটে হাওড়া থেকে মোগলসরাই চলে গিয়েছিলেন; এবং তাঁর সরকারী-গাড়ি নিয়ে সরকারী-ড্রাইভার গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়েছিল। জাস্ট, মোগলসরাই স্টেশনে সাহেবকে রিসিভ করতে! এ নিয়ে বিধানসভায় মহা হৈ-চৈ। বিরোধীদলের বক্তব্য: উত্তর প্রদেশ সরকারকে টেলিফোন করলেই তো মোগলসরাই স্টেশনে ঐ সরকারের গাড়ি সৌজন্য দেখাতে হাজির থাকত, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষকে স্টেশনে রিসিভ করতে। বিরোধীদের দাবী: এভাবে ঐ গাড়িতে মেহ্তা হত্যাকারীকে কলকাতা থেকে মোগলসরাই পাচার করা হয়। এমন বেয়াড়া প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঐ অফিসারের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনায় বসলেন। পরে বেরিয়ে এসে বললেন, আমি খতিয়ে দেখেছি, সব ঠিক আছে। অস্বাভাবিক কিছু হয়নি। 'এন্তাই তো হোন্দাই রহ্তা'! অফিসারকে রিসিভ করতে সরকারী-গাড়ি স্টেশনে যাবে না? এমনটা তো হয়েই থাকে!

এই অনবদ্য কিস্সাটি আপনাদের জানা— বিনোদ মেহ্তা আপনাদের অপরিচিত নন। যদিও তিনি ছিলেন 'বাঙালী' তবু তাঁর নামটাও কিন্তু মনে পড়েনি কারও ঐ আলোচনার সময়: 'বাঙালী কি ক্রমশ ভীতু হয়ে যাচ্ছে?' আপনাদের মনে আছে, কারণ আপনারা তো আর বুদ্ধিজীবী নন, সাধারণ মানুষ— ব্যবসায়ী,

চাকুরে, বেকার— অথবা আমার মতো পেনশনভোগী।

কিন্তু মুক্তি সেন?

মুক্তি সেন ছিলেন আয়কর বিভাগের অফিসার। আমার সহপাঠী সত্যপ্রিয় আচার্যকে চেনেন? মুক্তি ছিল তেমনি একবগ্গা! দর্শনশাস্ত্রের এম. এ.। তার স্ত্রী মঞ্জুও একটি নামী বিদ্যাতনের অধ্যাপিকা। মুক্তি কলকাতার ব্যবসায়ী মহলের আয়করের রিটার্ন ঘাঁটাঘাটি করত। ব্র্যাবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, বড়বাজারের ধনকুবেরদের আয়করের রিটার্ন দেখে আয়করের পরিমাণ নির্ধারণ করত একবগ্গা মুক্তি সেন।

পয়লা জুন 1960 মাঝেরহাট রেল-স্টেশনের কাছাকাছি একটি নির্জন জায়গায় মুক্তি সেনের সংজ্ঞাহীন দেহ আবিষ্কার করল একজন পুলিস কন্সটেব্‌ল্‌। মাঝেরহাট ব্রিজ থেকে নেমে পশ্চিম দিকে পোর্ট কমিশনার্স-এর এলাকাভুক্ত জমিতে। সংজ্ঞাহীন দেহটি অপসারিত করা হল বাঙ্গুর হাসপাতালে। তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। কোনও মৃত্যুকালীন জবানবন্দির প্রশ্নই ওঠেনি। হাতের মূল্যবান ঘড়িটি ছাড়া সব কিছুই পাওয়া যায় তাঁর পকেটে। সে সময় কলকাতা পুলিসের হোমিসাইড স্কোয়াডের ও. সি. ছিলেন শম্ভু সরকার। পুলিশ কুকুর লাকি ও মিতাসহ বাঘা বাঘা গোয়েন্দা অফিসারের দল বহু চেষ্টা করেও সন্ধান পায়নি খুনীর। কোটি কোটি টাকার যেওসা করেন যে-সমস্ত ধনকুবের তাঁদের ইনকাম-ট্যাক্সের রিটার্ন যাচাই করেন যিনি, এমন একজন ছা-পোষা সামান্য মানুষ কেমন করে খুন হয়ে গেল পুলিস তার কোনই হদিস করতে পারল না। তাঁর পরিবারের লোকেরা বালিগঞ্জ ফার্ন রোডের বাড়ি থেকে বহু বছর ধরে লালবাজারের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন— "বেশ তো কে খুন করেছে না বলতে পারলেও, কী কারণে খুনটা সংঘটিত হয়েছে পুলিস কি সেটুকুও বুঝতে পারেনি?"

কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন (আনন্দবাজার, 29.11.92):

> "পুলিস অপরাধী সন্দেহে একজনকেও ধরতে পারেনি। ঘটনার এত বছর পরেও মুক্তিবাবুর মা লালবাজারের কর্তাদের চিঠি লিখে চলেছেন, কোন্ অপরাধে কার জন্য তাঁর ছেলেকে এভাবে চলে যেতে হল, তা জানার জন্য। ফল হয়নি তাতেও॥"

বোধকরি সৌজন্য জানিয়েও কেউ চিঠির জবাবে বলেনি: এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা!

এবার আমরা ফিরে আসতে পারি আমাদের সেই মূল প্রশ্নটায়।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের দক্ষতায় আজ রাজ্য-পুলিস, তার গোয়েন্দা বিভাগ, তার ইন্‌টেলিজেন্স আজ কেন কার্যকারী হচ্ছে না। বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে কী বলেন? বাঙালী তো দিন দিন ভীতু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাঙালী পুলিস কেন হয়ে যাচ্ছে এত অকর্মণ্য?

আমার তো ধারণা, এই অবক্ষয়ের মূল প্রবক্তা, আদিগুরু হচ্ছেন সুবে এপার-বাঙালা

এপার বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী মহামহিম রাজনীতিক হোসেন শহীদ সুরাবর্দি। আজ ভারতের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজ নিজ এলাকার পুলিস বাহিনীকে যেভাবে নিয়োগ করতে চাইছেন— রাজনৈতিক কারণে, পার্টিগত হেতুতে— শহীদ সুরাবর্দি তাই করেন মুসলিম লীগের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে। দু-দুজন অভারতীয় লেখক — প্রথমত লেওনার্ড মোস্‌লে ('লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রুল') এবং দ্বিতীয়ত মাইকেল এডওয়ার্ডস্‌ ('লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া') তাঁদের গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন ধর্মীয় কারণে হিন্দুবিদ্বেষে শহীদ সুরাবর্দী পুলিসকে নিয়োগ করেছিলেন হিন্দু-নিধন যজ্ঞে। মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে ষোলই আগস্ট, 1946, সুরাবর্দি যখন বিজয় উৎসব পালনে ব্যস্ত তখন মুসলমান গুণ্ডার দল অবাধে হিন্দুর দোকান-বাড়ি লুট করছিল। একথা লিখেছেন ঐ দুজন বিদেশী লেখক — যাঁরা না হিন্দু, না-মুসলমান। লিখেছেন: আক্রমণকারীরা যেহেতু শাসকদলের তাই, উপর মহলের নির্দেশে, পুলিস মেনে নিয়েছিল ঐ মন্ত্রটা: 'দুর্জনেরে রক্ষা কর, দুর্বলেরে মারো!'

অবিভক্ত বঙ্গের শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সুরাবর্দির পদাঙ্ক আজ অনুসরণ করছেন প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। না, ধর্মীয় হেতুতে নয়, ব্যক্তিগত অথবা পার্টিগত ক্ষমতা কায়েম রাখতে।

শহর কলকাতায় হিন্দু-নিধন যজ্ঞ সমাপ্তি-কালে শহরের হিন্দুরা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, তখন সুরাবর্দি তাঁর রাজনীতির খেলা—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শুরু করলেন এমন প্রত্যন্তদেশে যেখানে সংখ্যালঘুদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর নয়। নোয়াখালি জেলার তিনটি থানাকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি: রামগড়, লক্ষ্মীপুর ও বেগমগঞ্জ। দাঙ্গার ভয়াবহতা এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় ছুটে এলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ: মহাত্মাজীর কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর লেগেছিল প্রশাসনের নির্লিপ্ততা! ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল-কমিশনার এবং ইংরেজ পুলিস-সুপারদের কাছে তিনি বারংবার ঐ একই প্রশ্ন করতে থাকেন: কেন? কেন? কেন?

সুরাবর্দীর অলিখিত নির্দেশে ইংরেজ প্রশাসকেরা সেদিন নোয়াখালির সংখ্যালঘু সাধারণের জান-মান-ইজ্জৎ বাঁচাতে পারেননি একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। চট্টগ্রাম বিভাগের ইংরেজ কমিশনার উইলিয়াম ব্যারেট ঐ দাঙ্গায় পুলিস ও প্রশাসনের ব্যর্থতার হেতু বিজ্ঞাপিত করে একটি অসামান্য রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন। সেটি তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ করেই কর্তব্য শেষ করেননি। বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। সে হিম্মৎ তাঁর ছিল— যা নেই, অনেক দুঃখে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি—আজকের দিনের আই. পি. এস. এবং আই. এ. এস. উচ্চপদস্থ অফিসারদলের। মেহ্‌তা হত্যা, বিজন হত্যা, মুক্তি সেন হত্যা, ডাঃ শ্যামাপদ হত্যা, অনিতা হত্যা, শঙ্কর গুহ নিয়োগী অথবা সফদার হাশ্‌মির হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য-নায়ক কোন্ কোন্ কোটিপতি জনদরদী নেতা সে-কথা বলবার মতো হিম্মৎ আজ কোনও আই. এ. এস.-এর নেই। যা আছে আজও কিছু কিছু নির্ভীক

সাংবাদিকের এবং শাবানা আজমির মতো শিল্পীর।

উইনিয়াম ব্যারেট রচিত ঐ রিপোর্টটি সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের মতে (বর্তমান 28. 11. 92): " সর্বকালের জন্য স্মরণীয় এ কারণে যে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য পুলিস ও প্রশাসনকে কী ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই রিপোর্টটিতে।"

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ঐ সময়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে পদব্রজে নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছিলেন। আত্মজীবনীতে ('মাই ডেজ উইথ গান্ধী') তিনি নোয়াখালির যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন তার বঙ্গানুবাদ:

> বেশির ভাগ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কয়জন অপরাধজীবী ধরা পড়েছে, তাদের শাসকদলের কর্মীরা এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে যে, তাদের মামলাগুলি আদালতে পেশ করতে বাধ্য হলে পুলিস আইনের ঢিলে-ঢালা ফাঁক রাখবে, যাতে অপরাধীরা বেরিয়ে আসতে পারে। ফলে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মনোবল ভেঙে পড়ছে। জেলা প্রশাসনের উপর স্বতই তারা আস্থা রাখতে পারছে না। পুলিসদের মধ্যে বদলি ও রদবদল ঘটিয়ে থানাগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, পুলিস বিভিন্ন গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে আর কোনও ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করতে পারছে না। বাকি জনসাধারণের ভিতর কেউ যদি থানায় এসে যে কোন সংবাদ দিয়ে যায়, তাহলে পুলিস তা কানে তোলে না।....এটা অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি।

কোথা থেকে উদ্ধৃতিটা দেওয়া হয়েছে আগে-ভাগে বলে না দিলে আপনারা স্বতই মনে করতে পারেন এটা বুঝি সাম্প্রতিক কালে হরিহরপাড়া ঘুরে-আসা কোনও সাংবাদিকের বিবৃতি।

এই হল প্রথম যুগ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ। বলা যায়, স্বাধীনতার ঊষালগ্নে শাসক তথা আরক্ষা বিভাগের আদিম অবস্থা। পচনের প্রথম পর্যায়। আর তার পরে এস. ওয়াজেদ আলির সেই অনবদ্য উক্তিটি:

"ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে।"

☆ ☆

পশ্চিমবঙ্গে পুলিস-বাহিনীকে অকর্মণ্য করে তোলার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রসঙ্গে আসার আগে দুটি কথা বলে নিতে চাই:

প্রথম কথা: ছেচল্লিশে কলকাতা শহরের ঐ দাঙ্গার সময় কী কংগ্রেস, কী বামপন্থী, জননেতারা দাঙ্গা রুখে দেবার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে—কী হিন্দু, কী মুসলমান! দাঙ্গার মধ্যে শান্তি মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কংগ্রেস-নেতা শচীন মিত্র কলকাতার রাস্তায় শহীদ হয়েছিলেন। উত্তরপাড়ায়

কমিউনিস্ট কর্মী (বলা বাহুল্য, সি. পি. আই. (এম.) তখনো জন্মায়নি) সীতেশ চট্টোপাধ্যায় আত্মবলি দিয়েছিলেন। ঐ সময় কলকাতা শহরের ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল বামপন্থীদের কব্জায়। যাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন তাঁরা ছিলেন যথার্থ কমুনিস্ট, আন্তর সাম্যবাদী। কার্ফু এবং মিলিটারির তোয়াক্কা না করে মহম্মদ ইসমাইল, সোমনাথ লাহিড়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: কলকাতায় ট্রাম চলবে। চলেছিল তাই। জহরুল হক, ধীরেন মজুমদার, আবদুল রেজ্জাক, সত্যনারায়ণ মিশির— কে হিন্দু, কে মুসলমান চেনা যায়নি। এঁরা সকলেই সাম্যবাদী। তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথে নেমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: কলকাতা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। অথচ ডিসেম্বর, 1992-এর কলকাতা-দাঙ্গায় আমরা কী দেখলাম? আশিস ঘোষ (আনন্দবাজার 14.12.92) অনেক দুঃখে লিখেছেন:

> বামফ্রন্ট-শাসিত এই রাজ্যের রাজধানীতে টানা সাতদিন পরিকল্পিত তাণ্ডবের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের লেশমাত্র চোখে পড়ল না এখন। কার্ফু, ফৌজি টহল, আর পুলিশের উপর অগাধ আস্থাকে অবলম্বন করেই বামপন্থী সরকারকে দাঙ্গার মোকাবিলা করতে দেখা গেল। মাত্র কয়েকদিন আগে ব্রিগেড-প্যারেড গ্রাউণ্ড ভরানোর জন্য যে-উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, তার কণামাত্রও দেখা গেল না কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, হাঙ্গামা থামাতে। কথায় কথায় 'ক্যাডার নামানো'র যে হুম্‌কি শোনা যায়, সেই ক্যাডাররাই বা গেলেন কোথায়?.....আজ ট্যাংরা-তিলজলা শ্রমিক এলাকা বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। শুধু শ্রমিক সংগঠনেই নয়, দল হিসাবেও এখানে বামপন্থীদের কব্জা মজবুত।.....অথচ বিবিবাগান জ্বলতে দেখে বাধা দেবার জন্য আজ কোনও একজন রেজ্জাক কিংবা সত্যনারায়ণকে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় কথা: একটু আগে যে উদ্ধৃতিটা শুনিয়েছি— ঐ যে ''ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে''— আপনারা কি খেয়াল করে দেখেছেন, তার লেখক হিন্দু নন, এবং তার বিষয়বস্তু মুদি দোকানে রামায়ণ পাঠ? যে রামের নাম নিয়ে করসেবকরা অযোধ্যায় বাব্‌রি-মসজিদ চুরমার করল? যে রামের নাম নিয়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করল? গ্রাম-বাংলার সেই ট্র্যাডিশান কিন্তু আজও সমানে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা— মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ বাঁকুড়া— পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান গাঁয়ে আদৌ দাঙ্গা হয়নি। একটি খতিয়ান নেওয়া হয়নি। বাব্‌রি-মসজিদ্ ধ্বংস হওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে কলকাতায় যে কয়টি বস্তিতে দাঙ্গা বেধেছে তার কত শতাংশ বস্তিবাসী বাংলাভাষী? সে খতিয়ান নিলে হয়তো দেখা যাবে শতকরা আশীভাগ উর্দু' বা হিন্দিতে বাৎচিত করেন— কী হিন্দু, কী মুসলমান! অর্থাৎ তাঁরা বহিরাগত। বাংলার বর্তমান বাসিন্দা বটে, তবে বাঙ্গালী নন। আরও একটা খতিয়ান যাচাই করা হয়নি: যে বস্তিগুলো পুড়েছে তার কতগুলিতে হিন্দু-মুসলমান প্রমোটারেরা দীর্ঘদিন ধরে বস্তি-উচ্ছেদের ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিল? সদাশয় বামফ্রন্ট সরকারের জনসেবকেরা — যাঁরা দাঙ্গা অন্তে

মহামিছিল করে পদব্রজে কলকাতায় অনেকটা পথ-পরিক্রমার পরিশ্রম স্বীকার করলেন—তাঁরা কি আমাদের একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন? অগ্নিদগ্ধ ঐ হিন্দু-মুসলমান বস্তিগুলোতে কোনক্রমেই মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস বানাতে দেওয়া হবে না? যারা যেখানে বাস্তুচ্যুত হয়েছে—কী হিন্দু, কী মুসলমান—চারতলা বাড়িতে এক-একটি পরিবার অন্তত দেড়-কামরার ঘর পাবে? কমন-স্যানিটারী-ল্যাট্রিন সমেত? গ্রেট-লন্ডন-ফায়ার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লন্ডনে যেমন হয়েছিল?

☆ ☆

পশ্চিমবঙ্গে পুলিস-বাহিনীকে অকর্মণ্য করে তোলার দ্বিতীয় দফার প্রচেষ্টা শুরু হল ষাটের দশকের শেষাশেষি এবং সত্তরের দশকের ঊষাযুগে। সেই সময় এই শাসন-কাঠামোটা আদ্যন্ত পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন এক 'দলছুট' জননেতা। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা সংবিধানের নিয়মকানুন কব্জা করে সাধারণ মানুষের মাথায় চড়ে বসেছে। তাঁদেরই গোপন মদতে ব্যবসায়ী, বণিক, মিলমালিক, আর জোতদারেরা শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিকার দরকার। সেই প্রতিবাদ প্রথম রূপায়িত হল নক্‌শালবাড়িতে। নেতার নাম চারু মজুমদার!

সাতষট্টি সালের মে-মাসের শেষ সপ্তাহে জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে কয়েকটি গ্রামে কৃষকেরা জোতদারদের বেনামী জমি দখল করে নেয়। তখন প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল। আজিজুল হক লিখেছেন, ''উৎখাত হওয়া জোতদারেরা কলকাতায় বসে তাঁদের শ্রেণী-প্রতিনিধি অজয় মুখার্জির উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। অজয় মুখার্জি হুমকি দিলেন CPI(M) যদি সরাসরি এই জমি উদ্ধারের সংগ্রাম বন্ধ করার জন্য সংগ্রামে না নামে তাহলে তিনি মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবেন। সদ্য মন্ত্রী হওয়া কমিউনিস্টরা স্বর্গ থেকে বিদায়ের আশঙ্কায় প্রমাদ গণলেন।....তেত্রিশ নং আলিমুদ্দিন স্ট্রীট বিচলিত।....সিদ্ধান্ত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার একটা মিশন শিলিগুড়ি যাবেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং সুশীল ধাড়ার মিশন শিলিগুড়ি পৌঁছাল। যেমন করে হোক মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতেই হবে— হরেকৃষ্ণ কোঙারের এই যুক্তি ঘৃণাভরে শিলিগুড়ি পার্টি খারিজ করে দিল।.....'

থাক সে দীর্ঘ ইতিহাস। মোট কথা, যাঁরা এতদিন রাজনীতিকে অবলম্বন করে দেশ-সেবা তথা রুজি-রোজগার করছিলেন তাঁরা প্রমাণ গণলেন। কী ডান, কী বাম। ক্রমে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি ঐ নকশালপন্থীদের ঠেকাতে, ঠেঙাতে এবং খতম করতে পুলিসকে লাগাম-ছেঁড়া ঔদ্ধত্যে অগ্রসর হবার ঢালাও অনুমতি দিয়ে রাখলেন। বামদলগুলি— সিদ্ধার্থশঙ্করের যতই বিরোধিতা করুন— এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। কারণ ঐ 'হাড়-হাভাতে' নকশালপন্থীরা রাজনীতিকে ব্যবসা হিসাবে, উপার্জনের পথ হিসাবে, গ্রহণ করেনি। তারা নতুন

করে সমাজকে গড়তে চেয়েছিল। তাই তাদের খতম করতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর তাঁর পুলিসকে এগিয়ে যাবার অবাধ অনুমতি দিলেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতারা— রাজনীতিকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করে যাঁরা দলের, পরিবারের ও নিজেদের আখের গোছাতে মাঠে নেমেছেন—তাঁরা এই একটি বিষয়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। বোতল থেকে বেরিয়ে এল পুলিস-নামক আলাদীনের দৈত্য। সুশীতল রায়চৌধুরী থেকে চারু মজুমদারের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রের দল হয় শহীদ হল, নয় পঙ্গু, অথবা তিল তিল করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কিংবা নিঃশেষ হয়ে গেল। বাম-ডান উভয় দলই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। গোলিয়াথ তরুণ ডেভিডকে হত্য করেছে! কী আনন্দ!

মুশ্‌কিল হল এই: ডেভিডজয়ী গোলিয়াথ দৈত্যটা তার বোতলে ফিরে যেতে রাজি হল না।

তখনও এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশে অনেক অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ছিলেন যাঁরা দেশের নিঃস্বার্থ মঙ্গল চাইতেন—তাঁরা দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন না— তাঁরা বোঝাতে চাইলেন: এ ঠিক হচ্ছে না! পুলিসকে এভাবে স্বাধীকারপ্রমত্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত।

কিন্তু শাসকদল—কী দক্ষিণ, কী বাম— কী পশ্চিমবঙ্গ, কী অন্যান্য রাজ্যে— স্ব-স্ব পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে একটা মাঝামাঝি সমঝোতা করে ফেলল: দৈত্যটা যদি গদিআসীন শাসকদলের অস্তিত্বরক্ষায় বে-আইনী কাজ করতে রাজি থাকে তাহলে তাকে স্বাধীকারপ্রমত্ততায় বে-আইনী কাজ করতে দেওয়া হবে।

শুভবুদ্ধি-যুক্ত মানুষ—শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আজও স্বার্থবুদ্ধির পরিবর্তে নীতিবোধের দ্বারা চালিত—তারা যখন রুখে ওঠে: এসব কী হচ্ছে?

তখন হাসিহাসি মুখে শাসকদলের বড়কর্তা নিদান হাঁকেন: এন্তাই তো হোন্দাই হতা!

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়! সর্বত্র! আজ এই হচ্ছে দেশের অবস্থা!

☆ ☆

এই বিরানব্বই সালের সেপ্টেম্বর মাসে— অর্থাৎ অযোধ্যায় করসেবকদের তাণ্ডবনৃত্যের মাসতিনেক আগে— প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও মুখ্যমন্ত্রীদের দিল্লীতে এক সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আসমুদ্রহিমাচলের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীরা সিক্ত-মার্জারের মতো গুটিগুটি এসে উপস্থিত হলেন সেই মহতী সভায়। আলোচ্য বিষয়: দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অপরাধ-প্রবণতাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, এই অপরাধ-প্রবণতাকে অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। এই যে অপরাধীরা

শাস্তি না পেয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— পুলিস তাদের জেনে-বুঝেও ধরছে না— ধরলেও তারা যাতে কায়দা করে ছাড়া পেয়ে যায় তার এন্তেজাম করা হচ্ছে— এটা আর হতে দেওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী আরও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, তাঁর অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে নির্বাচনী রাজনীতিতে উত্তরোত্তর দাগী অপরাধীদের নিয়োগ করা হচ্ছে। ফৌজদারী মামলায় শাসকদলের মদৎপুষ্ট অপরাধীদের ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে সাহস পাচ্ছে না। তদুপরি হিংসাত্মক নানা অপরাধমূলক আচরণকে বিভাগীয় তদন্তের নামে ধামাচাপা দেবার একটা প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শোনামাত্র আসমুদ্রহিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর দল একযোগে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, স্যার। ঠিক ঐ কথাই আমরা বলতে এসেছি অ্যাদ্দুর! আমরাও সব্বাই সেটা লক্ষ্য করেছি: তবে...ইয়ে, ঐ প্রতিবেশী রাজ্যটায়, অর্থাৎ....হেঁ হেঁ....আমার রাজ্যটা শুধু ব্যতিক্রম!

সব মুখ্যমন্ত্রীর এক রা। তাঁদের সম্মিলিত অভিমত: ফৌজদারী আইনবিধি আরও কঠোর করা দরকার। রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এছাড়া পুলিসখাতে ব্যয়বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহলেই সারা দেশে নেবে আসবে: শান্তি! শান্তি! শান্তি: হরি ওঁ!

এই মহতী সভায় উপস্থিত ছিলেন: বিহারের জনতা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলালুপ্রসাদ যাদব। যাঁর রাজত্বে পুলিসের সহায়তায় উচ্চবর্গীয় ভূস্বামীদের পোষা গুণ্ডার দল ক্রমাগত হরিজন বস্তিতে আগুন দিচ্ছে। গণনরহত্যা ও গণবলাৎকার সে রাজ্যে নিত্য -নৈমিত্তিক ঘটনা। এই লালুবাবু তাঁর রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা শাসকদলের কব্জায় আনার জন্য ঐ সভায় আঠারো হাজার 'এ. কে. ফর্টিসেভেন' রাইফেল ক্রয়ের জন্য কেন্দ্রের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে বসলেন। ঐ বন্দুকগুলি পেলেই তাঁর রাজ্যে নাকি রিগিং অথবা গণহত্যা এবং গণবলাৎকারের খবর সংবাদপত্রে আর ছাপা হবে না!

উপস্থিত ছিলেন: মধ্যপ্রদেশের বি. জে. পি. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুন্দরলাল পাটোয়া। যাঁর রাজ্যে দণ্ডকারণ্যে আদিবাসীদের মধ্যে নিঃস্বার্থ সংগঠক, অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস. কমিশনার ডঃ শর্মাকে মুখ্যমন্ত্রীর যে ক্যাডারদল জীপ থামিয়ে উলঙ্গ করে দিয়েছিল, তাদের গ্রেপ্তার করাই হয়নি; আদালতে মামলা তোলা তো দূর অস্ত্। যাঁর রাজ্যে জীবনে-জীবন-যোগ-করা শ্রমিক দরদী অপরিসীম জনপ্রিয় নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগীকে খনি ও মিলমালিকেরা সুপরিকল্পিতভাবে খুন করল। বি. জে. পি. সরকারের পুলিস কোন অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করতে পারল না।

উপস্থিত ছিলেন: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়ললিতা, যাঁর ক্যাডার-বাহিনী-নিযুক্ত এক ভাড়াটে গুণ্ডা রাজ্যের এক অতি উচ্চপদস্থা আই. এ. এস. মহিলা-অফিসার শ্রীমতী চন্দ্রলেখার মুখে ছুঁড়ে মারল অ্যাসিড বাল্ব। অবশ্য সঙ্গত হেতুতে। ঐ দক্ষ সিনিয়ার আই. এ. এস. অফিসার কী-কারণে-যেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন!

উপস্থিত ছিলেন: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ— যিনি কায়দা করে তাঁর রাজ্যে করসেবকদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়ে দিয়ে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক-রক্তগঙ্গার ভগীরথরূপে আজ চিহ্নিত। সমস্ত সভ্য দুনিয়ার সামনে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে নতশির হতে বাধ্য করে যিনি উত্তরাপথের হিরো সেজেছেন। ধর্মান্ধতার হেতুতে নয় কিন্তু! রাজনীতির ব্যবসায়ে লাভবান হতে দুর্দান্ত ফাটকাবাজিতে তিনি লিপ্ত হয়েছেন। ধীরে-ধীরে তিনি মুনাফা লাভ করছেন কিন্তু। করবেনও ভবিষ্যতে!! জয় শ্রীরাম!! জয় রাজনীতি ব্যবসায়!!

এবং উপস্থিত ছিলেন: পশ্চিমবঙ্গের অতি পরিচিত সদাহাস্যময় আপনাদের কমরেড জ্যোতি বসু।

আজকের (16.12.92) আনন্দবাজারে অধ্যাপক অম্লান দত্ত সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছেন, "এই নারকীয় দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও উল্লাস দেখাবার মতো লোকের অভাব হল না।" শ্রীদত্ত অর্থনীতির পণ্ডিত। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। আনন্দবাজারে প্রায়ই লেখেন। ইতিপূর্বে 'বাঙালী জাতিগতভাবে ভীতু হয়ে যাচ্ছে কি না' সেই সমীক্ষাতেও অংশ নিয়েছিলেন।

শ্রীদত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, "তবু মধ্যবিত্ত হিন্দুর মুখে অভিযোগটা উচ্চারিত হয়েই চলেছে। মুসলমানেরা ভারতে বিশেষ সুবিধাভোগী!"

যুক্তিতর্ক দিয়ে শ্রীদত্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, এ অভিযোগটা ভ্রান্ত! একথা সত্য নয়!

মুশ্‌কিল এই যে, মধ্যবিত্ত হিন্দুর যা বিরুদ্ধ-যুক্তি তা সে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে বলতে পারে না! সে তো শুধু 'মধ্যবিত্ত' নয়। 'নিম্ন'-পরিচিত। তার কথা শুনছেটা কে? তার মতে: গত চল্লিশ বছর ধরে এক জাতের অত্যন্ত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী— তাঁরা সরকারী-বেসরকারী নানা উচ্চমঞ্চে আসীন— এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁরা কি সত্যই বিশ্বাস করেন: ভারতে সংখ্যালঘুরা যতটা স্বাধিকার ভোগ করে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ততটাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে? ইন্দো-পাক ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান জয়লাভ করলে কলকাতার কোন কোন এলাকায়— যেখানে শহরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ঘনবসতির জন্য আঞ্চলিকভাবে সংখ্যাগুরু—সেখানে দমাদ্দম পটকা ফাটে, পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। এ আমার নিজ-কানে শোনা। নিজ-চোখে দেখা। অধ্যাপক দত্ত কি আমাকে জানাতে পারেন যে, ইন্দো-পাক ক্রিকেট-খেলার গোটা ইতিহাসে ভারত জয়ী হলে গোটা পাকিস্তানে ব্যতিক্রম হিসাবেও কোন একটি স্থানে সংখ্যালঘুরা একটিমাত্র পটকা ফাটিয়েছে বা তেরঙা-ঝাণ্ডা উড়িয়েছে?

আজ্ঞে না, 'ক্রিকেট খেলা' বলে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করবেন না। হাঁড়ির উপর

তলায় ঐ কটি চাল টিপলেই বোঝা যায় বাকি অন্নের অবস্থাটা কী! আর এটাতেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর আপত্তি। বিশ্বাস করুন, শুধু হিন্দুর নয়, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, মনে-প্রাণে-ভারতীয় বেশ কিছু মুসলমানেরও। তাঁরা অন্তর থেকে মৌলবাদী নেতাদের এই উদ্দামতাকে সমর্থন করেন না, কিন্তু সে-কথা প্রকাশ্যে বলতে বা লিখতে সাহস পান না। হজরতবাল অপহরণ নিয়ে, শাহবানু মামলা নিয়ে, ধর্মের অজুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি বা চার-চারটে বিবি রাখার অধিকার নিয়ে এবং সর্বোপরি বহির্ভারতের একটি ঘটনা— সলমন রুশ্‌দিকে কোৎল করার বিষয়ে ধর্মান্ধ খোমেনির উদ্ভট ফরমানের সমর্থনে মৌলবাদী সংখ্যালঘু জননেতারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণ মিটিং-মিছিল করেছে— উত্তেজনা ছড়িয়েছে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে বা বাঙলাদেশে হিন্দুরা কি সেভাবে প্রতিবাদ জানাতে পেরেছে? ধরুন, পাকিস্তানের ভারতীয় এম্ব্যাসীর একজন পদস্থ অফিসারকে যখন পাকিস্তান-পুলিস মারতে মারতে অজ্ঞান করে মৃতপ্রায় অবস্থায় প্লেনে করে দিল্লিতে ফেরত পাঠাল? অথবা ধরুন, করাচির মাঠে— হ্যাঁ, আবার ক্রিকেটের প্রসঙ্গেই ফিরে আসছি— মিয়াঁদাদকে অল্প রানে আউট করে দেবার অপরাধে করাচির 'সংখ্যাগুরু ক্রিকেটপ্রেমী'-রা যখন ভারতের অনিবার্য জয়ের খেলাটা বন্ধ করে দিল, তখন সে-দেশের সংখ্যালঘুদের কারও কি উঠে দাঁড়িয়ে বলবার হিম্মৎ হয়েছিল: This is not cricket? না হয়নি।

অথচ কনভার্স থিয়োরেমটা লক্ষ্য করে দেখুন: ভারতে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন: This is not cricket! 'স্যাটানিক ভার্সেস'কে নিষিদ্ধ করা বিষয়ে। তিনি দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুশিরুল হাসান! এই উদার মতামত প্রকাশ করার অপরাধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী ছাত্র ও অধ্যাপকের দল তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। ব্রিটিশ সরকার যেভাবে সলমন রুশদির বাকস্বাধীনতা রক্ষার জন্য জান দিয়ে লড়ে গেছিল তার কণামাত্র দেখা গেল না ভারত সরকারের তরফে: অধ্যাপক মুশিরুল হাসানের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে। কেন্দ্রীয় সরকার মৌলবাদী ছাত্র-অধ্যাপকদের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের অনুরোধ করলেন অধ্যাপক হাসানকে ক্ষমা করে দিতে! কেন? কেন অধ্যাপক হাসান হবেন দুয়োরানীর পুত্র? এ জাতীয় পার্থক্যের জন্যই ভারতীয় মধ্যবিত্ত— মধ্যবিত্ত কেন, প্রতিটি হিন্দুর মতে: ভারতে সংখ্যালঘু মৌলবাদী মুসলমানেরা সরকারের চোখে সুয়োরানী-তনয়। কারণ সংখ্যালঘুদলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও নিঃসন্দেহে 'ক্ষমতাগরিষ্ঠ।' বুকে হাত দিয়ে অধ্যাপক দত্ত বলুন না: কোন্ যুক্তিতে ইন্দিরাতনয় রাজীব গান্ধী শাহ্‌বানুর সুপ্রীম কোর্টে জেতা-কেস গায়ের জোরে হারিয়ে দিলেন? হ্যাঁ, গায়ের জোরেই! সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে ন্যায়বিচারের মাথায় পয়জার মেরে! প্রগতিবাদী, ইংলন্ডে শিক্ষিত, পাইলট রাজীব কি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন ঐ কথাটা? তিনবার 'তালাক' বলতে সক্ষম হয়েছেন বলে ষাট-বছরের শাহ্‌বানুর খসম মহম্মদ আহ্‌ম্মদ খানের নৈতিক অধিকার

বর্তেছিল বিবাহিতা বৃদ্ধা বিবিকে পুত্রকন্যাসমেত পথে বার করে দেবার?

শ্রীদত্ত বলেছেন, ''এই সাম্প্রদায়িক 'পক্ষপাতের' জন্য দোষী করা হয়েছিল বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী জবাহরলালকে।''

আজ্ঞে না। পণ্ডিতজী একা নন। দোষী বিগত চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন শাসকদল— কী বাম, কী দক্ষিণ— কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে— যেখানেই মুসলমান ভোটার ক্ষমতালাভের লড়াইয়ে 'ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টার'! হিন্দু রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা এই যে দলমতনির্বিশেষে মুসলমান তোষণ করে এসেছেন তার হেতু এ নয় যে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য তাঁদের দরদ উথলে উঠেছিল। প্রাণ কাঁদছিল! হেতু: মুসলিম ভোট! এ-জন্যই শাহ্‌বানু দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা জিতেও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে হেরে গেছেন! যে-হেতু মুসলমান পুরুষ-ভোটার ঐ সম্প্রদায়ের স্ত্রী-ভোটারের চেয়ে অনেক-অনেক গুণ বেশি। এজন্যই 'স্যাটানিক ভার্সেস্' কোন মৌলবাদী মুসলমান রাষ্ট্রে নয়, সবার আগে নিষিদ্ধ হয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষ একটি দেশে! এ জন্যই কলিমুদ্দীন-শামস্ মুখ্যমন্ত্রীর বিচারে নির্দোষ! অথচ লক্ষ্য করে দেখুন— কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! পরবর্তী নির্বাচনে 'মুস্‌লিম-অধ্যুষিত' এলাকায় দাঁড়িয়েও ঐ কলিমুদ্দিন শামস্ নির্বাচনে পরাজিত! কেন?

যেহেতু চিন্তাশীল মুসলমানেরা শুধু নিরাপত্তা চান, তোষণ নয়; তাঁরা তাঁদের নিরুপদ্রব ধর্মজীবন যাপন করতে চান। মৌলবাদী হিন্দু গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে জরু-গরু, জান-ইজ্জৎ বাঁচাতে চান। মৌলবাদী মুস্‌লিম মোল্লা, অথবা দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান দলনেতা, একটি 'সরকারী ছত্রচ্ছায়ায়' কোটিপতি হবার সুযোগ পান, এটা তাঁরাও কামনা করেন না। তাই কলিমুদ্দীন সাহেবের এই নির্বাচন ফলাফল!

এগুলি যদি সত্য না হত তাহলে বিক্ষুব্ধ হিন্দু ভোটের জোরে বি. জে. পি. একাধিক রাজ্যে সরকার গড়তে পারত না। সংসদে তাদের আসন দুই থেকে এক লাফে একশ-একুশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হত না। এবং অযোধ্যায় করসেবকেরা বানতলার বর্বরদের মতো উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হতে সাহস পেত না!

চল্লিশ বছর ধরে হিন্দু রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল— কী দক্ষিণ, কী বাম— ঐ 'ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টার'কে তোষণ করে এসেছে। সেই সুযোগে মৌলবাদী কিছু সংখ্যালঘু এবং নেতাশ্রেণীর কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হয়েছে—সাধারণ গরিব মুসলমান আরও গরিব, আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। অথচ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী—তাঁরা হিন্দু— নিজ নিজ স্বার্থে এ তথ্যটা কিছুতেই মানতে রাজি নন। এ তথ্যটা গোপন রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর!

''ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি। মাথা কর নত।
এ আমার, এ তোমার পাপ।''

☆ ☆

সর্বগ্রাসী রাজনীতি আজ অজগরের মতো পাকে-পাকে আমাদের পিষে মারার চেষ্টা করছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান! প্রতিটি পদক্ষেপ পার্টির কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। চাকরি-ব্যবসায়-রুজি-রোজগারের সুযোগের কথা না হয় বাদই দিলাম— সন্তানকে স্কুল-কলেজে, রুগ্ন আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলে দাদাদের প্রণামী দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। শ্মশানের কর্তৃত্ব পর্যন্ত আজ পার্টির কব্জায়। কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বন্যার্তদের সেবা করতে চাইলে প্রশাসন রুখে দেয়। বলে, আগে পার্টিকর্তাদের অনুমতি আসুক। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো নিঃস্বার্থ সেবা প্রতিষ্ঠান— যাঁরা কোনদিন নির্বাচনে প্রার্থী দেবেন না— তাঁদেরও রেহাই নেই! শরৎ বোস রোডের রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠন অথবা পুরুলিয়ার আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ চালাতে তাঁরা বাধা পান!

কেন?

নির্বাচিত সরকারের শাসনে কেন কায়েম থাকবে এমন হিটলারী গেস্টাপোধর্মী বর্বর ব্যবস্থা?

এমন দুর্দিনে অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকে একদল ভাগ্যবানের দিকে— যাঁরা ঈশ্বরের করুণায় দশের মধ্যে দশম: প্রতিভাবান।

তাঁরা শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সাংবাদিক।

নীল বাঁদরের অত্যাচার দেখে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু, মাইকেল, ফাদার লঙ, হরিশ মুখুজ্জে! অথচ আজ? লালবাঁদর-সবুজবাঁদর-গেরুয়াবাঁদরের অত্যাচার দেখে এগিয়ে আসছেন না কোনও শিল্পী-সাহিত্যিক। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত! হয় দক্ষিণপন্থী, নয় বামপন্থী! কেউ নয়: সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী!

দিল্লিতে সফদার হাশ্‌মির উপর নৃশংস আক্রমণ হলে প্রথম দল বুদ্ধিজীবী চোখ বুঁজে থাকেন। হাজরা-পার্কের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শাসকদলের ক্যাডার ঠেঙিয়ে ধরাশায়ী করতে চাইলে মৌনব্রত পালন করেন দ্বিতীয় দল 'বুদ্ধ'-জীবী। দুই জাতের বুদ্ধিজীবীর নাকের ডগায় রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা ঝুলিয়ে রেখেছে নানান জাতের 'খুড়োর কল'। কারও প্রত্যাশায় আছে সরকারী খেতাব: পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, কারও বা আকাদেমী—শিরোমণি— জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। কারও সমুখে সাংস্কৃতিক সফরে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ। এদিকে আবার আছে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্র পুরস্কার, বেস্ট-সেলার লিস্টে ঘন ঘন নামোল্লেখ, অথবা দূরদর্শনে 'সাহিত্য-সংস্কৃতি'র আসরে বারে বারে আমন্ত্রণ।

ডিসেম্বর বিরানব্বই-য়ের কলকাতা-দাঙ্গা থেমে গেলে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কিছু পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। কোন রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মী আমাকে পদযাত্রায় সামিল হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল। আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম— ''শিল্পী সাহিত্যিক-সঙ্গীতজ্ঞ-নাট্যকার-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে রাস্তায় নেমে 'হিন্দু-মুস্‌লিম ভাই-ভাই' চিৎকার করার কী প্রয়োজন? তত্ত্বটা তো প্রতিটি বাঙালী হিন্দু এবং প্রতিটি বাঙালী মুসলমানের জানা! তোমরা কি

জান না: দাঙ্গা কারা বাধায়? কেন বাধায়? তোমরা কি বোঝ না যে, তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়— তারা রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের পোষা মস্তান? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাদের দিয়ে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধানো হয়। এবং দাঙ্গা-অন্তে তারা ধরা পড়েনি? পড়ে না। পড়বে না!''

ওরা বোধ করি মনে মনে আমাকে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল!

'নীলদর্পণ, ভবানীমন্দির, অগ্নিবীণা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদপত্র, মিস্ রাথ্‌বোনকে লেখা খোলা-চিঠি' অথবা 'পথের দাবী' রচনার হিম্মৎ রাখেন, এমন নাট্যকার-কবি-কথাসাহিত্যিক আজ পশ্চিমবঙ্গে অনুপস্থিত। অথচ চিন্তা করে দেখুন, পথ-চলার অধিকারটুকুও রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছ থেকে আজ আবার কেড়ে নিয়েছে। সারা রাজপথ জুড়ে যখন 'ইনকেলাবী' মিছিল চলে—দুজন-দুজন হাত-ধরাধরি করে —তখন আপনি-আমি রাস্তা পার হতে পারি না। মানলাম: তোমরা ইউনিয়নের দাবী-মোতাবেক বোনাস পাচ্ছ না, তাই কার যেন কালো হাত ভেঙে দিতে চাইছ, গুঁড়িয়ে দিতে চাইছ। বেশ কথা; কিন্তু তাই বলে আমি ট্রেন ধরতে পারব না? ফুটপাতের ওপারে হাসপাতালে আমার যে আত্মীয়-বন্ধু পড়ে ধুঁকছে তার মুখে 'ভিজিটিঙ-আওয়ারের' ভিতর খাবারটা তুলে দিতে পারব না? কেন? আমার এ 'পথের দাবী' জোর করে কেড়ে নেবার হিম্মৎ তোমার হল কেমন করে? যেহেতু তুমি লাল-সবুজ-গেরুয়া রঙের রাজনীতি-ব্যবসায়ীর ছত্রচ্ছায়ায় আছ, আমি তা নেই! আমার অপরাধ: আমি বিলকুল সফেদ! তাই?

☆ ☆

আগেই বলেছি— কিছুদিন পূর্বে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে একটা বড় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল: ''বাঙালীরা কি ক্রমশঃ ভীতু হয়ে যাচ্ছে'' ঐ আধডজন বুদ্ধিজীবী— স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ—নানান যুক্তিতর্কের অবতারণা করে শেষ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন: ''হ্যাঁ, আর্থ-সামাজিক ক্রমাবক্ষয়ে বাঙালী জাতিগত ভাবে সত্যই ভীতু হয়ে যাচ্ছে।''

পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার সুযোগ পাওয়া কঠিন। বিশেষত আমার মতো অন্তেবাসীর পক্ষে। সেজন্যই ধান-ভানতে এই অতিদীর্ঘ 'কৈফিয়তী' শিবের গীত। তাই এই সুযোগে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে রাখতে চাই: আমরা বুদ্ধিজীবীদের ঐ 'আনন্দ-বার্তা'টা আদৌ মানি না।

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলে দেখতে পাই: নিরস্ত্র গ্রামবাসী সশস্ত্র ডাকাতদলকে তাড়া করে ধরছে। থানা-পুলিসের তোয়াক্কা না করে— বোধ করি পুলিসের উপর আস্থা না থাকায়—পিটিয়ে ঐ অপরাধজীবীদের হত্যা করছে। এটা আইনানুগ সমর্থনযোগ্য কি না সেটা পরের কথা— আমাদের বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গ বাঙালীর

ভীরুতা। পুলিস যেখানে অন্যায় করছে সেখানে নিরস্ত্র মানুষ থানা ঘেরাও করছে। অকুতোভয় বিজন বসু, ডাক্তার শ্যামাপদ, ডি. সি. বিনোদ মেহ্‌তা, তাঁর দেহরক্ষী, মুক্তি সেন, শঙ্কর গুহ নিয়োগী অথবা হাজরা পার্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সেই জাতের সাহস দেখাননি যা দেখিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী মাতঙ্গিনী হাজরা, বেয়াল্লিশের আন্দোলনে? এঁরা কি বাঙালী* নন?

প্রসঙ্গত প্রত্যক্ষজ্ঞান লব্ধ একটি ঘটনার কথা বলি:

মহাত্মা গান্ধী রোড আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি। মাসতিনেক আগের একটি অপরাহ্নে। একটা মারুতি গাড়িতে ছিল জনা-ছয়েক অবাঙালী নওজোয়ান। ঐ দলের দুটি ছেলে ফুটপাতে নেমে পথচারিণী কিছু মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছিল। যেহেতু ওরা দলে ভারী তাই পথচারীরা দেখেও প্রতিবাদ করতে ইতস্তত করছিল। এমন সময় এগিয়ে এল একজন ভদ্রলোক। প্রায় পঞ্চাশ। অতি শীর্ণ, দীর্ঘ দেহ। দৌর্বল্য তার অস্বাভাবিক হেতুতে। 'নকশালপন্থী' বলে প্রায় দু-দশক আগে তাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করে। স্বাধীন ভারতে দীর্ঘতমকাল জেলখাটার সর্বভারতীয় রেকর্ড বোধহয় আছে তার: আঠারো বছর। পুলিসী-অত্যাচারে অষ্টাবক্র মুনির মতো তার অবস্থা। একটা লাঠি নিয়ে তাকে চলা-ফেরা করতে হয়। ঐ দুর্বল শরীর নিয়ে অষ্টাবক্র টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে গেল মরুতি গাড়িটার দিকে। গাড়ির উপর বসিয়ে দিল মোক্ষম এক লাঠির বাড়ি। ছয়-দুকুনে বারোটা চোখ আক্রমণকারীর দিকে ফিরল। পাঁজরসর্বস্ব দুঃসাহসী বুকটা ফুলিয়ে অষ্টাবক্র গর্জে উঠ্‌ল: বাঁদরামোর একটা সীমা থাকবে তো। যাও! ভাগো! নইলে....

আধডজন ঘি-দুধ-খাওয়া নওজোয়ান —যারা হয়তো জন্মেছে ও জেলখাটতে যাবার পর— 'নইলে'র জন্য অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল গাড়িতে। পথচারীরা পলক ফেলার আগেই মারুতি গাড়িখানা হাওয়া।

অপ্রয়োজনে একটি তথ্য পেশ করিনি— পথচারিণীরা সবাই ছিল কলকাতা শহরের সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়ের, আর অষ্টাবক্র জন্মসূত্রে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের, কর্মসূত্রে সাম্যবাদী।

তাই কিছুতেই মেনে নিতে পারি না আধডজন বুদ্ধিজীবীর ঐ 'আর্মচেয়ার থিসিস্' : বাঙালী ক্রমশ ভীতু হয়ে যাচ্ছে।

---

*আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনোদ মেহ্‌তা বাঙালী। যে বিচারবুদ্ধিতে ভিভিয়ান ডিরোজিও, ভগিনী নিবেদিতা, অথবা মানো-এল-দ্য আসম্পসাঁও বাঙালী হিসাবে 'বাঙালী চরিতাভিধান'-এ ঠাঁই পেয়েছেন ["পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বা বাইরে থেকে আগত অথবা বিদেশীয় যেসব ব্যক্তি বাঙলার দর্শন, রাজনীতি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন...তাঁদেরও জীবনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।"] সেই মূল্যায়নে বিনোদ মেহ্‌তা ঐ বাঙ্গালী চরিতাভিধানে ভবিষ্যতে শাশ্বতভাবে ঠাঁই পাবেন। এটাই আমাদের আশা। বাঙালীর অন্তরে তা তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে কোন একজন ভারতীয় পুলিস যদি বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হত তাহলে সমস্ত প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ত। তখন ইংরেজ সরকার শাদা-চামড়া আর নেটিভ-পুলিসের ফারাকটা ভুলে যেত। আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি দিয়ে খুঁজে বার করত আর প্রশাসন দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করত পুলিসের বড়কর্তাদের। এর সঙ্গে এবার তুলনা করুন ডি. সি. পোর্ট মেহ্‌তা এবং তাঁর দেহরক্ষীর খুন হয়ে যাবার ঘটনাটা! পোর্ট-এর 'আলোয় আলো' বাজারটা জিইয়ে রাখতে, তার থেকে মুনাফা লোটার ব্যবস্থাটা অব্যাহত রাখতে কী জঘন্যভাবে নারকীয় হত্যাকাণ্ডটাকে সমাধিস্থ করা হল! এরপর ডিসেম্বর 1992-এর দাঙ্গায় পুলিস যখন লুটেরাদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়, প্রশাসন মিলিটারী নামাতে বাধ্য হয় তখন কোন লজ্জায় পুলিসকে দোষ দেবেন?

প্রশাসনের প্রতিটি প্রাঙ্গণে এই অবস্থা!

অথচ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে এখনো আছেন অনেক-অনেক সৎ-সাহসী-আদর্শবাদী মানুষ— হ্যাঁ, বাঙালীই তাঁরা। ছাত্র, কেরানি, দোকানদার, ঠেলাওয়ালা, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, কারখানার মজদুর, ক্ষেতের চাষী। আবার ওদিকে ডাক্তার, নার্স, এঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, বড় চাকুরে। পুলিস কন্সটেব্‌ল্ এবং অফিসার। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের সর্বগ্রাসী আক্রমণে তাঁরা 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ', 'গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতি', মানবাধিকার সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নীতিবোধকে টিকিয়ে রাখতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন, তবু তাঁরা হার মানেননি! অধিকাংশই আদর্শকে বিসর্জন দেননি। আজও! এই সৎ, ভদ্র, আদর্শবাদী বাঙালীর একমাত্র 'কমন-ডিনোমিনেটার': এঁরা নির্বাচনে দাঁড়ান না, পার্টির হয়ে খাটেন না। এঁরা নির্দলীয়।

☆ ☆

'মানবাধিকার' প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে ষোলই নভেম্বরের সেমিনারের কথা। বামফ্রন্ট আয়োজিত সেমিনার। শিশির মঞ্চে। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বেলা দত্তগুপ্তা। প্রধান অতিথি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ব্যবস্থাপক তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে স্তালিনের প্রয়াণে কমরেড ক্রুশ্চেভ মস্কৌ শহরে যে 'মানবাধিকার' সেমিনার করেছিলেন তার কথা বলতে হয়। প্রথম সুযোগেই ক্রুশ্চেভ জনগণকে রেড্-স্কোয়ারে সমবেত করে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী স্তালিন ছিলেন স্বৈরাচারী! ট্রট্স্কি হত্যা থেকে শুরু করে আজীবন মহামতি স্তালিন বিরোধীপক্ষের মানবাধিকার পদদলিত করে গেছেন। কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করলেই তাকে হয় হত্যা করেছেন অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

ভিড়ের মধ্যে কে যেন বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল, তাহলে অ্যাদ্দিন সে-কথা বলেননি কেন? আপনিও তো ছিলেন তাঁর ক্যাবিনেটে?

সভায় আল্‌পিন-পতন নিস্তব্ধতা। কে বলল কথাটা? ক্রুশ্চেভ মাইক ঘোষণা

করলেন: প্রশ্নটা কে করেছেন? উঠে দাঁড়ান!

কেউই উঠে দাঁড়াল না। ভিড়ের মধ্যে নিশ্চুপ বসে রইল।

মহামতি ক্রুশ্চেভ বললেন, আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন। আমিও একই কারণে অ্যাদ্দিন ভিড়ের ভিতর নিশ্চুপ বসেছিলুম!

শিশিরমঞ্চেও ঘটল অনুরূপ দুর্ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে একটি 'গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতি' আছে। সেই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী 'মানবাধিকার সেমিনারের সভাপতি'র অনুমতি-সাপেক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের মুর্শিদাবাদ কমিটির সভাপতি শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তীর মতে (আনন্দবাজার 22.12.92) প্রশ্নগুলি ছিল এই রকম: কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গুহনিয়োগীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার বদলে রাজ্য সরকার কেন তাঁকে একাধিকবার প্রমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। বামফ্রন্ট আমলে গঠিত সতেরটি বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কেন মাত্র চারটির রায় প্রকাশিত হয়েছে, কেন সেগুলি কার্যকরী করা হয়নি। গত পনের বছরে এই রাজ্যে পুলিশের গুলিতে অন্তত আড়াইশো জন এবং পুলিশী হেফাজতে একশ পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু হলেও কেন রাজ্যসরকার এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে না''....ইত্যাদি। ওদিকে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়িকা মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার: 22.12.92) লিখেছেন নারী সংগঠন হিসাবে সভানেত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন আছে। কারণ রাজ্য-সরকারের নারী-কমিশনের তিনি প্রধান। আমরা যখন কমিশনের কাছে প্রশ্ন রাখব কেন পুলিশের অত্যাচরিতা অর্চনা গুহ আজও সুবিচার পাননি তখন কি তিনি তা এড়িয়ে যেতে পারবেন?''

ঐ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী তিলোত্তমা ভট্টাচার্যও ঐ একই জাতের 'বেয়াড়া' প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে হয়তো কাগজে-কাগজে আবার লেখালেখি হবে। কারণ এ সব প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরা পাটি-ক্যাডারের হাতে ঘুঁষি খেলেন। তারপর পুলিস-ভ্যানে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? স্তালিনের আমলে ক্রুশ্চেভের মানবাধিকার এবং ক্রুশ্চেভের আমলে অজ্ঞাত প্রশ্নকারীর মানবাধিকার-রক্ষার কাহিনী কি ওঁরা জানতেন না? সেদিন শিশিরমঞ্চের সেই সভায় উপস্থিত থাকার কার্ড তো ইসু করা হয়েছিল 'লাল'বাজার থেকে। শ্রোতৃবৃন্দের নির্বাক শ্রবণের মানবাধিকারটুকুই তো শুধু স্বীকৃত হয়েছিল। বেয়াড়া প্রশ্ন করার অধিকার ওঁদের কে দিল?

☆ ☆

শহর-থেকে-দূরে গ্রাম বাংলায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু রাজনীতি-নিরপেক্ষ দেশসেবককে দেখেছি। তাঁরা পল্লীউন্নয়নে ব্রতী। আশপাশের পাঁচদশখানা হিন্দু-মুসলমান গ্রামে তাঁরা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছেন— জাগতিক ও মানসিক।

কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কোনও পার্টি বা পঞ্চায়েত থেকে অর্থসাহায্য পান না, প্রত্যাশাও করেন না। নিজেদের প্রচেষ্টায় তাঁরা ঘরে-ঘরে তাঁত বাসিয়েছেন, টেলারিং ইউনিট খুলেছেন, ফুড-প্রসেসিং সেন্টার খুলেছেন। গ্রামের মহিলা-কর্মীরা দেখলাম লেডিজ সাইকেলে ঘোরাফেরা করছেন। সকলের মধ্যেই দেখলাম আশা, উদ্দীপনা, দৃঢ়-সংকল্পের ছাপ। ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্বত্যাগী সংগঠককে প্রশ্ন করেছিলাম: আপনার কর্মীরা পলিটিক্স্ করে না? ইলেকশানের সময়?

বললেন: করে তো। পঞ্চায়েতের একজন প্রভাবশালীর মেয়ে আমাদের স্কুলে পড়ায়, পার্টি-মস্তান এবং খুনীর ভাই আমাদের সক্রিয় কর্মী। ওদের কাজে লাগাবার আগে আমি বলেছিলাম: মসজিদ শেহানে পদার্পণের আগে অথবা মন্দির-চাতালে উঠ্বার আগে জুতো-জোড়া বাইরে খুলে রাখিস্ তো? এখানেও তাই রাখবি। আশ্রমের বাইরে। তারপর কাজ-কর্ম সেরে বাড়ি যাবার সময় আবার জুতো-জোড়া পায়ে দিয়ে নিস্। পায়ের তলায় থাকবার জন্যই তো আছে ওরা—

বলি: জুতো-জোড়া? মানে?

গোপালদা হেসে বললেন, কেন? আপনি জানেন না: জুতো সবসময় জোড়ায়-জোড়ায় হয়? একটা ডান একটা বাম?

সামলে নিয়ে বলি, ও হ্যাঁ, বুঝেছি। রাজনৈতিক কোন দলের সাহায্য তো পান না, বাধা পান?

—প্রথম প্রথম পেতাম। ওরা জোর করে ফসল কেটে নিয়ে যেত অথবা গাছের ফল, কখনো বা গোটা গাছ। ক্রমে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

—কী ভাবে?

—প্রথমত প্রশাসন আমাদের দিকে। ঐ যাঁদের রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা 'বুরোক্রেসী' বলেন। তাঁরা তো সাহেব নন, এবং পরবর্তী ইলেকশনের আগেই দো-হাত্তা লোটার মনোবৃত্তি নেই। অধিকাংশই আমাদের আন্তরিক সাহায্য করেন। ক্রমে আশপাশের গ্রামের মানুষও দলবেঁধে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। তাই মস্তান-পার্টি আমাদের এড়িয়ে চলে—কী ডান, কী বাম! তাছাড়া কয়েকজন প্রাক্তন-ডাকাত—রাজনৈতিক পার্টির নয়— প্রফেশনাল ডাকাত— আমাদের সক্রিয় কর্মী। তাদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু হলে কি হয়? মরা হাতি লাখ টাকা। তাই রাজনৈতিক মস্তানেরা তাদের ভয় করে।

এজন্যই বলতে পারি: আর্থসামাজিক ক্রমাবক্ষয়ে বাঙ্গালী তার ঐতিহ্য, তার মানবাধিকার-বোধ, তার নীতিগত মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেনি। সে ভীতু হয়ে যায়নি আদৌ। নির্বাচন-থেকে-নির্বাচন যাঁদের দেশ-শোষণের মেয়াদ, সেইসব রাজনীতি-ব্যবসায়ীর সর্বগ্রাসী নির্মম অত্যাচারে সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য—মান-ইজ্জৎ-নিরাপত্তা— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত দেহ-মন নিয়ে সে আজও লড়াই করে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যের কথা: সেই লড়াইয়ের

ইতিকথা আজ আর কেউ বলছে না, লিখছে না, টি. ভি.-র পর্দায় ফুটিয়ে তুলছে না! সে দোষ আমাদের—দক্ষিণ ও বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের।

তাই আমার একটা প্রস্তাব আছে:

কোন সংবাদপত্রে কি আর একজাতের একটি সমীক্ষার আয়োজন করা যায় না? রাজনীতি করে না, এমন কিছু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইন্টারভিউ নিয়ে? এমন মানুষ, যারা দিন আনে, দিন খায়। চাক্‌রি হয়তো করে— সরকারী বা বেসরকারী— কিন্তু কোয়ার্ডিনেশন-ফেডারেশন বা ইউনিয়নবাজি করে না। দাদারা 'বন্‌ধ্‌' ঘোষণা করে যখন ঘরে বসে তাস-পেটেন এবং মাহিনা পান তখন পেটে কিল মেরে একদিনের উপার্জন জলাঞ্জলি দেয়? সমীক্ষাটার বিষয়বস্তু হোক: বাঙালী শিল্পীসাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কি ক্রমশ ভীতু হয়ে যাচ্ছেন?

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কোনও বর্তমান-সম্পাদক কি প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখবেন?

☆ ☆

তাই বলছিলাম: ওটা কখনোই শেষ কথা হতে পারে না:

এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা! এমনটা তো হয়েই থাকে।

শেষ কথা: না! এমনটা হবার কথা নয়! এমনটা আমরা হতে দেব না!

পারেন তো সে কথাই বলুন। জোর গলায়। রাস্তায় নেমে এসে। বলান এই অধম বৃদ্ধকে দিয়ে। তাহলে এই উনসত্তর বছর বয়সে সে-বৃদ্ধ মহব্বতের কিস্‌সা লেখার ধাষ্টামোকে ত্যাগ করে গুটিগুটি পথে নেমে আসবে। যেমন এসেছিলেন 'গরম হাওয়া' ছায়াছবির শেষ দৃশ্যে প্রফেসর বলরাজ সাহানী!

কিন্তু একটা শর্ত আছে!

আপনাদের মিছিল দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, অর্থাৎ কায়েমীস্বার্থপন্থী হলে চলবে না। আপনাদের হাতে তখনই হাত মেলাব যখন আপনারা হবেন: সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী!

যতদিন আপনারা সে ব্যবস্থা করতে না পারছেন ততদিন ক্যাডারপুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এই নৈরাজ্যে 'একঘরে বিকর্ণের' ছোট্ট ভূমিকাতেই আমাকে অভিনয় করতে দিন না?

'তামাম ন-শুদ্‌'

পারুল সাহানী

31.12.92



‘নবীন কায় নায়, অসচ ঝালে আস্তে’ : ইন্দোর



ইন্দোরের প্রাদেশিক মারাঠী লব্‌জে বলেছি বলে আপনাদের বোধহয় মালুম হল না। কথাটা চিরপুরাতন — বলা যায়: ‘ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে’। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বিদেশী শাসকদের আমল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশী শোষকদের আমলে—সমান তালে। শাদা বাঙলায় ঐ মারাঠী লব্‌জটির অনুবাদ:

‘নতুন কিছু নয়, এমনটা তো হয়েই থাকে।’

কেমনটা?

যেমনটা রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখতে পান। প্রভেদ এই যে, সে-আমলে রাজা-রাজড়া-নবাবেরা পুরুষানুক্রমে গদিতে আসীন হতেন, বংশানুক্রমে অপকীর্তি করে যেতেন। ইদানীং ভারত স্বাধীন হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বংশানুক্রমটা বজায় থাকলেও খাতাকলমে আমরা একটা সংবিধান মেনে চলি। পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী। এমনকি মার্কস্-এংগেল্‌স্-লেনিন—যাঁরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাসী ছিলেন না—তাঁদের চেলা হলেও। উপায় কী? ‘দেশসেবা’ করার পবিত্র তথা লোভনীয় দায়িত্ব তো ঐ তুচ্ছ কারণে ত্যাগ করা চলে না।

ওঁরা কী ভাবে দেশ শাসনের নামে দেশ-শোষণ করবেন — গাড়ি-বাড়ি-সুইস ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বৃদ্ধি করবেন—হেলিকপটারে চড়ে যানজট এড়িয়ে আমাদের মাথার উপর উড়বেন, তা আমরা জানি; কিন্তু ‘কে’ করবেন তা আগেভাগে জানি না। সেটা আমরা চার-পাঁচ-বছর অন্তর ভোট দিয়ে স্থির করি। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য ক্ষমতাশীল সরকার ওটুকু পরিশ্রমও আমাদের করতে দেন না। ক্যাডার-বাহিনী মারফৎ রিগিং এবং ছাপ্পা ভোটের এন্তাজাম করে থাকেন। আমরা বাড়ির মধ্যে তালাবন্ধ পড়ে থাকি। আমাদের ভোট পড়ে যায়। আগামী চারবছরের জন্য শোষণ-ব্যবস্থার দেশসেবক-নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

☆ ☆

এমনটা তো হয়েই থাকে

আমি আজ আপনাদের এক নারীনিগ্রহের কাহিনী শোনাতে বসেছি। বাস্তব ঘটনা। তবে আমি তো আদালত-এলাকার লোক নই, স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় কীটদুষ্ট লীগাল জার্নাল ঘেঁটে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি সেটুকুই পরিবেশন করি। অনেক দিনের পুরাতন কেস। প্রায় আমার জন্মের সমসময়ের ঘটনা।

আপনারা অবশ্য বলতে পারেন: নারী-নিগ্রহের কেচ্ছায় আর নতুন কী শোনাচ্ছ, হে লেখক? গত চার বছরে এই পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের হিসাবে নারী-নিগ্রহ বৃদ্ধির হার 58.57% । গত বৎসর, অর্থাৎ 1991 সালে, নারী-ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেছে 442টি। দৈনিক একটির বেশি। এটা অবশ্য থানায় ডায়েরি-করা ঘটনার খতিয়ান। যেসব হতভাগিনী অথবা তাদের অভিভাবক ডায়েরি করেননি, সেগুলি আমাদের হিসাবের বাহিরে। একই সময়কালে বধূহত্যা হয়েছে 217টি, নারী-আত্মহত্যা 764! এ তথ্যের মূল সূত্র পুলিসের ডিরেক্টার-জেনারেলের কাছে দাখিল করা পশ্চিমবঙ্গ পুলিস-অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক রিপোর্ট। কথাসাহিত্যিকের কপোল-কল্পনা নয়।

সবচেয়ে লজ্জার কথা, সবচেয়ে আপশোসের কথা—যাঁদের হাতে দেশ-শাসনের অধিকার বর্তেছে তাঁদের মতে:

'—এমনটা তো হয়েই থাকে!'

কেমনটা?

ধরুন, হাটের মাঝখানে পদস্থা গেজেটেড মহিলা-অফিসারের বস্ত্রাপহরণ ও হত্যা। সরকারী গাড়ি চালকের লাস হাটের মাঝে ফেলে দেওয়া।

এমন নিখুঁত ব্যবস্থা যে, হাজার হাটুরের মধ্যে একজনও প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কতকগুলো সংবাদপত্র — অধিকাংশই বুর্জোয়া-মালিকানার—এমনই হই-চই জুড়ে দিল যে, পুলিস-কেস একটা করতেই হল। প্রত্যক্ষদর্শী থাক-না-থাক গুটি-তিনচার মস্তানকে শেষমেশ সশ্রম কারাদণ্ডই দেওয়া হল। কিন্তু এতবড় অত্যাচার যেসব নেপথ্য-নায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, তাঁরা যথারীতি অধিষ্ঠিত রইলেন নিজ নিজ গদীতে।

একই ঘটনা ঘটল দিল্লীর রাজপথে। সর্বসমক্ষে ট্রাকে চেপে এসেছিল গেস্টাপোবাহিনী। হত্যা করে গেল সফদর হাশ্‌মিকে। অথচ আদালতে দাঁড়িয়ে উঠে কেউ বলতে পারল না: হ্যাঁ হুজুর, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

অভিনেত্রী শাবানা আজমি ব্যতিরেকে কোন বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না। কী জানি, যদি আগামী বছর সরকারী পুরস্কার বা খেতাবটা ফসকে যায়: পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, হ্যানো-পুরস্কার ত্যানো পুরস্কার।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে বিভাগীয় তদন্তে কমিশনার মিস্টার জাস্টিস্ র‍্যান্‌কিন প্রশ্ন করেছিলেন জেনারেল ডায়ারকে:

Q. After the firing took place did you take any measures to attend to the wounded?

A. No. Certainly not! It was not my job. The hospitals were

open and they could have gone there.

Q. Was the action of yours, which as we know has resulted in four or five hundred people being killed, approved by the Punjab Govt.?

A. I believe so, certainly.

তফাৎ এই: পরাধীন যুগে অপরাধীকে আদালতে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হত। স্বাধীন যুগে হয় না। মেহামের হত্যাকাণ্ড, সফদর হাশ্‌মির খুন, বানতলার নৃশংসতা, বিরাটি বা হাওড়ার গণধর্ষণের 'নায়ক' বা 'নেপথ্য-নায়ক'দের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়নি। যদি যেত তাহলে তারাও নিশ্চয় বুক ফুলিয়ে বলত: I believe so, certainly!

আগেই বলেছি, আমি আজ আপনাদের এক নির্যাতিতা অষ্টাদশীর কাহিনী শোনাতে বসেছি। ঘটনা এই শতাব্দীর প্রথম পাদের। সেবার দুঃশাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব্রিটিশ-শাসকবৃন্দের পদলেহী ইন্দোরের মহারাজাধিরাজ: তুকাজিরাও হোলকার। নির্যাতিতা তরুণীর নিরুপায় জননী ছিলেন অমৃতসরের বাসিন্দা। দুঃশাসনের অপকীর্তির দীর্ঘ তালিকা এবং চরম আঘাতের আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি মাতা ও কন্যার নিরাপত্তার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন অমৃতসরের লালমুখো প্রশাসক পুলিস-কমিশনার পাক্‌ল্‌-এর কাছে। লাহোর থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে (Famous Trials of Love & Murder) প্রাকস্বাধীনতাযুগে কে. এল. গাওবা লিখেছিলেন:

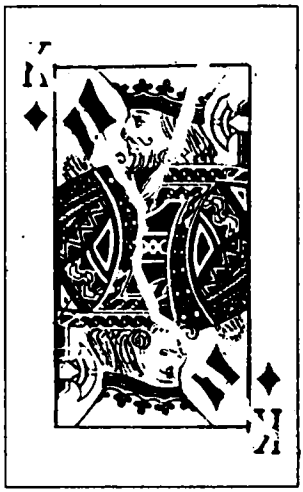
> To this plea for protection, the lady received the following intelligent and sympathetic response from the protector of Law & Order:
>
> > May be returned to the applicant. On the facts stated there is no ground for taking any cognizance.
> >
> > 6.1.1925 Sd. F. H. Puckle
> > Commissioner of Police
> > Amritsaar.

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদে যা: "এমনটা তো হয়েই থাকে"।

প্রসঙ্গত জানাই, কমিশনার-সাহেব আবেদনপত্রটি অগ্রাহ্য করার ছয় দিনের মধ্যেই—জানুয়ারির বারো তারিখে হত্যাকাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন ভারতে পুলিসের চাকরি ছিল একটু অন্যরকম। তাই দিল্লীতে সফদর হাশ্‌মির ক্ষেত্রে যা হয়নি, অথবা মেহাম-হত্যায় যেটা হল না, সেবার তা হয়েছিল। অপরাধীরা ধরা পড়েছিল। সংক্ষিপ্ত বিচার-অন্তে তিন-তিনজন ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছিল। তবে ঐ—জ্ঞানপাপী পাক্‌ল্‌-সাহবের সার্ভিস-রেকর্ডে কোনও কালির আঁচড় লাগেনি। সফদর হাশ্‌মি, অনিতা ধাওয়ান, পোর্ট পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মেহ্‌তা-সাহেবের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য-নায়কদের গায়ে যেমন আঁচড় লাগেনি। এখানেই স্বাধীন-পরাধীন যুগের সাদৃশ্য! বরং গল্পটা শুনুন।

☆ ☆ ☆



বাওলা-সাহেবের নাইনটিন নাইনটিন মডেলের প্রকাণ্ড ক্রাইসলার গাড়িখানা ক্রফোর্ড মার্কেট পার হয়ে বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পিছনের সীট থেকে একক যাত্রী নির্দেশ দিল, আগ্‌লি সড়কসে থোড়া বাঁয়ে যানে পড়েগি, মক্‌বুল!

চালক রিয়্যারভ্যু দর্পণে আরোহীকে দেখে নিয়ে বললে, মুঝে মালুম হ্যয়, সাব। ইসি লিয়ে তো আপনে দো ঘণ্টা পহ্‌লে নিকলে হেঁ।

—তুম জানতে হো? পহ্‌চন্তে হো মেরা ঘর?

বৃদ্ধ মক্‌বুল ম্লান হেসে বলে, বিশ সাল হো চুকা মেরা নোকরি।

তা বটে। মকবুল পুরানো জমানার লোক। বিষ্ণু যখন স্কুলে পড়ত, ঐ সামনের মাঠে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের হয়ে ব্যাট করতে নামত, তখন থেকেই মক্‌বুল ওর গুণগ্রাহী। আর বাওলা-সাহেবের ঋণ তো জীবনে কখনো পরিশোধ করা যাবে না। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় দশ বছর বয়সে। ওদের স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিব্যুশান করতে এসেছিলেন আবদুল কাদের বাওলা। তখনো উনি 'সিটি-ফাদার' নন, বোম্বাই কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলার মাত্র। ফুটফুটে একটি ছেলেকে একের-পর-একটি প্রাইজ নিতে আসতে দেখে ডেকে আলাপ করেছিলেন। শোন তো এদিকে। তোমার নাম তো শুনলাম বিষ্ণুগণেশ চতুর্বেদী। তোমরা ব্রাহ্মণ?

—ইয়েস স্যার!

—কোথায় থাক? বাবা কী করেন?

পাশ থেকে প্রিন্সিপাল ঝুঁকে পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুর পিতাজী কট্টর ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত মদনমোহন চতুর্বেদী। যজন-যাজন বৃত্তি। একমাত্র পুত্রটিকে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতেই তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল; কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলকের বন্ধু, শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জাপের মন্ত্রশিষ্য। 1893 খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-শহরে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয় তাতে বিষ্ণুর ঠাকুর্দা শান্তি মিশনে প্রত্যক্ষ অংশ নেন এবং একটি পা বিসর্জন দেন। তিনি ক্রাচ্ বগলে আজীবন ছিলেন লোকমান্য তিলকের গুণগ্রাহী। তাঁরই নির্দেশে বিষ্ণুগণেশকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিষ্ণুর পিতাজী।

বাওলা-সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, বড় হয়ে কী করতে চাও? হোয়াট্‌স্ য়োর অ্যাম্বিশন, লিট্‌ল্-ওয়ান?

—বিলেত যাব।

—ব্যাস্? বিলেত গিয়ে কী শিখবে? ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং? নাকি আই.সি.এস. দেবে?

বালক বিষ্ণুগণেশ সেদিন জবাব দিতে পারেনি। 'আই.সি.এস.' শব্দটার মানেই তখন জানত না।

পরে জেনেছিল। বি.এ.-তে ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হবার পর, যখন ঐ একই প্রশ্ন করতে শুরু করল সবাই। ও রাজি হয়নি। সেটা উনিশশ বিশ সাল। মহাত্মা গান্ধী অনেকদিন হল ফিরে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ততদিনে ওর ঠাকুর্দাও চলে গেছেন মহানেপথ্যে। পণ্ডিতজী কৃতী পুত্রকে পরামর্শ দিলেন অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে। বিষ্ণু দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিল।

—তুমি কি ঐ ম্লেচ্ছভাষায় এম. এ. পাস করতে চাও?

বি. এ.-তে ওর ইংরেজিতে অনার্স ছিল।

—আজ্ঞে না, আমি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাব।

—কী? বিলেত! কালাপানির ওপারে?

—আজ্ঞে না, পিতাজী। 'কালাপানি' বলে কোথাও কিছু নেই। সমুদ্রের জল সর্বত্র নীল, এমনকি লোহিত সাগরেও। পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারের পূর্বযুগে ভারতীয় বণিকদল অর্ণবপোত নিয়ে চীন থেকে আরবে বাণিজ্য করতে যেত!

—জানি। ফিরে এলে তাদের জাতিচ্যুত করা হত।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চার-পাঁচশ বছর আগে। জাতিচ্যুত দক্ষ হিন্দু নাবিক মুসলমান হয়ে যেত, নাথপন্থী হয়ে যেত, খ্রীস্টান হয়ে যেত। কিন্তু সেসব তো অতীতের কথা পিতাজী। এটা বিংশ শতাব্দী! মহাত্মাজী তো.....।

পণ্ডিতজী গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তুমি 'পড়িলিখি' আদমি। তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু এটুকু জেনে রাখ, আমার আদেশ অমান্য করে যদি তুমি কালাপানি পাড়ি দাও....।

পিতার আদেশ অমান্যই করেছিল। গুণগ্রাহী বাওলা-সাহেবের পরামর্শও কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। না, আই. সি. এস্. পরীক্ষা সে দিতে চায় না। সেটা উনিশশ বিশ সাল। জালিয়ানওয়ালাবাগ সদ্য-অতীত। রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ঐ চাকুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে বিষ্ণুগণেশ 'কালাপানি' পার হল ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিতে। পিতার অভিশাপ আর বাওলা-সাহেবের আশীর্বাদ পাথেয় করে।

ফিরে এল তেইশ সালে। পণ্ডিত মদনমোহন চতুর্বেদী তাঁর একমাত্র পুত্রটিকে ভদ্রাসনে প্রবেশ করতে দিলেন না। ওর মা যে ঠাকুরঘরে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছেন সেটা টের পাওয়া গেল পুত্র বিতাড়নের পরে।

বিষ্ণু বোম্বাইয়ে থাকল না। লাহোর আদালতে প্র্যাকটিস্ শুরু করল। পণ্ডিতজী টের পেতেন মায়ে-ছেলের পত্রবিনিময় হয়ে থাকে—এতে বাধা দেননি কোনদিন। কিন্তু ছাঁ যে বাবাকে লুকিয়ে মাকে তার উপার্জনের অংশ পাঠায় এটা জানতে

পারেননি সরল সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষটি।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সরু গলির মুখটায়। এ গলিতে ঐ প্রকাণ্ড ক্রাইসলার গাড়িটা ঢোকানোর চেষ্টা মুখামি। দূরত্বও তো সামান্য। বিষ্ণুগণেশ নেমে পড়ল। পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল পশ্চিমমুখো।

অপরাহ্ণের শহরতলী। ঘরে-ফেরা মানুষজনের ভিড়ে এখনো কলকোলাহলমুখর হয়ে ওঠেনি, তবে দুপুরের মতো নির্জনও নয়। দু একজন লোকজন যাতায়াত করছে। তাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ হঠাৎ ওর মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বাঁ-হাতে লাঠি, ডান-হাতখানা পড়ন্ত রোদে আড়াল-করা। পাকা ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গেল। ইংরেজিতে বললেন, মাপ করবেন,....আপনি....ইয়ে বিষ্ণু না?

বিষ্ণু চিনেছিল ঠিকই। পাশকাটাতে চেয়েছিল। এখন ধরা পড়ে গিয়ে বলে, কোঠারি-চাচা! উঃ, কদ্দিন পরে! কেমন আছেন বলুন?

বাঁ-হাতে টুপিটা মাথা থেকে খুলে নত হয়ে প্রণাম করতে যায়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ। আবাল্য পরিচিত। বৃদ্ধই তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে বলে ওঠেন, দেখ বাপু। ফস্ করে অবেলায় ছুঁয়ে ফেল না যেন। আমার সর্দির ধাত—অসময়ে ছান করতে হলে...

—আজ্ঞে না, না, সে কি আমি জানি না?

স্পর্শ-বাঁচানো প্রণাম সেরে বলে, শরীর-গতিক ভাল তো?

—আর শরীর। বাজারে যে আগুন লেগেছে তাতে মানুষজন দু-বেলা দু-মুঠো মুখে দিতে পারছে? অনাহারে শরীর তো...তা সে যাক! তোমার খবর কী বল? লাহোরেই আছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাঃ বাঃ। প্র্যাকটিস বেশ জমে গেছে দেখছি। ঐ গাড়িটা কি নতুন কিনলে?

গাড়িটা যে ওর নয় এটা স্বীকার করল না। মিথ্যাও বলল না, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বলল, একটু তাড়া আছে চাচা—ট্রেন ধরব। চলি—

—শোন, শোন বাবা। একটা কথা—

—বলুন?

—তোমাদের ঐ লাহোর আদালতে শুনেছি হাওয়ায় টাকা ওড়ে। আমাদের শিবনাথটাকে ঢুকিয়ে দিতে পার? মুহুরি-টুহুরি—নেহাৎ কোর্ট-পেয়াদা করেই। লেখাপড়া তো শিখল না—আর তুমি হলে গিয়ে ব্যারিস্টার সা'ব!

বিষ্ণু বললে, অতদূরে চাকরি করতে পাঠানো কি ঠিক হবে, কোঠারি-চাচা? চাকরি জোগাড় করা শক্ত নয়, কিন্তু জাত-ধম্মো রাখা অসম্ভব। ও আপনাদের নিষ্ঠাবান পরিবারে পোষাবে না।

বৃদ্ধ খপ করে ধরে ফেলেন ওর বাহুমূল। বলেন, বিদেশ বিভুঁইয়ে কে-কী করছে কে দেখতে যাবে? একটা প্রাচিত্তিরটিত্তির করে নিলেই হবে। তুমি যদি

রাজি থাক...

—আপনি তো জানেনই চাচা, প্রায়শ্চিত্তে আমি রাজি নই।

হাতটা ছাড়িয়ে হন্‌হন্‌ করে চলতে থাকে। বৃদ্ধ আরও কিছু বলতে চাইছিলেন। ছুঁয়েই যখন ফেলেছেন তখন...

কিন্তু বিষ্ণুগণেশের মনটা ততক্ষণে বিষিয়ে গেছে।

অবশেষে লাল টাক্‌-পয়েন্টিং করা সেই সাবেকি বাড়িটার সামনে। অপরাহ্ণ-বেলায় সদর বন্ধ। দোতলায় জানলা খোলা। কড়া নাড়ল কিছুক্ষণ। ভিতরে পদশব্দ। কে-যেন এসে ভিতর থেকে হুড়কো খুলে দরজার পাল্লাদুটো একটু ফাঁক করে মুখটা বাড়ালো। অচেনা ছোকরা। বছর দশ-বারোর। উদাম-গা, পরনে হাফপ্যান্ট। আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মারাঠীতে বললে, সন্ধ্যার পর আসবেন। পণ্ডিতজী বাড়ি নেই। যজ্ঞ করতে গেছেন।

বিষ্ণু বললে, সে তো খুবই শুভ সংবাদ। তুমি মাইজীকে খবর দাও। বল লাহোর থেকে একজন এসেছে...

—কী বেচতে এসেছেন, বলুন দিকিন? হাতে ঝোলা-টোলা তো কিছু নেই।

ভিতর থেকে প্রৌঢ়াকণ্ঠে কে-যেন বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস্‌ রে মুন্না? কী চায় লোকটা?

—একজন বেগানা আদমি, মাইজি। অবিশ্যি সাহেবি কেতার—

বৃদ্ধা এগিয়ে এসে পাল্লাদুটো ঠেলে খুলে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন: ওমা! তুই? খোকা!

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর মায়ে-ছেলেব এই প্রথম সাক্ষাৎ। ইতিপূর্বে চৌকাঠের বাইরে থেকেই বাড়িওয়ালা পণ্ডিতজী ব্যারিস্টার-সাহেবকে ইজেক্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৃদ্ধা বোধকরি দেহভার রক্ষার প্রয়োজনেই যুবক পুত্রের দুই বাহুমূল চেপে ধরলেন। টেনে নিলেন তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকে।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, জুতো-জোড়া আগে খুলি। নাহলে এই অবেলায়...

কে-কার কথা শোনে।

বৃদ্ধা জোর করে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে এসে ওকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে।

শোনা গেল, পণ্ডিতজী গেছেন এক যজমানের বাড়ি যজ্ঞ করতে। ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যাবে। বৃদ্ধা জানতে চাইলেন, তুই যে একেবারে খালি হাতে? তোর মালপত্র কই? একটা খবরও তো দিস্‌নি যে, আজ আসছিস্‌!

ম্লান হাসল বিষ্ণুগণেশ। বললে, আমি পর্শু এসেছি মা! জানই তো সব। তাই বাওলা-সাহেবের গেস্ট-হাউসে উঠেছিলাম। আজ—এই এখনি স্টেশন যাচ্ছি। সন্ধ্যা ছয়টা দশে আমার ট্রেন—লাহোর এক্সপ্রেস। এ ছেলেটি কি নতুন বহাল হয়েছে? কী নাম? মুন্না!

মুন্না বোকা নয়। চট করে একটা পেন্নাম সেরে নিয়ে বললে, আপনকার নাম রামু, সবকোই বোলতা মুন্না!

বিষ্ণু বললে, চট করে এক গ্লাস খাবার জল নিয়ে আয় তো রামু। কাঁচের গ্লাসে অথবা পেতলের ঘটিতে...

—শুধু জল খাবি কিরে?—মা প্রতিবাদ করেন।

বিষ্ণু ওঁর হাতে একটু চাপ দেয়। রামু অন্তরালে যেতেই কোটের ইনসাইড-পকেট থেকে একটা মোটা ম্যানিলা-খাম বার করে মায়ের হাতে ধরিয়ে দেয়। বলে, এটা আলমারিতে তুলে রেখে এস। আমি অপেক্ষা করছি।

বিস্মিতা বৃদ্ধা বলেন, এ যে অনেক রে! কত আছে এতে?

—পরে সুযোগ মতো গুণে দেখ। লুকিয়ে পাঠাতে হয় তো! পিতাজী যদি টের পেয়ে যান....

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই বস!... তা এখনি ট্রেন ধরতে হবে? একটা রাত থেকে গেলে...

—তুমি তো সব জানই মা! ওঁর সংস্কারকে আমি স্বীকার করি না, কিন্তু নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করি। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে তিনিই কি কম কষ্ট পাচ্ছেন?

ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা।

—অ্যাই দেখ, কাঁদতে শুরু করলে তুমি! থাকব তো আধঘণ্টা, তার মধ্যে কেঁদেই যদি...

বৃদ্ধা চোখ মুছে বললেন, মুগের নাড়ু খাবি?

—আলবাৎ। বোয়ামশুদ্ধ দিয়ে দাও আমাকে। অর্ধেকটা নামিয়ে দেব রুক্মিণীকে। তাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। সে আসবে আমার সঙ্গে জলন্ধরে দেখা করতে।

বৃদ্ধা দারুণ খুশি হলেন। রুক্মিণী বিষ্ণুগণেশের ছোট বোন। স্বামীর ঘর করছে জলন্ধরে। বৃদ্ধা বললেন, ঘরে-করা চাপাটি আছে ও-বেলার জন্য। আর আলু-ভিণ্ডির তরকারি। খাবি?

বিষ্ণু বুঝতে পারে মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। উৎসাহে সে লাফিয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই! নিয়ে এস। এখানে বসেই খেয়ে নেব। তুমি আবার রেঁধ!

হাতে-গড়া চাপাটি, আলু-গোবি আর আলু-ভিণ্ডির তরকারি দিয়ে আরাম করে ভরপেট খেয়ে নিল। সত্যিই আরাম করে। কতদিন পরে মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছে। মা হঠাৎ জানতে চায়, হ্যাঁরে, একা-একা হাত পুড়িয়ে আর কতদিন খাবি? যা হয় একটা ব্যবস্থা কর?

—সাদির কথা বলছ? তাড়া কী?

—বিলেতে কোন মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়নি?

—আলাপ কেন হবে না? ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

—এখানে কে তোকে রেঁধে দেয়? লাহোরে? হোটেলের খাবার খাস নিত্যি ত্রিশ দিন?

—না মা। আমি একজনের পেয়িংগেস্ট হিসেবে আছি।

—কী বল্‌লি? ঐ ইংরেজি কথাটার মানে কী?

—মানে টাকার বিনিময়ে অতিথি-হিসাবে থাকা। আমার এক বন্ধু প্রীতম সিং—পাঞ্জাবী, বড়লোকের ছেলে—তার বাড়িতে চারখানা ঘর। ও একখানা ঘর আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওর বউ আমাকে সকালে জলখাবার বানিয়ে দেয়, রাতের খাবারও। দুপুরে আদালতে আমি হোটেলে খাই। দিব্যি চলে যাচ্ছে।

মা জানতে চায়, তোর বন্ধুর বউ কি মেমসাহেব? ছোট ছোট চুল? নীল চোখ? খুব ফর্সা?

বিষ্ণু অবাক হয়। বলে, আশ্চর্য। তুমি কেমন করে জানলে?

মা হাসল। বললে, এখানে গুজব রটেছে—তুই মেমসাহেব বিয়ে করে ফিরে এসেছিস্। তাতেই বাপের সঙ্গে ঝগড়া। তোর বউ-এর চুল ছোট-ছোট, চোখ নীল, খুব ফর্সা। খাশ মেমসাহেব! লাহোরে স্বচক্ষে দেখে এসেছে হরজীবন আর তার বৌ!

বিষ্ণু প্রাণখোলা হাসল। বলল, মিথ্যা বলেনি ওরা। অ্যানকে নিয়ে টাঙা করে অনেকদিন বাজারে গেছি।

মা বললে, দ্যাখ খোকন, আমি বিশ্বাস করিনি। তাই চিঠিতেও লিখিনি। রুক্মিণীও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি হলেও আমি বুক চাপড়ে কাঁদতে বসতাম না!

—তার মানে?

—তার মানে, তোর যদি কোনও মেয়েকে পছন্দ থাকে ... না, না, আমাকে বল্‌তে দে—ভবিষ্যতেও যদি কাউকে ভালবাসিস, তাহলে আমাদের কথা চিন্তা করিস্ না। জেনে রাখিস, তুই সুখী হলেই আমরা সুখী।

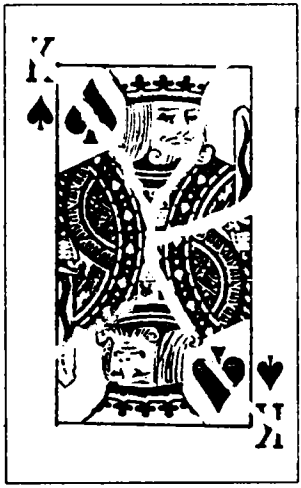
—'আমরা' নয় মা। বল, 'আমি'। পিতাজীর এটা বরদাস্ত হবে না।

—না হল, নাই হল। সে তো ব্যাটার মুখদর্শন করে না। না-হয় ব্যাটা-বৌয়েরও মুখ দেখবে না। বড়জোর রাগ করে বলবে: আজ আমার উপবাস। তা, মাসে তো তার দশদিনই ব্রত-পার্বণের উপোস চলে—এগারোদিন হলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

বম্বে থেকে দিল্লী পৌঁছালো নিরুপদ্রবে।

দিল্লীতে ট্রেন বদল করতে হবে।





আজ থেকে সত্তর বছর আগেকার কথা।

সে-আমলে দিল্লী থেকে লাহোর যাওয়ার প্রয়োজনে আগাম টিকিট কেটে স্থান-সংরক্ষণ করতে হত না। ফার্স্ট ক্লাসেও। যে আগে এসে বিছানা পেতে ফেলত এক-রাতের মতো বেঞ্চিটার দখল তার। পরবর্তী আগন্তুক লালমুখো হলে অবশ্য অন্য কথা।

কাউন্টারে গিয়ে লাহোরের একখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে ঘড়িটা দেখল। এখনো প্ল্যাটফর্মে ট্রেন লাগেনি: দিল্লী-লাহোর এক্সপ্রেস। অগত্যা ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম। সে-আমলে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট-হোল্ডারদের বাড়তি পাওনা ছিল: ওয়েটিং-রুমের খিদ্‌মৎগারের সেলাম। বিষ্ণু তার জিম্মায় মালপত্র নামিয়ে দিয়ে কুলিকে বললে, লাহোর এক্সপ্রেসসে যানা হ্যায়।

কুলিটা সেলাম করে বিদায় হল। সময়ে সে ফিরে আসবে।

বিষ্ণু বিশ্রামাগারের লোকটাকে বললে, সামান পর জারা নজর রাখনা। ম্যয় হুইলার-স্টলপ্যে যাতা হুঁ।

লোকটি পুনরায় সেলাম করে বললে: বহুৎ খুব।

রাতে ট্রেনে পড়বার জন্য একটা জমাটি থ্রিলার কিনে ফেলা দরকার। 'বুক-শপে'র দিকে চলতে চলতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ রীতিমতো চমকে উঠে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ইন্টার-লেডিস্ বিশ্রামাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি আস্‌মানী হুরী! অতি অপূর্ব সুন্দরী। চম্পকগৌর গাত্রবর্ণ; কিন্তু মেমসাহেব নয়। টানা-টানা সূর্মা-আঁকা চোখ। বয়স আঠারো থেকে বিশের মধ্যে। পরনে কনকচাঁপা রঙের সামনে-আঁচল শাড়ি, আঙরাখা—ঐ রঙেরই দোপাট্টা। নিঃসন্দেহে রাজস্থানী ঘরানা ঘরের মহিলা। বিবাহিতা? বোঝার উপায় নেই। বিষ্ণুগণেশের মনে হল এমনই এক পদ্মিনী-নারীর প্রতিবিম্ব দেখে একদিন আলাউদ্দীন খিলজীর মাথা ঘুরে গেছিল।

কী আশ্চর্য! মেয়েটি হাতছানি দিয়ে ওকেই ডাকছে।

নিঃসন্দেহ হতে বিষ্ণুগণেশ নিজের পিছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। না, তার পিছনে ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই। অর্থাৎ মেয়েটি ওকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ও দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল মহিলা-প্রতীক্ষালয়ের দিকে। মেয়েটিও দ্বার ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে দু'পা এগিয়ে এল। দুজনে শ্রুতিসীমার মধ্যে আসামাত্র আর এক বিস্ময়! মেয়েটি বললে: উড য়ু প্লীজ হেল্‌প্ মি?

লেডিজ-ওয়েটিং রুম থেকে একটা জিরাফ বার হয়ে এলে এর চেয়ে বেশি অবাক হত না বিষ্ণুগণেশ। উনিশশ' পঁচিশ সালে দিল্লী স্টেশনে রাজস্থানী পোশাক-পরা

এক অন্তঃপুরচারিণীর মুখে ইংরেজি!!

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার আগেই বিষ্ণুর মনে হল ওর পাঁজর-ঘেঁষে কে-যেন ঘনিয়ে এসেছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটাকে—দশাসই পাট্টা জোয়ান। চুস্ত-শেরওয়ানি পরনে। দেহরক্ষী ধরনের চেহারা। মাথায় প্রকাণ্ড রঙিন উষ্ণীষ, কোমরবন্ধে খানদানী তরবারি। চোখাচোখি হতেই বললে, ক্যা চাহিয়ে, বাবুজি?

বিষ্ণু পর্যায়ক্রমে দুজনকে দেখে নিল। মেয়েটি এতক্ষণে নতনেত্র। বিষ্ণু ঐ দেহরক্ষী শ্রেণীর লোকটিকে বলল, আপ্‌সে কোই বাৎ নেহি।

—বেশক্! তব্ আপ্‌না কামপ্যে যাইয়ে। লেডিজ ওয়েটিংরুম কি সামনে ঐসিন খাড়া হোনা বে-তরিবৎ ইয়া বেকানুন হ্যায়।

বিষ্ণু রুখে ওঠে। উর্দুতে বলে, কথাটা কি আপনার প্রতিও প্রযোজ্য নয়?

—জী না! আমার জেনানা ঐ ঘরের ভিতর আছেন। আপনারও কি তাই?

বিষ্ণু পুনরায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। আবার চোখাচোখি হল। মেয়েটি কী-যেন একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই প্রচণ্ড ধমক খেল: বে-সরম কাঁহি কি! যা! অন্দর যা—

কার্যকারণ সম্পর্কটা বোঝা গেল না। মেয়েটি নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল, পর্দা সরিয়ে।

বিষ্ণু জানতে চায়, ঐ ভদ্রমহিলা কি আপনার স্ত্রী?

লোকটা জবাব দিল না। হিপ-পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করল। তার চেম্বারটা খুলল। কটা বুলেট ভরা আছে এক চোখ বন্ধ করে দেখে খট্-করে বন্ধ করল। পুনরায় হিপ-পকেটে আগ্নেয়াস্ত্রটা রেখে হাতটা অহেতুক ঝাড়ল। একগাল হেসে উর্দুতে বললে, কৌতূহল জিনিসটা ভাল। কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা নয়। পরস্ত্রীর বিষয়ে কৌতূহলী হওয়াটা স্বাভাবিক—বিশেষ সে খুবসুরৎ হলে। যাইয়ে, বাবুসাব, আপনা কামপ্যে যাইয়ে।

মিনিটখানেক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল বিষ্ণুগণেশ। লোকটা হেলতে দুলতে—বারে বারে পিছন ফিরে দেখতে দেখতে— একটা বার্ডস্-আই স্টলের কাছে গিয়ে সিগ্রেট কিনতে থাকে।

বিষ্ণুগণেশের কৌতূহলকে ছাপিয়ে শুভবুদ্ধিরই জয় হল। এটা দিল্লীর সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন। পাব্লিক প্লেস্। মেয়েটি ইংরেজি-শিক্ষিতা। প্রতিবাদ যদি সে না করে তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ লোকটার কিছু একটা সামাজিক অধিকার নিশ্চয় আছে। শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা: স্বামীত্বের।

পায়ে-পায়ে ফিরে আসে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং-রুমে।

গল্পের বই কেনার কথা আর মনেই ছিল না ওর।

এক্সপ্রেস ট্রেনটা অল্প পরেই এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। এখনও আধঘণ্টা সময়। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কুলির মাথায় সুটকেস-বিস্তারা চাপিয়ে রওনা হল ফার্স্ট-ক্লাস বগিটার দিকে। সচরাচর তা থাকে মাঝামাঝি। ইঞ্জিন আর গার্ড-কামরার

সমদূরত্বে। জনতা চলেছে। বিষ্ণু জনতায় সামিল হল। স্বতই তার দৃষ্টি গেল ইন্টার-ক্লাস লেডিজ ওয়েটিংরুমটার দিকে। সেখান থেকেও অনেকে মালপত্র নিয়ে নিজ-নিজ মরদের পিছু পিছু চলেছে ট্রেন ধরতে। অধিকাংশই দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী, অথবা বোরখা-আবৃতা। নজর হল: সেই মেয়েটিও চলেছে। ঠিক তার পাশে-পাশে আর একজন সুন্দরী মহিলা। বোধহয় ঐ অল্পবয়স্কার মা। মাথায় ঘোমটা। তার সাজপোশাক কিছু উগ্র, বয়সের তুলনায়। বয়স অবশ্য এমন কিছু বেশি নয়—পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হতে পারে। দুজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। ওদের আগুপাছু যাচ্ছে দুজন পুরুষ। একজন তো বিষ্ণুর পূর্বদৃষ্ট—দ্বিতীয়জনও দশাসই জোয়ান। কোনও হেতু নেই, কিন্তু বিষ্ণুর কেন যেন মনে হল দুই সান্ত্রী আগুপাছু প্রহরা দিয়ে নিয়ে চলেছে দুটি বন্দিনী নারীকে।

হঠাৎ মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আবার। আর তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। ওর মা ইতি-উতি কী যেন খুঁজছে। পিছনের মোচওয়ালা প্রহরী প্রশ্ন করে: ক্যা হুয়া?

সামনের দেহরক্ষীও এতক্ষণে থমকে থেমে পড়েছে। দু-পা ফিরে এসে বলে: ক্যা বাত?

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে: ম্যয় মুসৌরী নহী যাউঙ্গি!

সম্মুখবর্তী প্রহরী একটা চাপা খিস্তি করে আচমকা চেপে ধরে মেয়েটির বাম মণিবন্ধ! আর তৎক্ষণাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মেয়েটি বসিয়ে দেয় ঐ দশাসই লোকটার গালে বিরাশিসিক্কা একটা থাপ্পড়!

এটা বোধ হয় আশঙ্কা করেনি লোকটা। মেয়েটিকে প্রহার করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাতটা তুলতেই দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মা। এক ধাক্কায় তাকে ভূতলশায়ী করে লোকটা। আবার হাত তোলে মেয়েটিকে প্রহার করতে। পিছনের লোকটা জনতাকে দূরে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত। মেয়েটি দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে মুষ্ট্যাঘাত থেকে নাকমুখ বাঁচাতে চাইছে...

লিখতে যতক্ষণ লাগল তার দশভাগের একভাগ সময়ে মনস্থির করে ফেলেছে বিষ্ণুগণেশ। ঐ দশাসই পাট্টা জোয়ানের মাজায় বাঁধা আছে তরোয়াল। হিপ্‌পকেটে রিভলভার—কিন্তু সেসব কথা ঐ খণ্ডমুহূর্তে মনেই পড়ল না ওর। বিষ্ণুগণেশ চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে ধরে ফেলল লোকটার উদ্যত মুষ্টি!

লোকটা এদিক ফিরল। দেখল। চিনতে পারল। অস্ফুটে বললে: তু ফিন আ গয়া! হারামিকা বাচ্চা!

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল বিষ্ণুকে। ওর ঠিক পিছনেই চলন্ত মানুষের একটা নীরন্ধ্র প্রাচীর। সেটা না থাকলে সে বোধকরি পাঁচহাত তফাতে ছিটকে পড়ত। পড়ল না। টাল-সামলে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। লোকটার ডান হাত চলে গিয়েছিল কোমরবন্ধের দিকে। কিন্তু তরোয়ালটা টেনে বার করার সময় হল না তার। ঠিক সেই মুহূর্তেই কে-যেন সজোরে একটা হুইসিল বাজিয়ে দিল। সকলেই থমকে

দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন বলিষ্ঠদেহ টমি। লালমুখো তালঢ্যাঙা এক পুলিস-সার্জেন্ট।

—নাউ...নাউ...নাউ! হোয়াটস্ আপ হিয়ার?

ভূতলশায়ী মহিলাটি ততক্ষণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলা ঝাড়ছেন। হাইল্যান্ডার গোরা-সার্জেন্ট দেখে দ্রুতগতি ভিড়টা পাতলা হয়ে যাচ্ছে। সার্জেন্ট জনতার দিকে ফিরে হিন্দিতে জানতে চায়, এই ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা মেরে কে ফেলে দিয়েছিল?

জনতা নির্বাক। সেটাই স্বাভাবিক। সবাক হলেই থানা-পুলিস-আদালত। তাছাড়া ঘটনার তারিখ—ল-জার্নালে দেখছি—24.3.1925—অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড মাত্র পাঁচ-ছয় বছর অতীতের ঘটনা। ভিড়টা তাই সাহেব দেখে পাতলা হতে শুরু করেছে। সার্জেন্ট পুনরায় হিন্দুস্থানীতে ধমকে ওঠে: তোমরা কি সবাই অন্ধ? বল? ঐ মহিলাকে কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল?

কেউ কোন কথা বলে না। এবার সার্জেন্ট ঐ মহিলাটিকেই প্রশ্ন করে: তব্ আপ্ খুদ্ই বাতাইয়ে! কৌন?

মহিলাটি ততক্ষণে সামলেছেন। মিষ্টি হেসে বলেন, নেহী ভাই সা'ব! ম্যায়নে স্রিফ্ আপ্নেহি গির গয়ী থী!

স্পষ্ট বোঝা গেল সেটা আরক্ষাপুঙ্গবের বিশ্বাস হল না। কিন্তু উপায় কী? নির্যাতিতা নিজেই যদি তথ্যটা গোপন করতে চায়। পারিবারিক ঝগড়া নাকি? ঔরৎ-মরদ? ঠিক সেই মুহূর্তেই অষ্টাদশী মহিলাটি এগিয়ে এসে লোকটাকে দেখিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে: ম্যায়নে দেখি থী—বহ্ দুশমননে ধাক্কা মারা থা!

সার্জেন্ট ভিড়ের আড়ালে সে মেয়েটিকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি। এবার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতক্ষণ কর্তব্যবোধে সে যা-কিছু করছিল, এখন আরও একটা অনুপ্রেরণা পেল যেন। মেয়েটির কাছে জানতে চায়, আপ্ আপনি আঁখোসে দেখি হ্যয় ক্যা?

—তো কি ম্যয়নে দুসরোকো আঁখোসে দেখি হুঁ? দ্যাট সোয়াইন ডিড হিট দিস্ জেন্টলম্যান ট্যু!

এবার সে বিষ্ণুগণেশের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। সার্জেন্ট রাজস্থানী পোশাকপরা তরুণীর মুখে ইংরেজী শুনে বজ্রাহত। সামলে নিয়ে বিষ্ণুগণেশকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, সত্য কথা?

বিষ্ণুও ইংরেজিতে জবাব দেয়, হ্যাঁ। এই ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে, তিনি মুসৌরী যাবেন না। তখন ঐ লোকটা মহিলাটির মণিবন্ধ চেপে ধরে। এবং গালাগাল দেয়। ভদ্রমহিলা তখন লোকটাকে একটা চড় মারেন। লোকটা তখন ওঁকে মারতে যায়। ঐ বয়স্কা ভদ্রমহিলা—জানি না কেন উনি মিছে কথা বলছেন—এবং আমি, আমরা দুজনেই পরপর বাধা দিতে যাই এবং ধাক্কা খাই।

সার্জেন্ট সবটা শুনে তরবারধারীকে প্রশ্ন করে, ইজ দ্যাট ট্রু?

লোকটা হাত দুটি জোড় করে খানদানি উর্দুতে বললে, মাফ করবেন সাহেব। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মাফি চাইছি—সবার কাছে—আমার অন্যায়ই হয়ে গেছে। কিন্তু এটা, নেহাৎই একটা ঘরোয়া ব্যাপার। মেয়েরা 'শ্বশুরাল' যেতে না চাইলে কিছুটা জোর-জবরদস্তি করতেই হয়। বাইরের লোক বাধা দিলে মেজাজ খারাপ হতেই পারে, মানে.....

সার্জেন্ট বাধা দিয়ে বলে: কার শ্বশুরাল? কে তোমার ঘরওয়ালী? ইনি না উনি?

লোকটা বিনয়ে গলে গিয়ে যুক্তকরে শুধু বললে, ছোড়িয়ে সাব! মুঝে মাফি কিয়া যায়।

মহিলা দুটি প্রতিবাদে সরব হচ্ছে না, লোকটাও করজোরে ক্ষমা চাইছে। সার্জেন্টের মনে হল—এ নাটকের যবনিকাপাতের সময় হয়েছে। ঠিক তখনই বিষ্ণুগণেশ আচমকা বলে এঠে, লুক হিয়ার,সার্জেন্ট! ঐ লোকটার হিপ্-পকেটে একট লোডেড রিভলভার আছে। আমার আশঙ্কা—সেটা আন্‌লাইসেন্সড।

বিদ্যুৎচমকে ঘুরে দাঁড়ালো সার্জেন্ট: রিভলভার?

লোকটা একগাল হেসে বললে, জী হাঁ, সচ্ বাৎ, লেকিন লাইসেন্স হ্যায়।

হিপ্-পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই তড়িৎগতি সার্জেন্ট চেপে ধরল তার মণিবন্ধ। বললে, থাক! আমি দেখছি।

ওর পিছনের পকেট থেকে বার করে আনল আগ্নেয়াস্ত্রটা। চেম্বারটা খুলে দেখল। গন্ধ শুঁকল। তারপর বাঁ-হাতটা বার করে বললে: লাইসেন্স প্লীজ।

লোকটা আমতা-আমতা করে, সেটা কি আমি পকেটে করে ঘুরছি?

—আই সী! কিন্তু তুমি এর লাইসেন্স-হোল্ডার। কবুল করছ তো?

—ইয়েস স্যার। ক্যারিয়ার-লাইসেন্স আছে আমার নামে।

—আই সী! ক্যারিয়ার লাইসেন্স! তবে লাইসেন্সটা কার নামে?

—হিজ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ অব ইন্দোর, স্যার!

—অল রাইট। এটা আমার মালখানায় জমা থাকবে। তুমি আমার অফিসে চল। রিসিট দিয়ে দেব। লাইসেন্স দেখিয়ে যন্ত্রটা খালাস করে নিয়ে যাবে। ফলো?

—কিন্তু আমি যে দিল্লীতে থাকি না, হুজুর। আমি ট্রেন ধরতে যাচ্ছি।

—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—মুসৌরী।

—কিন্তু এই লাহোর-এক্সপ্রেস তো মুসৌরীর দিকে যাবে না।

—জানি স্যার, আমরা এ ট্রেনে যাচ্ছি না।

—অলরাইট। য়ু ক্যান ওয়েট! আপনি কোথায় যাবেন?

এবার প্রশ্নটা করেছে অষ্টাদশীকে।

মেয়েটি বললে, আম্বালা।

—অলরাইট। অ্যাম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। আপনি একাই যাচ্ছেন?

—না, আমার মা সঙ্গে আছেন। আমরা দুজনে যাচ্ছি।

—টিকেট কেটেছেন? সঙ্গে আছে?

মা-মেয়ে নীরব। আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক আগবাড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, হুজুর! টিকিট আছে বৈকি। আমার কাছে। ওঁদের দুজনের ইন্টার-ক্লাস লেডিজ। আমার থার্ড ক্লাস।

সার্জেন্ট জানতে চায়, আপনার তো মুসৌরীর টিকিট। ওঁদের দুজনের?

—আজ্ঞে ঐ মুসৌরীরই।

সার্জেন্ট পর্যায়ক্রমে তিনজনকে দেখে নিয়ে মা-মেয়ের মাঝামাঝি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়: ঐ লোকটা কার খসম্?

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, নিঃসন্দেহে ওর ঔরতের। যদি আদৌ ও বিবাহিত হয়।

সার্জেন্টও তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনি তো ওকে ভাল মতোই চেনেন। তাই নয়?

—হ্যাঁ চিনি। ওর নাম মহম্মদ সুলে। ও হিজ হাইনেস্ মহারাজা অব ইন্দোরের একটা পোষা কুকুর—নানান দুষ্কর্ম করে বেড়ায়....

—নাউ ইট্স ক্লিয়ার! কিন্তু আম্বালা পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া কি আপনাদের কাছে আছে?

এবার মেয়েটির মা জবাব দেয়, আছে হুজুর, কিন্তু এখন টিকিট কাটতে গেলে ট্রেন ছেড়ে যাবে যে।

সার্জেন্ট বললে, আপনারা দুজন এই ট্রেনের লেডিজ ইন্টার-ক্লাস কামরায় গিয়ে বসুন। আমি চেকারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মহম্মদ সুলে বলে, আমার যন্তরটা হুজুর?

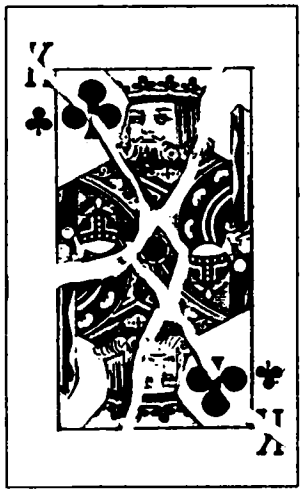
—বললাম তো, ওটা আমার কাছে জমা থাকবে। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, সুলে? তুমি তো এ ট্রেনে যাবে না!

তারপর বিষ্ণুগণেশের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললে, আপনিও এই ট্রেনে যাচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু রিভলভারটা 'আনলাইসেন্সড' প্রমাণিত হলে আপনার সাক্ষ্যর প্রয়োজন হতে পারে।

বিষ্ণু তার ওয়ালেট খুলে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে দেয়। সার্জেন্ট সেটা জোরে জোরে পড়ে: মিস্টার ভি. জি. চতুর্বেদী, বার-অ্যাট-ল। থ্যাংক য়ু, স্যার! ফর য়োর গ্যালান্ট্রি, ভিজিলেন্স অ্যান্ড কোয়াপারেশন।

বিষ্ণু মাথার টুপিটা খুলে নীরবে বাও করল।

☆ ☆ ☆



সে-আমলে করিডর-ট্রেন পয়দা হয়নি। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চারটি বার্থ। ওদিকের দুটি বার্থ দখল করে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছেন এক সাহেব-দম্পতি। কর্তা স্লিপিং সুট পরে উপরের বার্থে। তাঁর হাতে বিয়ারের জাগ। গিন্নি নিচের বার্থে একটা পত্রিকা পড়ছেন।

বিষ্ণুর কুলি মালপত্র সাজিয়ে বকশিস্ নিয়ে চলে যাবার পর সে এদিকে ফিরল। কর্তা উপর থেকে বললেন, গুড ইভনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম, স্যার। গোয়িং ফার?

বিষ্ণু 'বাও' করে বললে, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত। লাহোর।

—তাহলে 'সরি'। মাঝরাতে আপনাকে একটু কষ্ট দেব। আমরা নামব আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে। তখন আপনাকে উঠে আবার দোরটা বন্ধ করে দিতে হবে।

বিষ্ণু বললে, যদি না ইতিমধ্যে এই খালি চতুর্থ বার্থে কোনও প্যাসেঞ্জার এসে জোটে। সেক্ষেত্রে দেরীতে আসার অপরাধে কাজটা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবেন কাইন্ডলি।

পরিচয় হল দু-পক্ষের। সাহেব মিলিটারী মেজর। আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে পোস্টেড। বিষ্ণু বসবার উপক্রম করতেই মেজর উপরের বার্থ থেকে বলে ওঠেন, দয়া করে ছিটকানিটা বন্ধ করে দিন।

তাঁর উত্তমার্ধ নিচেকার বার্থ থেকে বলে ওঠেন, ট্রেনটা ছাড়ুক না। এত ব্যস্ত হবার কী আছে? শেষ মুহূর্তেও কোন যাত্রী আসতে পারেন।

বিষ্ণু হাতঘড়িটা একবার দেখল। এখনো পাঁচ-মিনিট বাকি। পাল্লাটা খুলে সে দেখতে চাইল আর কোনও যাত্রী এদিকে এগিয়ে আসছে কি না। পাল্লা খুলতেই দেখতে পেল প্ল্যাটফর্মে ওর দরজার সম্মুখে সেই রাজস্থানী মহিলাটিকে। মেয়ে নয়, মা।

বিষ্ণু ঝুঁকে পড়ে বলে, ক্যা বাত?

মহিলা যুক্তকরে নমস্কার করে বললেন, আপকো বহুৎ বহুৎ শুক্‌রিয়া। আপ্ হাম-দোনোকো জানসে বঁচায়া। হামারা কামরা একদম বাজুমে হ্যায়!

—তো ঠিক হ্যয়। যাইয়ে। অব গাড়ি ছুটনেকা ওয়াক্ত হো গয়ী।

মহিলাটি দ্রুতপদে পাশের কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে দরজার পাল্লা খুলে অপেক্ষা করছিল ওঁর মেয়ে।

বিষ্ণুগণেশের সঙ্গে আবার চোখাচোখি হল। ওর দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা।

গাড়ি ছাড়ল।

বিয়ারের-গ্লাস-হাতে উপরওয়ালার জড়িতকণ্ঠে দৈববাণী হল: এখন কি অধমাঙ্গের আর্জিটা মঞ্জুর করা চলে?

বিষ্ণু হাসতে হাসতে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানি তুলে দিল।

মেজর-দম্পতি কেলনারে ডিনারের অর্ডার দিয়েছিলেন। মীরাটে খাবার দিয়ে গেল। ওঁরা পীড়াপীড়ি করলেন আহারটা তিন-ভাগ করার ব্যাপারে। বিষ্ণু রাজি হল না। বললে, সে সন্ধ্যার আগেই খেয়ে নিয়েছে।

কী-একটা খুচরো স্টেশানে এসে কেলনারের খিদমৎগার প্লেটগুলো নিয়ে গেল। রাতের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। নিষ্প্রভ সবুজ 'নিশালোকে' কামরাটা কেমন যেন মোহময়।

বিষ্ণুগণেশের ঘুম এল না। সমস্ত দিনের ঘটনা-পরম্পরা একে একে ভেসে উঠ্‌ছে ওর মনের আরসিতে। বাওলা-সাহেবের সম্পত্তি সংক্রান্ত একটা 'কেস' চলছে লাহোর-আদালতে। সে বিষয়েই পরামর্শ এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বিষ্ণুগণেশ লাহোর থেকে বোম্বাই এসেছিল। সচরাচর ক্লায়েন্টই ছোটে ব্যারিস্টারের কাছে; কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি? আবদুল কাদের বাওলা তেমনি ব্যারিস্টার বিষ্ণুগণেশ চতুর্বেদীর কাছে এক সম্মানীয় ব্যতিক্রম। বিলেত যাওয়ার খরচ তিনিই জুগিয়েছিলেন—ঋণ-হিসাবে সে অর্থ গ্রহণ করেছিল চতুর্বেদী। এখনো তা শোধ করে চলেছে।....পিতাজীর সঙ্গে দেখা হল না। একপক্ষে বোধহয় ভালই হয়েছে। মায়ের জন্য দুঃখ হয়। রুক্মিণীকে বলতে হবে মাঝে মাঝে বোম্বাই গিয়ে দু-এক মাস থেকে আসতে। তারপর দিল্লী স্টেশনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ঐ মহম্মদ সুলে লোকটা কি সত্যিই ইন্দোর মহারাজের একটা চর? নারী-শিকারে সারা ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছে? এরা মা-মেয়ে তা সহ্য করছে কেন? এটা তো ইন্দোর-রাজ্য নয়? এখানে ব্রিটিশ শাসন। থানায় অভিযোগ করছে না কেন? থানাদার সুলের টাকা খেলে, তার ওপরওয়ালা? প্রয়োজনে তারও উপরওয়ালা? প্রয়োজনে তারও উপরওয়ালা—কমিশনার সাহেব?

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমের ঘোরে চোখের পাতাদুটো বুজে গেছে। স্বপ্নের মধ্যে ও দেখছিল পাশের কামরার পাল্লা খুলে একটি কৃতজ্ঞ কুমারী তার সুর্মা আঁকা...

কুমারী? এ কথা ভাবছে কোন যুক্তিতে?

হঠাৎ একটা ধাক্কায় ওর ঘুমটা ছুটে যায়।

—হ্যালো স্যার। সরি টু ডিস্টার্ব য়ু। আমরা এখানে নেমে যাব। আম্বালা এসে গেছি। তুমি উঠে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

বিষ্ণুগণেশ হাতঘড়িতে দেখল রাত দুটো দশ। গাড়ির গতি শ্লথ হয়েছে। আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গাড়িটা ঢুকছে। এখানে ইঞ্জিন জল নেয়। গাড়ি অন্তত পনেরো মিনিট দাঁড়াবে। মেজর-সাহেব দরজা খুলে, 'কুলি-কুলি' হাঁক পাড়লেন। কুলি এল, মালপত্র গুছিয়ে ওঁরা দুজন শুভরাত্রি জানিয়ে নেমে গেলেন। বিষ্ণু

মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখল। প্রায় জনমানবহীন। এখানে-ওখানে কিছু ঘুমন্ত মানুষ। চায়ের দোকানে দু-চারজন জমেছে। দু-একটি কুলি কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে ফিরছে। বিষ্ণু দরজাটা বন্ধ করল। ছিটকানি লাগালো না। দিল্লী স্টেশনে মেমসাহেব যা বলেছিল সে-কথাটা ওর স্মরণ হল। একেবারে শেষ মুহূর্তেও কোন যাত্রী আসতে পারে তো।

বসে-বসেই একটু ঢুলুনি-মতো এসেছিল। হঠাৎ দ্রাম করে পাল্লাটা গেল খুলে। স্যুটকেস হাতে এক বোরখা-আবৃতা মুসলমানী মহিলা হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়েন। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় বিষ্ণু বলে ওঠে: য়ে ফার্স্ট ক্লাস হ্যায়।

মহিলাটি কর্ণপাত করেন না। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ঠিক হ্যায়! আপ্ যাইয়ে। তুরন্ত্! গাড়ি আভি ছুটেগি।

যে ভদ্রলোক তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁকে দেখা গেল না, কিন্তু বোঝা গেল যে তিনি দরজা থেকে হাতটা টেনে নিলেন। বোরখাপরা মহিলাটি সজোরে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানি তুলে দিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন বিষ্ণুগণেশের মুখোমুখি।

হঠাৎ বললেন, ক্যা বাৎ? আপ্ আকেলা যা-রহে হ্যাঁয় ক্যা?

বিষ্ণু প্রতিপ্রশ্ন করে, আকেলা ট্রেনজার্নি করনা মানা হ্যায় ক্যা?

—বহ্ সা'ব ঔর মেমসাব কাঁহা গয়ী?

তর্জনী তুলে বিপরীত দিকে বার্থ দুটি সে দেখিয়ে দেয়।

বিষ্ণু অবাক হয়। এই সদ্য-আগতার জানার কথা নয় যে, ঐ বেঞ্চিতে রাতের প্রথমার্ধে শয়ন করেছিলেন এক বিদেশী দম্পতি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না তুলে হিন্দিতে বললে, ওঁরা তো এখানেই নেমে গেলেন!

মেয়েটি একটু বিচলিতা হয়ে বলে ওঠে, তার মানে শুধু আপনি আর আমি....।

ট্রেনটা ঝাঁকি দিল। এঞ্জিন এসে লাগলো বোধহয়।

বিষ্ণু দরজার ছিটকানিতে হাত দিয়ে হিন্দিতে জানতে চায়, কী করবেন? নেমে যাবেন?

—না! এখন আর তা সম্ভবপর নয়।

—তাহলে? চেনটা টেনে দেব?

প্রায় চীৎকার করে ওঠেন মহিলা, না! আপনি স্থির হয়ে বসুন দেখি!

অগত্যা ও নিজের সীটে বসে পড়ে। দেখাই যাক্ দুঃসাহসিকা কী করে। বোরখা পরে পথে-ঘাটে ঘোরাফেরা করে—অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্দানসীন। আবার এদিকে নির্জন ঘরে পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাসে ওর আপত্তি নেই। ব্যাপারটা কী?

নিজের সুটকেসটা মেয়েটি ও-দিকের বাঙ্কের ওপর তুলে দিল। বসল সামনের বেঞ্চিতে। ট্রেনটা ছাড়ল। মহিলাটি এদিকে ফিরে বললে, আপনি শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি। আর আপনি?

—আমার সম্বন্ধে অত কৌতূহল কেন? আমি বাকি রাতটুকু জেগেও কাটিয়ে দিতে পারি।

—তা পারেন। আবার ঘুমাতেও পারেন। কারণ ঘুমালে মাঝরাতে উঠে আমি আপনাকে কামড়ে দেব না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কথা দিচ্ছি!

চাদরটা আপাদমস্তক টেনে দেয় গায়ের ওপর।

মহিলাটি প্রশ্ন করে, আলো জ্বালা থাকলে বোধহয় আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে। নয়?

—হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আলোটা না জ্বললে আপনার জাগরণে আরও বেশি ব্যাঘাত হবে। আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন।

—পড়লামই বা।—হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দেয়। আবার সবুজ 'নিশীথালোকে' ঘরটা মোহময় হয়ে ওঠে। এতক্ষণে আম্বালা স্টেশনকে পিছনে ফেলে ট্রেনটা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে লাহোরের দিকে।

বিষ্ণুগণেশ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বলে, আলো নিভিয়ে দিলেন কেন? আমি বারণ করলাম না?

—না! আপনি বারণ তো করেননি। বরং নিশ্চিন্ত করেছিলেন আমাকে—মাঝরাতে আমাকে কামড়ে দেবেন না, কথা দিলেন। তাই নয়?

বিষ্ণু কী বলবে ভেবে পায় না। মহিলাটি বলে, বোরখাটা না খুলে ফেললে ঘুম হবে না। আপনি কাইন্ডলি একটু ও-পাশ ফিরে শোবেন, মিস্টার চতুর্বেদী? আমি পোশাকটা পালটাবো।

শোবে কোথায়? ও খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মহিলাটিও ততক্ষণে খুলে ফেলেছে তার বোরখা।

—গুড গড! আপনি?

মেয়েটি নতনেত্রে বললে, অনেক আগেই এটা আপনার আন্দাজ করার কথা, ব্যারিস্টার-সাহেব। বসুন—

হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বেলে দিয়ে বিষ্ণু বলে, এর মানে?

—এখনো বুঝতে পারেননি? মহম্মদ সুলে ট্রেনটা ধরতে পারেনি। বোধকরি সেই সার্জেন্ট ওকে আটকে রেখেছে। কিন্তু বুলাকিদাস ট্রেনে উঠে পড়েছিল।

—বুলাকিদাস! সে কে?

—আপনি নজর করেননি? ওরা দলে দুজন ছিল। একজন সামনে, একজন পিছনে। পুলিস দেখেই বুলাকি লুকিয়ে পড়ে। সে উঠে পড়েছিল এই ট্রেনে একটা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। মা তাকে দেখেছে, তাই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি!

—পালিয়ে বেড়াচ্ছ! কেন? কী তোমার অপরাধ?

ম্লান হাসল মেয়েটি। বললে, আমার মুখে শুনলে আপনি হাসবেন। আমার অপরাধ—ফল্‌স্ মডেস্টি থাক—আমার রূপ আর যৌবন।

—আই সী! কিন্তু কার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি?

—হিজ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ অব ইন্দোর, তুকাজিরাও হোলকার।

—গুড গড! আর তোমার মা?

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

সঙ্কোচ করল না বিষ্ণু। এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল, নাউ, নাউ, নাউ! কাঁদবার অবকাশ অনেক পাবে জীবনে। সব কথা আমাকে খুলে বল তো! কী নাম তোমার?

—কমলাবাঈ।

—তুমি বিবাহিতা?

—না!

—ইংরেজি শিখেছ কোথায়?

—বিলেতে। একজন গভর্নেসের কাছে।

—গুড হেভেন্স! তুমি বিলেত গেছিলে? কিন্তু তুমি তোমার বিপদের কথা—ইন্দোর মহারাজের বদমাইশীর কথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাওনি? নিরাপত্তার আর্জি জানিয়ে?

—আমি জানাইনি। মা জানিয়েছেন। বোম্বাইয়ে যে এলাকায় ছিলাম সেই 'পারেল'-এর থানাদারকে, তারপর—ঐ এলাকার এস. পি.-কে। শেষে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারকে। কেউ কর্ণপাত করেননি! কেউ আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেননি। মহারাজার চর আমাদের খ্যাপা কুকুরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

—কেন, কেন, কেন?

—যেহেতু ইন্দোর রেজিমেন্ট ব্রিটিশ বাহিনীর হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছে। যেহেতু তুকাজিরাও ভাইস্‌রয়ের পদলেহী পোষা কুকুর! তাই তার সাতখুন মাপ!

বিষ্ণু বলে, বুঝলাম! তোমার মা.....

কমলা সব কথাই বুঝিয়ে বলে। এ বুদ্ধিটা ওর মায়ের। বুলাকিদাস যে এই ট্রেনে চেপেছে তা ওর মা দেখতে পেয়েছিল। বুলাকি জানতো যে, ওদের টিকিট আম্বালা পর্যন্ত। তাই বুলাকি আম্বালা স্টেশনে নেমে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু ওরা একটা পাল্টি চাল চালে। ইন্টার লেডিস রুমেই কমলা একটা বোরখা পরে নেয়। ওরা মা নেমে কুলি নিয়ে যখন গেটের দিকে চলতে থাকে তখন বুলাকিদাস বোকা হয়ে যায়। কমলাকে সে খুঁজে পায় না। না পাক, সে আঠার মতো সেঁটে থাকে ওর মায়ের সঙ্গে। কারণ জানে, যেখানেই যাক, কমলাকে ঘুরে-ফিরে মায়ের কাছে আসতে হবেই। কমলা এই সুযোগটা নেয়। সে শুনেছিল—তার মায়ের কাছে—যে, এই পাশের ফার্স্টক্লাস কামরাটায় চারটে বার্থ। দুটি অধিকার করেছেন এক সাহেব-দম্পতি, তৃতীয়টি লাহোরের সেই সুদর্শন ব্যারিস্টার-সাহেব। চতুর্থ বার্থটি খালি যাচ্ছে! তাই ও মরিয়া হয়ে এই কামরায় উঠে পড়েছিল।

বিষ্ণু বলল, বুঝলাম। কোথায় যেতে চাও তুমি?

অমৃতসরে। আমি ওখানে নেমে যাব। উঠব ওখানকার ভিক্টোরিয়া হোটেলে। সেখানেই অপেক্ষা করব, যতদিন না মা ঐ বুলাকিদাসের নজর এড়িয়ে ওখানে এসে দেখা করেন।

—তোমার কাছে যথেষ্ট রাহা-খরচ আছে তো?

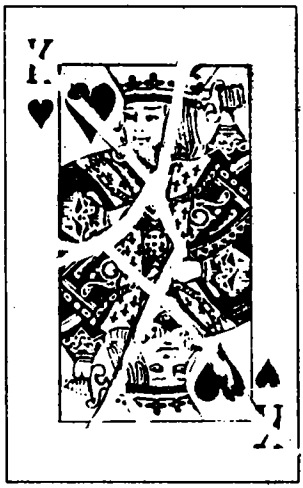
কমলা নির্দ্বিধায় নিজের বুকের উপত্যকায় হাত চালিয়ে দিল। পরমুহূর্তেই হাতটা বার করে খুলে ধরল ওর মুঠি!

বিষ্ণুগণেশ বজ্রাহত। কোনক্রমে বললে, গ্রেশাস্ মি! শুধু এ জন্যই তো তুমি খুন হয়ে যেতে পার—

ওর মুঠিতে একমুঠো মোহর আর হীরা-চুনি-পান্না!

☆ ☆ ☆





হোলকার রাজবংশের মহারাজাধিরাজ তুকাজিরাও হোলকার যখন ইন্দোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বিংশ শতাব্দীর বয়স মাত্র তিন, তুকাজীর সাত।

ইন্দোরে হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মল্হররাও হোলকার ছিলেন পেশোয়ার একজন দক্ষ সেনাপতি; 1728 খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের কাছ থেকে রাজপুতানা-সমেত এই ভূখণ্ডটি তিনি জায়গীর হিসাবে লাভ করেন। ইন্দোরের অবস্থান মালব অঞ্চলে, নর্মদার দক্ষিণ অংশে। মল্হররাও-এর পরলোকগমনের; পরে তাঁর পুত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। স্বতই অমাত্যরা বিদ্রোহ করে। রানী অহল্যাবাই দক্ষতার সঙ্গে সে বিদ্রোহ দমন করেন। দীর্ঘদিন তিনি ইন্দোর রাজ্যকে সুশাসনে রাখেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর ব্রহ্মচারিণী—আহার-বিহারে, সাজে-পোশাকে বৈরাগ্যের প্রতীক। অথচ প্রজার মঙ্গলে তিনি মুক্তহস্তা। কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত রাজসড়কটি সেই সুদূর ইন্দোর রাজ্যের প্রাতঃস্মরণীয়ার আর্থিক দানে —'রানী অহল্যাবাঈ সরণী!'

অহল্যাবাঈ-এর মৃত্যুর পর রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে পুনরায় প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত শাসনভার লাভ করেন যশোবন্ত রাও। ইংরেজের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পরাজিত হন। 1811 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আবার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার সূত্রে অরাজকতা! সাত বছর পর ইন্দোর ইংরেজের করদরাজ্য রূপে স্বীকৃত হয়। চুক্তির শর্ত ঠিক মত মেনে নেওয়া হচ্ছে কি না দেখবার জন্য ইন্দোর শহরে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। মান্দাসোর-সন্ধি হিসাবে রেসিডেন্ট শুধু দেখে নিতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর কোনও উদ্যোগ রাজ্য-মধ্যে নেওয়া হচ্ছে কি না। বস্তুত রাজার যথেচ্ছাচারে কর্ণপাত বা চক্ষুপাত করা এজেন্ট-এর কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তুকাজিরাও হোলকার সিংহাসনে আরোহণ করেই বয়সোচিত নানান চাপল্যে প্রজাদের জীবন উত্ত্যক্ত করে তুলতে শুরু করেন। বছর-পাঁচেক পরে—ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী যে সময় বোমা হাতে মজঃফরপুরে যাত্রা করছেন প্রায় সেই সময়ে—একই বয়সী তুকাজিরাও সাড়ম্বরে বিবাহ করেন প্রতিবেশী পরাক্রমশালী রাজপরিবারের এক পঞ্চদশী রাজকন্যাকে—যমুনা দেঈ! অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তিনি। বিবাহের বৎসরখানেক পরেই গর্ভিণী অবস্থায় তিনি পিতার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন এবং আশ্চর্যের কথা, আর কোনদিন সপুত্র ইন্দোর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন না। ইন্দোর মহারাজ নিজেও কোনদিন শ্বশুরালয়ে যাননি—রানীকে ফিরিয়ে আনতে অথবা পুত্রকে দেখতে।

এ নিয়ে দুর্জনে নানা কথা বলবেই। রাজার গুণগ্রাহীদের মতে পুত্রটির পিতা

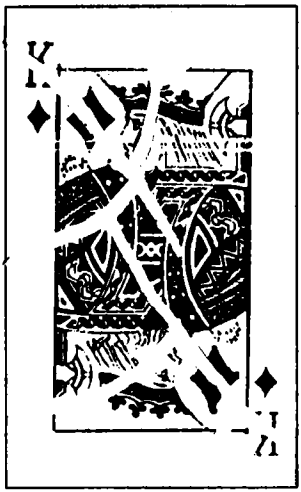
তুকাজিরাও কিনা এটা বিতর্কমূলক। আবার রাজার শত্রুপক্ষের মতে তুকাজিরাও ছিলেন ধর্ষকামী। শয্যাসঙ্গিনীর রক্তপাত না হলে তাঁর নাকি কামতৃপ্তি হত না! এ জন্যই রানী আর শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি।

কাহিনী রচনাকালে দেখছি ঐ দুটি চরিত্রই—রাজা আর রানী—দীর্ঘদিন স্বর্গলাভ করেছেন। ফলে ঐসব দুর্জনের গুজব নিয়ে আমাদের গবেষণা না করলেও চলবে। শুধু একটা কথা রানীমার বক্তব্যের স্বপক্ষে না বললে অধর্ম হবে। পাটরানী রাজবাড়িতে ফিরে না আসার পর আর কোনও খানদানী রাজপরিবার থেকে যুবক তুকাজিরাও-এর বিবাহ প্রস্তাব এল না কেন? এসে থাকলেও তা ফলপ্রসূ হল না কেন?

রাজপরিবারের ইতিহাসে দেখছি মহারাজের শয্যাসঙ্গিনীর অভাব অবশ্য কোনদিনই হয়নি। কিন্তু উপপত্নীরা কেউই হারেমে বেশিদিন টিকে থাকেনি। নগদ বিদায় নিয়ে ইন্দোর ত্যাগ করার দিকেই তাদের আগ্রহ।

কাহিনীতে পুনঃপ্রবেশ করার পূর্বে ইতিহাসের আর একটু ইঙ্গিত দিয়ে যাই। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন তুকাজিরাও-এর পুত্র—ঐ যে পুত্রটির ইন্দোর রাজবাড়িতে বাল্যকাল কাটানোর সৌভাগ্য হয়নি — ছিল মায়ের কাছে— দাদামশায়ের বাড়িতে। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন সে— ইন্দোররাজ। হোলকার ব্যক্তিগতভাবে উনিশ তোপের সম্মান আর বার্ষিক পনের লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন, রাজ্যটি স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর।





1917 সাল। মহারাজাধিরাজ তুকাজি রাও-এর একবিংশতি জন্মদিবস। সাড়ম্বরে তা পালিত হচ্ছে। দুঃখের কথা, পাটরানী তাঁর বাপের বাড়ি। সদ্য সন্তানলাভ করেছেন; এ আনন্দ অনুষ্ঠানে তাই অনুপস্থিত। যুদ্ধের বাজার—তাই ইংরেজ সিভিলিয়ান বা মিলিটারীর বড়কর্তাদের বিশেষ কেউ আসতে পারেননি। চলছে দীর্ঘ সাতদিন ধরে খানাপিনা—আতসবাজী—যাত্রা আর নৌটঙ্কীদলের হৈ চৈ। মুজরো পেয়ে এসেছে নানান রাজ্য থেকে নামকরা গায়িকা আর নর্তকী।

তাদের মধ্যে একজন! কচি খুকিটি নয়, মহারাজেরই সমবয়সী। তা হোক, একেই নজরে ধরে গেল মহারাজের—ওয়াজির বেগম। হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত বাইজী। যেমন মধুকণ্ঠী তেমনি নৃত্যপটীয়সী। সাতদিনের আসর ভেঙে গেলে সবাই যখন ইনাম নিয়ে বিদায় নিচ্ছে, তখন তুকাজিরাও হুকুম দিলেন: ওয়াজির বেগম ইন্দোরেই থাকবে। রাজদরবারে ওকে স্থায়ী গায়িকার চাকরি দেওয়া হোক!

রাজার হুকুম! ওয়াজির লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, বহুৎ খুব! লেকিন মেরি লেড়কি? বহ্ কাঁহা রহেগী?

—লেড়কি? ওর আবার মেয়ে আছে নাকি?

দেখা গেল, আছে। নেহাৎ বাচ্চা বলে এতক্ষণ নজর হয়নি। বাপের ঠিক না থাক, মায়ের ঠিক আছে। হাড় ডিগ্‌ডিগে সাত বছরের একটি বালিকা। টক্-টক্ করছে গায়ের রঙ, মুখ চোখ চোখা চোখা—কিন্তু হাড়-মাস বিল্‌কুল নেই দেহে! বড্ড ভোগে—রিকেট।

রাজা বললেন, ওও থাকবে ইন্দোরে।

আপত্তি জানাতে এলেন বৃদ্ধ শিবাজী রাও। দেওয়ানজী। তুকাজিরাও-এর পিতৃবন্ধু। রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহা-পরাক্রমশালী মহামন্ত্রী। বললেন, মহারাজ, ওরা হিন্দু নয়, রাজপ্রাসাদে ওদের কেমন করে রাখা যাবে?

—তাহলে রাজাবরোধের মধ্যেই একটা কোঠী নির্মাণ করিয়ে দিন। ওয়াজির থাকবে। ব্যস্! আমার হুকুম!

—লেকিন মহারাজ! মহারানী যমুনাবাঈ যখন ওয়াপস আসবেন....

মহামান্য দেওয়ানজীকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মহারাজ বলে ওঠেন, আসবেন না। আমার হুকুম! কোনদিনই সে পেতনি ফিরে আসবে না!

—এ কী বলছেন, মহারাজ? যমুনা দেই, আমার মা...

—আপনার মর্জি হলে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়ে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন; কিন্তু আমি যতদিন ইন্দোরের গদীতে আসীন,সে হারামজাদী যেন এ রাজ্যে আমার সম্মুখে না আসে! এলে আমি তার নাক কেটে নেব!

ব্যস! ফয়শালা হয়ে গেল!

☆ ☆ ☆

এগারোই এপ্রিল 1919।



তুকাজিরাও হোলকারের সেলুনটা মেল ট্রেনের লেজুড় হিসাবে প্রবেশ করল বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। সেলুনে ফার্স্টক্লাসে আসছেন মহারাজ স্বয়ং এবং ওয়াজির বেগম, সংলগ্ন-কক্ষে ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এবং চাকরানির জিম্মায় ওয়াজিরের কন্যা। গাড়ি থেকে নেমেই মহারাজ চমকে ওঠেন: এত পুলিস কেন?

বোম্বাই থেকে ইন্দোরে যখন ফিরে যান তখন ইন্দোর-প্ল্যাটফর্মে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিস। গার্ড অব অনার দেয়। প্ল্যাটফর্মে পাতা থাকে লাল কার্পেট। তার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। কিন্তু বোম্বাইতে তো কখনো এমনটা হয় না। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার এত পুলিস পাঠিয়েছে কেন?

পরক্ষণেই বোঝা গেল হেতুটা। ট্রেনের ল্যাজে যে সেলুনটা বাঁধা আছে তার জন্য নয়। মাঝের একটা থার্ডক্লাস কামরার এক নাঙ্গা ফকিরের জন্যই এই বখেড়া। সারা স্টেশন পুকার দিচ্ছে: বন্দেমাতরম! মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!

কোন মানে হয়! ওঁর কি আর কোন কাজকর্ম নেই? এই ট্রেনেই বোম্বাই আসতে হবে? কী এমন রাজকার্য?

তুকাজিরাও অবশ্য রাজকার্য উপলক্ষেই এসেছেন। বান্দ্রা-অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে একটি 'পিকচার-হৌস' বানানো হচ্ছে: 'তুকাজি'! 'পিকচার-হৌস্' বোঝ তো? ঐ যেখানে 'বাইস্কোপ' দেখানো হয় আর কি। পর্দায় সাহেব-মেম বেহেস্তী হুরীরা নাচে! অন্ধকার ঘরে বসে দেখতে হয়। তখন মেয়েরাও মুখের পর্দা সরিয়ে বসতে পারে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উনিশে এপ্রিল তার উদ্বোধন হবে। দিন-সাতেক আগেই সপার্ষদ এসে হাজির হলেন উদ্বোধক। তথা মালিক। বোম্বাই স্টেশনে।

প্রকাণ্ড খান-চারেক লিমুজিন। প্রথমটা 'আর. আর.'। সেটা মহারাজের একার। দ্বিতীয়খানা সিডানবডি শেভ্রলে। তাতে উঠল সকন্যা ওয়াজির বেগম আর তার দুই নোকরানি। পরের দুখানাতে মহারাজের সাঙ্গোপাঙ্গর দল। ফাঁসে, রামাবতার, রিসলদার সফি-আহ্মেদ। কিন্তু কোন গাড়িই চলতে পারে না।

আম-জনতা চলেছে নাঙ্গা-ফকিরকে নিয়ে: গান্ধীজীকি জয়!

মহারাজার রোলস-রয়েসটা ভিড় কাটিয়ে আগে যেতে চেয়েছিল। এক লালমুখো সার্জেন্ট হুমড়ি খেয়ে বাধা দিল। ভিড় পাতলা হলে পুলিস মহারাজার গাড়িকে ছাড়পত্র দিল। শেভ্রলেখানা গেল নেপিয়ান-সী রোডে হুসেন ভাইয়ের বাঙলোতে। মহারাজার 'আর. আর.'-খানা চলল তাজমহল হোটেলে। সেখানে তাঁর নিজস্ব স্যুইট সারা বছরের জন্য বুক করা থাকে—দু-কামরার ডবলবেড স্যুইট।

সেবার ওঁরা দিন-পনের ছিলেন বোম্বাইতে। শেভ্রলে গাড়িখানায় ওয়াজির বেগম তার এগারো বছরের কন্যাকে বোম্বাই শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য ঘুরিয়ে দেখানো হত। মা-মেয়ে পছন্দ মতো বাজার করত। টাকার অভাব হত না। সর্বদা সঙ্গে থাকত দু-দুজন প্রহরী। কখনো বুলাকিদাস, কখনও বা রামলাল, ফাঁসে, শামরাও ডিঙ্গে অথবা আর কেউ। গাড়ি চালাতো বাহাদুর শাহ্। বিশ্বস্ত ড্রাইভার। টাকার থলিটাও থাকত তার জিম্মায়। দিনান্তে সে হিসাব বুঝিয়ে দিত শঙ্কর রাওজীকে। শঙ্কররাও বাপুরাও হচ্ছে মহিলামহলের জিম্মাদার। রাজপরিবারের যার যখন যা দরকার আর্জি জানাতে হবে বাপুরাওয়ের কাছে। এমনকি মহারাজের উপপত্নী-মহলের দেখ্ভালের দায়িত্বও তার উপর। সারাদিন মেয়ের সঙ্গে শহরে ঘুরে সন্ধ্যাবেলায় ওয়াজির ফিরে আসত হুসেন ভাইয়ের বাঙলোয়। মেয়েকে নোকরানির জিম্মায় দিয়ে সাজতে বসত। শেভ্রলে গাড়িখানা অপেক্ষা করত। রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ ওয়াজির বেগমকে নিয়ে বাহাদুরকে ফিরে যেতে হত তাজমহল হোটেলে। ফিরিয়ে আনত পরদিন ভোরে, রাজা-সাহেবের খোঁয়াড়ি ভাঙার আগেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মেয়ে জানত মায়ের এই অভিসারের কাহিনী; জানত না মায়ের দেহের বীভৎস ক্ষতচিহ্নগুলির কথা।

☆ ☆

পরবর্তী অবস্থান্তর—ল-জার্নালের অনুক্রমে: 27.4.1919 তারিখের।

এর মাঝখানে ঘটে গেছে কয়েকটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, যার বিবরণ বোম্বাই হাইকোর্টের আলোচ্যমামলায় উল্লিখিত হয়নি। স্বাভাবিক হেতুতে। আলোচ্য - মামলার সঙ্গে সেগুলি সম্পর্ক-বিযুক্ত।

এগারোই এপ্রিল সন্ধ্যায় গান্ধীজী বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন—রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হন।

বারই কলকাতার মনুমেন্টের নিচে এক বিশাল জনসমাবেশ হয়, পুলিস-কমিশনারের আদেশ অমান্য করে। ফলে প্রচণ্ড লাঠিচার্জ হয়। বহু লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়। বহু লোক জেলে যায়।

পরদিন তেরই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের নরমেধ-যজ্ঞে প্রায় পাঁচশ ভারতীয় প্রাণ হারায়।

রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করেন।

যাক এ-সব অবান্তর কথা!

আমরা কোর্ট-কেসের অনুক্রম হিসাবে অগ্রসর হব।

সাতাশে এপ্রিল হুসেন ভাইয়ের বাঙলোতে এসে দাঁড়ালো মহারাজার রোলস-রয়েসখানা। দ্বিতলের অলিন্দ থেকে তা প্রথম নজরে পড়ল মমতাজের। হ্যাঁ, মমতাজ বেগম! রাজবাড়ির খানাপীনায় সেই ডিগ্‌ডিগে ফর্সা মেয়েটা এতদিনে

দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছে। কিশোরীর দেহে সবে দেখা দিতে শুরু করেছে নারীত্বের লক্ষণ। হাত-পা হয়েছে সুডৌল। গাল দুটি রক্তাভ। চোখ দুটি বিনা কাজলেও যেন সুর্মাটানা। বুক পুরন্ত নয়, তবে কিশোরীর যুগ্মউচ্ছ্বাসের আভাস যেন পাওয়া যায়। সে এখনও একটি বালিকা।

মমতাজ মাকে ডেকে বলল, নিচে ঐ দেখ, গাড়ি এসেছে।

ওয়াজির অবাক হল। এখন বেলা এগারোটা। এবেলা তাকে নিতে গাড়ি আসে না। কী ব্যাপার? একটু পরেই নোকরানি এসে খবর দিল এ গাড়িতে বাপুরাওজী এসেছেন। নিচে অপেক্ষা করছেন। সেলাম দিয়েছেন।

পোশাকটা একটু ঠিকঠাক করে, দর্পণে মুখখানা একবার দেখে নিয়ে ওয়াজির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচের 'হল' কামরায়। সেখানে ঊর্ধ্বমুখে অপেক্ষা করছিল মহিলা-মহলের-জিম্বাদার শঙ্কররাও বাপুরাও। বেগম-সাহেবা 'নমস্তে' জানিয়ে বললে, কহিয়ে ভাইসাব, ক্যা সমাচার?

প্রতিনমস্কার করে বাপুরাও জানালো, সংবাদ শুভই। দুদিন পরেই বান্দ্রাতে 'তুকাজি' পিকচার-হৌসের উদ্বোধন হবে, তাই আজ দুপুরে একটা মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। দর্শক দু-দশজন থাকবেন। মেশিনগুলো চালিয়ে দেখা হবে আরকি। বেলা একটা থেকে তিনটে। চার্লি চ্যাপলিনের কিছু বাইস্কোপ।

ওয়াজির বেগম ই-কারান্ত শব্দটার ফাঁদে পড়ে জানতে চেয়েছিল, চার্লি চাপলিন কি কোনও মেমসাহেবের নাম? বাপুরাও তার অজ্ঞতা স্বীকার করে জবাবে জানিয়েছিল যে, সেটা তার জানা নেই। হয় সাহেব, নয় মেমসাহেব, তবে মহারাজ বলেছেন, চার্লি চ্যাপলিন বাচ্চাদের জন্যে হাসির বাইস্‌কোপ বানানোতে লা-জবাব। খোঁকি-দিদির কাছে ছবিগুলো মজাদার লাগবে। তাই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ওয়াজির জানতে চায়, আমিও যাব তো?

—নেহি, নেহি! এ তো এক-দেড় ঘণ্টার মামলা। ফালতু রিহার্সাল। আপনি যাবেন জৌলুষের দিন। সেদিন দামী সাজপোশাক পরে শহরের মেহ্‌মানরা আসবেন সবাই। খোঁকিদিদি সেদিনও যাবে।

ওয়াজির জানতে চায়, খুকি কখন ফিরে আসবে?

—দেড় দু-ঘণ্টার মামলা। বিকালেই ফিরে আসবে।

খোঁকিদিদিকে ফ্রকটক পরিয়ে, মাথায় বো বেঁধে ওয়াজির নিজে তাকে তুলে দিয়ে এল রোলস্ রয়েস-এ। বেলা তখন বারোটা।

ব্যস, সেই যে গেল, আর এল না।

ওয়াজির বেগম দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এভাবে ফাঁদ পেতে ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে ধরে জবাই করা হচ্ছে!

মমতাজ তখনো শাড়ি ধরেনি। ফ্রক পরত। মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলে একবেণী। কিশোরী মেয়ের অবাক চাহনি ওর মুখখানাকে একটা অমলিন পবিত্রতার চন্দন-প্রলেপ দিত। জৈবিক-বিচারে সে তখনো পুরোপুরি নারীত্ব লাভ করেনি। তাই ওয়াজির

বেগম দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, এই সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবার অছিলায় মহারাজ ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে অপহরণ করছেন, মায়ের জিম্মা থেকে!

রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে ছুটে গিয়েছিল তাজমহল হোটেলে। হুসেন ভাইয়ের এক দারোয়ানকে সঙ্গে করে। সেখানে গিয়ে শোনে, বেলা দুটোর ট্রেনে মহারাজের সেলুন ইন্দোরে ফিরে গেছে। রুম-সার্ভিসের বেহারা বললে, জী হ্যাঁ, এক খোঁকিভি থী উন্‌কো সাথ। বুলাকি? রামদাস? শঙ্কররাও বাপুরাও? হ্যাঁ, হ্যাঁ সবাই ফিরে গেছেন।

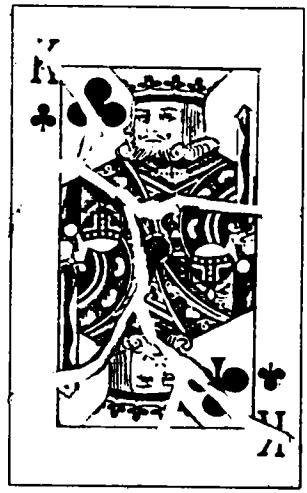
ওয়াজিরের নামে কোনও হাত-চিঠি আছে?

না তো! সেটা তো একটা এভিডেন্স হয়ে যেত!

পিকচার-হৌসের উদ্বোধন? রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মহারাজ সিনেমা-হৌসের উদ্বোধন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখেছেন।



ওয়াজি বেগম পাগলিনীর মতো ছুটে গিয়েছিল ইন্দোরে। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে প্রহরী তাকে রুখে দিয়েছিল। লোকটা চিনতে পেরেছিল ওয়াজির-বেগম-সাহেবাকে। নত হয়ে অভিবাদনও করেছিল। কিন্তু ভিতরে যেতে দেয়নি। ওর আকুল প্রশ্নের কোনও জবাবও দেয়নি, মমতাজ খোঁকিদিদি কি মহারাজের সঙ্গে বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন?



রাজপ্রাসাদের অনেকেই ওকে চেনে। দূর থেকে ওয়াজিরকে দেখতে পেলে পাশ কাটায়। ওয়াজির বেগম ভিতরে ঢুকতে না পেয়ে পরিখার ধার বরাবর ক্রমাগত রাজপ্রাসাদ পরিক্রমা করত। তার জামা কাপড়ের ঠিক থাকত না, আহার-নিদ্রার হিসাব থাকত না। সাধারণ লোক বলত: পাগলি হ! যারা ভিতরকার কথা জানে তারা ওদের শুধরে দিত না—কে জানে, দেওয়ালেরও কান আছে।

অবশেষে একদিন দুজন সান্ত্রী এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল।

ওয়াজির যথা নিয়মে তাদেরও শুধিয়েছিল: ওগো, তোমরা কি আমার মেয়েকে দেখেছ? সাদা মোজা, কালো জুতো, মাথায় লাল রিবন, একবিনুনি করা?

তারা জবাব দেয়নি। সোজা নিয়ে এসে ওকে তুলেছিল একটা সুসজ্জিত কক্ষে। এ-ঘরে ওয়াজির বেগম আগে কখনো আসেনি। প্রাসাদের বাহিরে, কিন্তু প্রাসাদ পরিখার ভিতরেই। নির্জন কক্ষ। সম্ভ্রান্ত এক বৃদ্ধ—মাথায় উষ্ণীয়, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, নগ্নদেহে একছড়া মুক্তার মালা আর শুভ্র উপবীত—ওকে বলেছিলেন, তুমি বস। ঐ মোড়াটায়। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ওয়াজির কার্পেটের উপরে বসে পড়ে। বলে, বলুন?

—তুমি আমাকে চেন না। আমি দেওয়ানজী। শিবাজীরাও।

ওয়াজির যুক্তকরে নমস্কার করল।

—তোমার সব কথাই আমি জানি। এভাবে প্রাসাদের চার পাশে তুমি যদি দিবারাত্র ঘুরে বেড়াও তাহলে তোমার মেয়ের দেখা তো পাবে না। তবে কেন এমন করছ পাগলের মতো? তোমারও হয়রানি, রাজ্যেরও বদনামী।

যুক্তকর ওয়াজির প্রশ্ন করে, আমার মেয়ে কোথায়, দেওয়ানজী? কেমন আছে সে?

—তোমার বেটি মমতাজ কোথায় আছে তা তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি বুঝতে পারছ না যে, তাকে ফিরে পাবার কোনও আশা নেই? যতদিন না তার প্রয়োজন ফুরাবে—যেমন তোমার ফুরিয়ে গেছে আজ। তবে তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহলে আমি দেখব, যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তোমার মেয়ে ভাল থাকে।

ওয়াজির কাঁদল না। কান্নার উৎস তার শুকিয়ে গেছে। বললে, দেওয়ান সা'ব, আপনি কেমন করে নরখাদক বাঘের নখ থেকে একফোঁটা মেয়েটাকে রক্ষা করবেন? আপনার কতটুকু ক্ষমতা?

—তুমি জান না ওয়াজির বেগম! আমার ক্ষমতা অসীম! রাজবাড়ির কোথায় কখন কী হয় আমি এখানে বসে টের পাই।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল ওয়াজির বেগম। বিদ্যুৎস্পৃষ্টর মতো উঠে দাঁড়ালো। নির্লজ্জের মতো বক্ষাবরণ অপসারণ করে বললে, আপনি টের পেয়েছিলেন এগুলোর কথা? দাড়ি কামানোর ক্ষুর দিয়ে? এই ক্ষতচিহ্নগুলোর কথা?

দেওয়ানজীও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালেন। পিছন ফিরে বললেন, বুকের উপর কাপড় দে মা, ...জানি, জানি রে পাগলি...ও লজ্জার কথাও জানি! কী করব? আমি যে জবান দিয়ে বসে আছি তোর ঐ দুঃশাসনের বাবার কাছে! আমি আজ পিতামহ ভীষ্মের মতো অসীম শক্তিধর অসহায়!

ওয়াজির বুকের উপর কাপড় টেনে শান্ত হয়ে বসল। বলল, আপনি এদিকে ফিরুন, বাবা! বলুন, আমার কী করণীয়?

দেওয়ানজী আবার নিজ আসনে বসলেন। বললেন, এটা ধর। কিছু টাকা। না, না, রাজসরকারের নয়। 'বাবা' বলে ডেকেছিস,সেই অধিকারে দিচ্ছি। তুই ইন্দোর ছেড়ে চলে যা, মা। কখন কোথায় থাকবি আমায় জানাস। যদি মেয়েকে ফেরত না পাস তাহলে বুঝবি পিতামহ ভীষ্মের পক্ষেও ওকে অপহরণ করা সম্ভবপর হল না। সেক্ষেত্রে দেখব—ওকে যতটা শান্তিতে রাখা যায়! যা, মা! যা—

ওয়াজির বেগমের ধারণা হয়েছিল যে, তার অশ্রুর উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে—নিরন্তর ঐ রাজপ্রাসাদ পরিক্রমা করতে করতে। এখন দেখল সেটা ভ্রান্ত ধারণা। পিতার বয়সী দেওয়ানজীর স্নেহভাষণে আবার হু-হু করে কেঁদে ফেলল হতভাগী।

☆ ☆

কথা রেখেছিলেন দেওয়ানজী। দীর্ঘ দু'বছর পর। বাইশে এপ্রিল, 1921; হতভাগিনী কন্যাটিকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা গোপনে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়াজির বেগম তখন বোম্বাইয়ের একটা বস্তির বাসিন্দা। সেখানে এসে দেখা করল একজন বেগানা লোক। ও তখন সবজি-মণ্ডিতে একটা দোকান চালায়। রাত নয়টা নাগাদ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে, একটা অচেনা লোক এগিয়ে এল, বলল, মাফ্ কিজিয়ে, আপনার নাম কি ওয়াজির বেগম-সাহেবা?

ওয়াজির হেসে বললে, এককালে ঐ রকম একটা জব্বর নাম আমার ছিল বটে, তবে এখন আমার নাম ওয়াজির সব্জিওয়ালী। ওয়ার্না তু কৌন বেটা?

—আপনি এককালে ইন্দোরে ছিলেন? আপনার মেয়ের নাম, মমতাজ?

—হ্যাঁ, মমতাজ। তুমি কে? এত কথা কেমন করে জানলে?

—আমি আসছি দেওয়ানজীর কাছ থেকে। চিঠি আছে।

ওয়াজির বললে, আমি বুঝব কেমন করে যে, তুমি দেওয়ানজীরই লোক?

—বস্তিতে চলুন। লেফাফা দেখাব। দেওয়ানজীর সীলমোহর চেনেন?

—না, চিনি না: কিন্তু বস্তিতে পড়িলিখি আদমী আছে, তারা চিনবে।

—কিন্তু আমাকে তার আগে নিশ্চিতভাবে আপনাকে চিনে নিতে হবে,মা!

—সেটা কী ভাবে?

—দেওয়ানজী সনাক্তকরণ চিহ্নটা আমাকে বলে দিয়েছেন। আপনাকে 'মা' ডেকেছি। সরম করবেন না, মা। ভুল করলে ইন্দোর-সরকার আমার গর্দানা নেবে।

ওয়াজির ছেলেটার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, তুই আমাকে 'মা' ডেকেছিস। আমার মেয়ের মঙ্গলের জন্য নিজের জান কুরবানি করতেও প্রস্তুত। তোর কাছে আমার লজ্জা কিরে,পাগল ছেলে? আয় আমার সঙ্গে—

এত করেও মেয়েকে ফিরে পায়নি বেচারি।

তবে সন্ধান পেয়েছিল ঠিক। সীলমোহর-করা লেফাফার ভিতর ছিল টাইপ-করা একটা আবেদনপত্র। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে। বস্তির একজন পড়িলিখি বিশ্বস্ত মাস্টারজী ওয়াজির বেগমের মর্মন্তুদ জীবনকথা জানতেন। তিনিই পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। দরখাস্তটা করছে জনৈকা ওয়াজির বেগম, যে-ছিল এককালে ইন্দোর মহারাজ তুকাজিরাও হোলকরের দরবারে বেতনভুক নর্তকী। তার কন্যার উদ্ধার-মানসে। তার নাবালিকা কন্যা মমতাজ-বেগমকে ইন্দোররাজের জনৈক কর্মচারী—হারেম-রক্ষক—শঙ্কররাও বাপুরাও বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে একটি নির্দিষ্ট গৃহে আটক রেখেছে। বোম্বাইয়ের পুলিস-কমিশনার-সাহেব যেন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের একশ নং ধারায় ঐ গৃহ তল্লাসী করে উক্ত শঙ্কররাও বাপুরাওকে গ্রেপ্তার করেন এবং মামলায় সোপর্দ করার ব্যবস্থা করেন। নাবালিকা মমতাজ-বেগমকে যেন তার আইন-মোতাবেক অভিভাবিকা নিম্ন-দরখাস্তকারীর কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ওয়াজির টিপছাপ দেয়। তার ওকালতনামা নিয়ে উকিল-সাহেব নোটিসটা পরদিন সকালেই কমিশনারের দপ্তরে দাখিল করেন। যথা-আইন অনুসন্ধান করা হয়।নাবালিকা মমতাজের দেখাও মেলে।

কিন্তু! আইন-মোতাবেক মা-মেয়ের সাক্ষাৎ হল না।

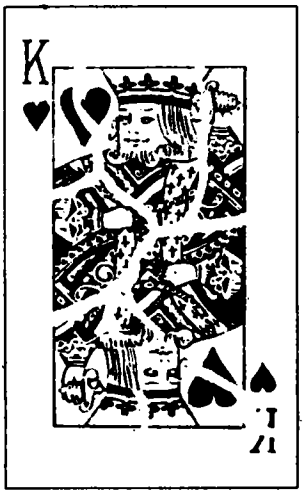
কেন? বাঃ! এই সহজ হিসাবটা বুঝলেন না?

'নবীন কায় নায়, অসহ্য ঝালে আস্তে!'

: এ আবার কী এমন নতুন কথা? এমনটা তো হয়েই থাকে!

আইন হচ্ছে আইন! বানতলায় দেখেননি?

☆ ☆ ☆



—আপনি ঠিকই বলেছেন। শুধু এগুলোর লোভেই আমি বেমক্কা খুন হয়ে যেতে পারি। এই হীরেটা যিনি আমাকে দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, 'বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এটার দাম।'

—তাই তুমি সেটাকে বুক-পকেটে নিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরছ?

—বুক-পকেট?

—ঐ হল আর কি! অন্যায় করেছ।

—কিন্তু ওর চেয়ে নিরাপদ গোপন-স্থান আমি পাব কোথায়?

—কেন? তোমাদের বাড়ি-ঘরদোর নেই? সেখানে আলমারি নেই?

—যদি বলি, 'নেই'?

—ও তো তর্কের খাতিরে বলছ। সে-ক্ষেত্রে আমি বলব, কোনও বিশ্বস্ত লোকের কাছে ওগুলো জিম্মা করে রেখে দেওয়া উচিত।

কমলা নির্বিবাদে বিষ্ণুগণেশের হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, অল রাইট! তাই করলাম!

—ইয়ার্কি নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছিলাম। নাও ধর।

কমলা নিজের সীটে গিয়ে বসে। বলে, আমিও সিরিয়াস, ব্যারিস্টার-সাহেব। সত্যিই আপনার জিম্মায় রাখতে দিলাম। যতক্ষণ আমরা একত্র থাকছি। এখনি যদি টিকিট-চেকার এসে আম্বালা থেকে অমৃতসরের ফার্স্ট-ক্লাস ভাড়া দাবী করে, আমি কি একটা মোহর বার করে দিতে পারি? আপনি সেক্ষেত্রে টাকা দিয়ে ভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন। একটা মোহর মনে-মনে তাঙিয়ে, বাকি টাকা আমার অ্যাকাউন্টে জমা রাখবেন।

বিষ্ণুগণেশ তার মুঠিভর্তি সম্পদ পকেটে রাখল। বলল, কমলা, তুমি কেমন করে আমাকে এতটা বিশ্বাস করতে পারলে? তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি তো চুপি চুপি যে-কোন স্টেশনে নেমে যেতে পারি?

—না, পারেন না।

—কিন্তু কেন পারি না? যুক্তিনির্ভর কারণ দেখাও।

—কারণ, সত্যিকারের ক্রিমিনাল ওভাবে কিছুতেই ভাবতে পারত না। তার কার্যক্রম হত অন্যরকম। ফার্স্ট স্টেপ: রেপ; সেকেন্ড স্টেপ: মার্ডার; থার্ড স্টেপ: মোহর-হীরে-পান্না!

বিষ্ণু হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, তা বটে। কিন্তু....ও ইয়েস! আমি প্রথমেই তোমাকে কথা দিয়ে রেখেছি তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কামড়ে দেব না। অল রাইট। এবার ঘুমানো যাক। রাতের অনেকটাই বাকি।

আলোটা নিবিয়ে দিতে সে হাত বাড়ায়। কমলা হাতখানা চেপে ধরে। বলে, না! ওটা জ্বলুক। আজ রাতে আমরা ঘুমাব না। এমন একটা অবাক-রাত আমার জীবনে কখনো আসেনি, আসবেও না কোনদিন।

—'আসেনি' এটা বলতে পার, কিন্তু কোনদিন আসবেও না, এটা ধরে নিলে কী করে?

—'আসেনি' এটাই বা আপনি ধরে নিলেন কী করে? আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে আপনি তো কিছুই জানেন না।

—আন্দাজ করেছিলাম। যেহেতু তুমি বললে যে, তুমি অবিবাহিতা। ফলে অচেনা পুরুষের সঙ্গে একান্তে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা তোমার নেই।

—ও! ব্যারিস্টার-সাহেবের বুঝি ধারণা বিবাহিতা মহিলারা হামেহাল অচেনা পুরুষের সঙ্গে একান্তে রাত কাটায়?

—'হামেহাল' তো আমি বলিনি। অন্তত প্রথম রাত্রিটা? ফুলশয্যার রাত্রিটা?

—না, ব্যারিস্টার-সাহেব। সেটাও এমন 'অবাক-রাত্রি' নয়। ফুলশয্যার রাতে কেউ তার সদ্যোবিবাহিতা সঙ্গিনীকে বলে না, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পার, মাঝ রাতে আমি কামড়ে দেব না।

বিষ্ণু হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, তা বটে! তবে ওটাও তোমার ভুল ধারণা, কমলাবাঈ। প্রথম রাত্রে কেউ সঙ্গিনীকে কামড়ে দেয় না।

—কেমন করে জানলেন?

—এবার তুমি বাজে তর্ক করছ। এতো সাধারণ জ্ঞান!

—আর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি বলে, আপনার সাধারণ জ্ঞানের ধারণাটা ভূষিমাল?

ম্লান হাসে বিষ্ণু। বলে, এর কী জবাব দেব?

—জবাব দিতে হবে বই কি! বলুন? আমি যদি প্রমাণ দিই? কংক্রিট এভিডেন্স দাখিল করি?

—বুঝলাম না। কীসের এভিডেন্স?

—এই দেখুন।

হঠাৎ ওর দিকে পেছন ফিরল মেয়েটা। দ্যাখ-না-দ্যাখ—ব্লাউজের পিছন দিকটা টেনে উপরে তুলে দিল। গজদন্তশুভ্র পৃষ্ঠদেশে কালি দিয়ে কে-যেন কাটাকুটি খেলেছে।

দুরন্ত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে বিষ্ণুগণেশ: ওগুলো কী?

তৎক্ষণাৎ ব্লাউজটা টেনে নামিয়ে দেয়। এদিকে ফেরে। বলে, বসুন শান্ত হয়ে। ওগুলো দাড়ি-কামানো-ব্লেডের কাটা-দাগ। শুকিয়ে গেছে।

—কিন্তু...মানে....ওগুলো তোমার পিঠে...

—বিয়ে আমার হয়নি, কিন্তু অজানা রাজপুত্রের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাত্রিবাসের সৌভাগ্য আমার হয়েছে বৈকি। আপনি কামড়ে দেবার কথা বলেছিলেন, তাই

না, ব্যারিস্টার-সাহেব? আজ্ঞে না, কামড়ে সে দেয়নি। শুধু ব্লেড দিয়ে ফালা-ফালা করে দিয়েছে আমার পিঠ-বুক-উরু!

বিষ্ণুগণেশ প্রশ্ন করতেও ভুলে গেল। পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক।

—নিশ্চয় বুঝেছেন, হেতুটা। হি ইজ আ স্যাডিস্ট—ধর্ষকামী! নারীর রক্তক্ষরণ না দেখলে তার যৌন-তৃপ্তি হত না!

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল বিষ্ণু। তারপর বললে, কেমন করে তার খপ্পরে গিয়ে পড়লে তুমি?

—ফাঁদ পেতে ব্যাধ পাখি ধরে, দেখেননি?

—কতদিন আগে? তখন তোমার বয়স কত?

— নয়।

—না, আমি জানতে চাইছি—কত বছর বয়সে ঐ পাষণ্ডটার সঙ্গে তোমাকে প্রথম রাত্রিবাস করতে হয়?

—তাই তো বললাম, নয়।

— নয়! কী বলছ কমলা! তখনো তো তোমার...

—না হয়নি। কিন্তু ব্লেড দিয়ে গা-হাত-পা চিরে দিলে ব্যথা লাগার মতো বয়সটা তো হয়েছে!

আবার নতনেত্রে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, লোকটা কে? তুকাজিরাও হোলকার অব ইন্দোর?

মাথা নাড়ল কমলা। সম্মতিসূচক।

—ও তোমাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেছল?

—না, জোর-জবরদস্তি নয়। কৌশলে। মাকে ও খবর পাঠিয়েছিল ম্যাটিনী শো-তে আমাকে চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। মা আপত্তি করেনি। তখন আমি ফ্রক পরতাম। মাথায় বো বাঁধতাম। বডিস্ পরতাম না, প্রয়োজনই হত না। ফলে মা বুঝতেই পারেনি ওর উদ্দেশ্যটা—

—আর তারপর তোমার মা তোমার সন্ধান পায়নি?

—পেয়েছিল। দু-বছর পরে। তখন বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে একটা বাড়িতে ওরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। মা কী জানি কোন্ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিসে খবর দেয়। সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিস এসেছিল; কিন্তু তার আগেই ওরা আমাকে সরিয়ে ফেলেছে। পুলিস আমার সাক্ষাৎ পায়নি। আমি তখন জাহাজের কেবিনে বন্দিনী। মহারাজ টাকা খাইয়ে আমার পাসপোর্ট বানিয়েছে। মিথ্যা পরিচয়ে আমাকে বিলেতে নিয়ে চলেছে। উপায় কী? বিলাতে কোন্ মেমসাহেব ওর 'স্যাডিজম'-এর অত্যাচার সইবে বলুন?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বিষ্ণুগণেশ। কী-একটা খুচরো স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়ালো। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। 'চাগর্ম'-ডাক শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কেউই কর্ণপাত করল না। গাড়িটা ছাড়ল।

বিষ্ণু বললে, কমলা! আমাকে সব কথা খুলে বলবে, প্লীজ?

—কী দরকার ব্যারিস্টার-সাহেব? আপনি কেন অহেতুক এসব নোঙরামির মধ্যে আসবেন?

—অহেতুক নয়, কমলা। হেতু নিশ্চয় আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই বলেই জানতে চাইছি। নাহলে তোমার জীবনের একটা বেদনাদায়ক লজ্জাকর ইতিহাস শুনতে চাইতাম না।

—বুঝেছি, বাবুজী। আপনার পরিচয় এক রাতেই পেয়ে গেছি। কিন্তু ভাগ্যতাড়িতা একটা মেয়ের জন্য এভাবে আপনার অমূল্য জীবনটা কি বিপন্ন করা ঠিক? জানি না, আপনার সংসারে কে কে আপনার মুখ চেয়ে আছেন—বাবা-মা ভাই-বোন, স্ত্রী...

বিষ্ণু বললে, ধরে নিতে পার আমি একলা। একেবারে একলা!

—তবু দেখলেন তো, মহম্মদ সুলের হিপ-পকেটে লোডেড রিভলভার।

বিষ্ণু নিঃশব্দে উঠে গেল। তার সুটকেস খুলে বার করে আনল একটা আগ্নেয়াস্ত্র। দেখালো। বলল, এটা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করি বলে অহেতুক পকেটে নিয়ে ঘুরি না। মহম্মদ সুলের মতো মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করার হিম্মৎ আমার আছে।

কমলা একটু ইতস্তত করে বললে, কিন্তু কেন? কেন আপনি ঐ নরকের কীটটার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামবেন? আমাকে বাঁচাতে? আমার যে বাঁচবার ইচ্ছেটাই নেই, বাবুজী—

—আছে। না হলে এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

—না! জান-বাঁচাতে পালাচ্ছি না। আবার মরতেও আমি ভয় পাই না। আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই...প্রতিশোধ নেব বলে!

—বেশ তো, সেই কাজেই যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি?

কথাটা বোধহয় ওর কানে যায় না। একই নিশ্বাসে বলে চলে, আপনি কি বিশ্বাস করবেন বাবুজী, ঐ নরপিশাচটা—ইন্দোররাজ তুকাজিরাও— পোষা কুত্তাগুলোকে কীভাবে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে? ওদের লোভ দেখিয়েছে: কমলাবাঈকে জ্যান্ত ধরে আনতে পারলে এক লাখ টাকা ইনাম দেওয়া হবে। কিন্তু জ্যান্ত ধরতে না পারলে যেন কমলাবাঈকে কোনক্রমেই হত্যা করা না হয়! সে-ক্ষেত্রে শুধু ঐ মেয়েটার নাকটা কেটে আনতে হবে।রক্তাক্ত একটা মানুষের নাক মেথিলেটেড-স্পিরিটের বোতলে। তুকাজিরাওয়ের ট্রফি-রুম-এ স্টাফ্‌ড্ বাঘের মাথা, হরিণের চামড়া আর বাইসনের শিং-এর মাঝখানে স্যাডিস্ট লোকটা সাজিয়ে রাখবে সোনার আধারে ঐ ট্রফিটা। ঐ কাটা-নাকটা যে তুকাজিরাওকে পৌঁছে দেবে সে খরচ-খরচা বাদে পাবে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনাম!

বিষ্ণু স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কমলাবাঈ বলে, বাবুজী, আপনার খানদান আছে। আপনি চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ। কেন এসব নোংরামির মধ্যে স্বেচ্ছায়

ঢুকে পড়তে চাইছেন?

বিষ্ণু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, যদি বলি, তোমাকে বিবাহ করতে চাই বলে?

এবার বজ্রাহতা হবার পালা কমলাবাঈ-এর। সেও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওরা দুজনেই টলছে। গাড়িটার গতিবেগের জন্য কী? কিসের গতি? জীবনের?

ধীরে ধীরে বসে পড়ল কমলা। মাথা নিচু করে বললে, তা হয় না, বাবুজী?

বিষ্ণু একছুটে চলে এল ওর বেঞ্চিতে। পাশাপাশি বসল। ওর কাচের চুড়ি-পরা হাত দুটো টেনে নিয়ে বললে, আলবৎ হয়। তুমি রাজি হলেই। এভাবেই তুমি লোকটাকে প্রতিহত করতে পার। আইনের দুর্ভেদ্য দুর্গে আমি তোমাকে রক্ষা করব। এভাবে মহম্মদ সুলে তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। তুমি হবে আমার ঘরওয়ালী। লীগাল স্পাউস! শোন কমলা—আমি পিতার ত্যাজ্যপুত্র! সমাজে একঘরে। কালাপানি পাড়ি দিয়েছি বলে। আমি আজ আর খানদানী ঘরের ছেলে নই। সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত! আমি যদি বিলেতফেরত কোনও রাজস্থানী ক্ষত্রিয় কন্যাকে...

জোর করে হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয় কমলা। দু-হাতে মুখটা ঢাকে। বলে, না, না, না! তা হয় না। বাবুজী, আমাকে পাগল করে দেবেন না। আমি রাজস্থানী নই। হিন্দুই নই। আমার নাম:মমতাজ বেগম। আমি ওয়াজির বেগমের মেয়ে—বাবার নাম জানি না। আমি....আমি...দীর্ঘকাল প্রতি রাত্রে ধর্ষিতা! আমার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন! আর....আর....আমি একটি সন্তানের জননী! বাবুজী! আমাকে এমন স্বর্গের লোভ দেখানো পাপ। আত্মসংযম হারিয়ে আমি....আমি....

বিষ্ণু দু-হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলল ওর দুই বাহুমূল। সবলে বুকে টেনে নিয়ে নিজ ওষ্ঠাধরের নিষ্পেষণে নীরব করে দিল সৌভাগ্যবতী হতভাগিনীকে।

☆ ☆

রেলস্টেশনে মমতাজ আর চতুর্বেদীর আকস্মিক সাক্ষাতের পর সাত-আট মাস কেটে গেছে। কমলাবাঈয়ের জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন কয়টা মাস! 'মিলন' মানে যে ব্লেডের আঘাতে রক্তক্ষরণ নয় এই সত্যটা এতদিনে বুঝেছে ঐ একটি সন্তানের হতভাগী জননী। কাজের চাপে বিষ্ণুগণেশকে ঘুরতে হয়েছে উত্তর-ভারতের নানান শহরে—অমৃতসর, লাহোর, পাতিয়ালা, আম্বালা। সর্বত্রই ওরা দুজন আশ্রয় নিয়েছে খানদানী হোটেলের দ্বৈতশয্যাবিশিষ্ট কামরায়। সর্বত্রই চতুর্বেদী এবং মিসেস চতুর্বেদী পরিচয়ে। লাহোরে এসে এবার আর প্রীতম সিং-এর পেইং-গেস্ট হতে পারেনি। জলন্ধর স্টেশনেও সেবার কোনও গোলমাল হয়নি। রুক্মিণী যখন স্টেশনে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসে ততক্ষণে কামরায় অনেকগুলি যাত্রী।

ওয়াজির বেগম তার গচ্ছিতধন বিষ্ণুগণেশের হাতে সমর্পণ করে ফিরে গেছে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী মহম্মদ আলির কাছে।

এই আট মাস ধরে বিষ্ণুগণেশ লক্ষ্য করেছে কে বা কারা তাদের দুজনকে ক্রমাগত অনুসরণ করে চলেছে। চোখে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু ছায়াসঙ্গীদের অস্তিত্বটা আন্দাজ করা যায়। ওরা তাদের চিনতে পারেনি। পরবর্তীকালে বোম্বাই হাইকোর্টের মামলায় তাদের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল: সফি-আহমেদ, পাণ্ডে, শ্যামরাও দীঘে, আনন্দরাও ফাঁসে, শঙ্কররাও বাপুরাও, বিহারীলাল, আন্নাসাহেব, বুলাকীদাস...এই রকম অন্তত পঞ্চাশটি নাম আদালতে নথীভুক্ত হয়। এদের কেউ কেউ মহারাজার বেতনভুক ভৃত্য, অপকর্মে পারদর্শী; কিছু 'ফুরনের চুক্তি'তে কাজ করে। অর্থাৎ কুকার্য সম্পন্ন হলে নগদ বকশিস্ পায়। দু-তিনজন ফুরনের চুক্তিতে মুক্ত হয়ে রাজসেবা করছে। অর্থাৎ তারা দণ্ডিত আসামী—ডাকাতি বা খুন করে দীর্ঘমেয়াদী জেল খাটছিল। মহারাজ তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে, হয়তো ছয় মাস বা নয় মাসের জন্য, কয়েদীকে শর্তসাপেক্ষে সাময়িক মুক্তি দিয়েছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বে-আইনি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর সুসম্পন্ন করতে পারলে—খুন বা নারীহরণ—আসামীরা চিরতরে মুক্তি পাবে। না পারলে, আবার জেলে ফিরে যাবে, বাকি মেয়াদ খাটতে। আর কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যদি বেমক্কা ধরা পড়ে যায়? তাহলে আর রক্ষা নেই! লোকটা রাজসাক্ষী হয়ে যেতে পারে যে! তখন তো আদালতে প্রকাশ হয়ে পড়বে মূল ষড়যন্ত্রকারী শাসক-শোষক মহামহিমের পরিচয়। তাই সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ধরাপড়া হতভাগ্যকে জেলের ভিতরেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এটাও ঐ নবীন 'কায়নায়'!—নতুন কথা কিছু নয়। কৌটিল্যের আমল থেকে শুরু করে এই স্বাধীন ভারতে আজ-তক্ সমান-তালে হয়ে আসছে। প্রজাবৃন্দ এতে অভ্যস্ত! পোর্ট পুলিসের ডি. সি. মেহ্তা-সাহেব খিদিরপুরে খুন হয়ে যাবার পর দেখেননি? হত্যাকারী ধরা পড়ে যাওয়াতে বেচারির কী হাল হল? রাজসাক্ষী হওয়া কি সোজা কথা? সেকালের রাজা-মশাই এবং এ-কালের 'ষড়যন্ত্রী-মশাই' কারও ঐসব রাজসাক্ষী-ফাক্কি বরদাস্ত হয় না। অপরাধজীবী অর্থের বিনিময়ে অপরাধ করবে। ব্যস্! সাক্ষী দেবার ল্যাকল্যাকানি কেন? মরতে তো হবেই!

মমতাজ জানিয়ে দিয়েছে তার সিদ্ধান্ত: বিষ্ণুগণেশকে সে বিবাহ করতে পারবে না। তার ধারণা যে, তার নিজের জীবনটা বরবাদ হয়েই গেছে, বিষ্ণুগণেশের অনিবার্য আকস্মিক মৃত্যু হবে যদি সে মমতাজকে তার স্থায়ী জীবনসঙ্গিনী করবার দুঃসাহস দেখায়। ইন্দোরের মহারাজের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয় বিষ্ণুগণেশের পক্ষে। শুধু আর্থিক সঙ্গতির আশমান-জমিন ফারাকের জন্যই নয়, মূল কারণ—যেহেতু বিদেশী সরকার ঐ রাজমুকুটধারী দেশীয় পদলেহী কুকুরটির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আইন বলো, আদালত বলো, ঠাট-বাট বজায় আছে বটে, কিন্তু সবাই চলে শাসকদের অঙ্গুলিহেলনে।

বিষ্ণুও এ তত্ত্বটা স্বীকার করতে বাধ্য হল দু-দুবার মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে। একবার জনবহুল সড়কে একটা গাড়ি তাকে যেন চাপা দেবার জন্যই রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথের উপর ধেয়ে আসে। পুলিস চালককে ধরতে পারেনি।

পুলিসের ধারণা ড্রাইভারটা মত্তাবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। দ্বিতীয়বার, অমৃতসরের একটি হোটেলের সামনে অল্পের জন্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে। তিনতলার ছাদ থেকে একটা ভারী ফুলগাছের টব কী করে যেন ওর মাথা থেকে বিঘৎখানেক দূরে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। এটাও, অমৃতসরের ডি. সি. পাকল-সাহেবের সুচিন্তিত অভিমতে, একটি কার্যকারণ-ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র! 'এমনটা তো হয়েই থাকে'!

বিষ্ণুগণেশ মমতাজকে নিয়ে ফিরে এল বোম্বাইয়ে।

☆ ☆ ☆



তেরই ডিসেম্বর 1924।



মেরিন-ড্রাইভে বাওলা-সাহেবের বাড়িতে দেখা করতে এল বিষ্ণুগণেশ আর মমতাজ। বোম্বাই স্টেশন থেকে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল। বাওলা পুত্রস্নেহে ভালবাসতেন বিষ্ণুগণেশকে। জরুরী কাজ সরিয়ে রেখে তিনি ওঁদের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আবদুল কাদের বাওলা এতদিনে বোম্বাইয়ের 'সিটি-ফাদার'। কর্পোরেশনে তাঁর প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। বোম্বাই প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ খাতির। বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস্, পুলিসের চীফ কমিশনার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিশনার ইত্যাদি তাঁর বন্ধুস্থানীয়। শহরে তাঁর খান-আষ্টেক বহুতল-বিশিষ্ট প্রাসাদ। ইন্দোরের মহারাজের সঙ্গে আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়তো তিনি অসম প্রতিযোগী; কিন্তু সম্মান-প্রতিপত্তি এবং প্রভাব-খাটানোর প্রতিযোগিতায় হার মানার পাত্র নন।

পত্রযোগে বিষ্ণুগণেশ তাঁকে সব কথাই জানিয়ে রেখেছিল।

ঘরে তিনি একাই ছিলেন। ওঁর ব্যক্তিগত সচিব যখন ওদের দুজনকে ঘরে পৌঁছে দিল তখন বাওলা-সাহেব তাকে বললেন, এখন ঘণ্টাখানেক আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

ওরা দুজন ওঁকে অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করল।

বাওলা-সাহেব মমতাজের দিকে ফিরে বললেন, তোমার সব কথা আমি জানি না, তবে তোমাদের বর্তমান সমস্যার কথা আমাকে বিস্তারিত জানিয়েছে বিষ্ণুগণেশ। প্রথম কথা, তুমি বল, কী নামে তোমাকে ডাকব? মমতাজ না কমলা?

কমলা বললে, সেটা আপনিই স্থির করুন, স্যার! কারণ সেটা নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না—আপনাকে আদাব জানাব, না প্রণাম।

বাওলা উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। বলেন, তোমাকে আমি 'মমতাজ' বলেই ডাকব। ইন্দোর মহারাজার প্রাসাদে যেমন 'মমতাজ' নামটা ছিল বে-মানান, ঠিক তেমনি আমার এই মুসলমান-ঘরানায় 'কমলাবাঈ' নামটা অনেকের কানে বেসুরো বাজবে। এবার বল মমতাজ, তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছ?

—কিছুই শিখিনি। মোটামুটি অক্ষর-পরিচয় আছে—হিন্দি এবং ইংরেজি হরফ। যেহেতু প্রায় আড়াই বছর আমি লন্ডনে ছিলাম তাই মোটামুটি কথ্য-ইংরেজিটা রপ্ত হয়ে গেছিল।

—বিলেতী-কেতার এটিকেট?

—আজ্ঞে না। আমি বিলাতে পর্দানসীন ছিলাম। তবে যে ইংরাজ-পরিচারিকা আমাকে দেখ্‌ভাল করতেন, বস্তুত যাঁর কাছে ইংরেজি বলতে শিখেছিলাম, তাঁর

কাছেই বিলাতী এটিকেটও সামান্য শিখেছি—টেব্‌ল্‌-ম্যানার্স বা কাটসি।

বাওলা বললেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, মমতাজ। আমি জানি, তুমি খুব ভাল গান গাইতে পার—ঠুংরি, ভজন এবং গজল। আর কী কী করতে পার জানতে চাইছি একটি বিশেষ হেতুতে। যাতে আমি তোমাকে কোনও 'গেইনফুল অকুপেশন' দিতে পারি। তুমি যাতে উপার্জনক্ষম হতে পার—কারও দয়ার উপর নির্ভর না করে। অর্থাৎ আমি শুধু তোমাকে নিরাপত্তাটুকুই দেব—অন্নবস্ত্র নয়! সেগুলো উপার্জন করবে তুমি। শোন, মমতাজ, আমার বয়স উনসত্তর। আমার দুই বিবাহ—দুই বিবিই আমাকে ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছেন। আমার অনেকগুলি ছেলে ও মেয়ে—তারা স্বাবলম্বী—নিজ নিজ সংসারে থাকে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, এই পর্যন্ত। বস্তুত কাজের বাইরে নিজ পরিবারে আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তাই তোমাকে আমি 'কম্প্যানিয়ান' হিসাবে আমার কাছে-কাছে রাখতে চাই। প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে বলে রাখতে চাই—আমার শয্যাসঙ্গিনীর প্রয়োজন হয় না—রাত্রে আমি সম্পূর্ণ একাকী শয়ন করি, তাই করব। কিন্তু আমি যখন পার্টি 'থ্রো' করি, যখন পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করি, তখন আমার বাড়িতে একজন 'হোস্টেস'-এর অভাব হয়। জাপানে এ প্রয়োজনে 'গাইসা' নিয়োগ করা যায়—তারা যুবতী, সুন্দরী; তোমার মতো রূপসী ও সঙ্গীতদক্ষা; কিন্তু তারা দেহব্যবসায়ী নয় আদৌ! তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তুমি আমার 'কম্প্যানিয়ান' বা 'সঙ্গিনী'র পরিচয়ে এ বাড়িতে সসম্মানে থাকতে পার। আমার 'মেয়ে'র মতো।

মমতাজ বলল: আমি সানন্দে স্বীকৃত, স্যার!

—স্যার নয়, আব্বাজান! কিন্তু আমার কথাটা শেষ হয়নি 'বেটা'! আমার পরিবারে থাকতে থাকতে যদি কাউকে কখনো ভালবেসে বিয়ে করতে চাও.....

বাধা দিয়ে মমতাজ বলে ওঠে, সে প্রশ্নই ওঠে না, আব্বাজান। কারণ তাহলে তো আমি বিষ্ণুগণেশকে ত্যাগ করে আপনার 'হাভেলি'তে আসতেই চাইতাম না। আমার জন্য আপনাকে বাড়তি প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

—জানি তা। পরিবর্তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুমি আমাকে গজল শুনিও। তাহলেই শোধবোধ হয়ে যাবে! গান শুনতে আমি দারুণ ভালবাসি। এককালে আমি নিজেও 'সরোদ' বাজাতাম! হেসো না! ভালই বাজাতাম!

বারোই জানুয়ারী 1925।



প্রকাণ্ড একটা 'ক্যাডিলাক' গাড়িতে ওঁরা মাত্র তিনজন যাত্রী। চালকের আসনে একলা মক্‌বুল। পিছনের সীটে মাঝখানে মমতাজ, তার ডাইনে বাওলা-সাহেব, বাঁয়ে মিস্টার ম্যাথুজ—বাওলা-এস্টেটের প্রৌঢ় ম্যানেজার। বাওলা-সাহেব কদিনের জন্য লোনাভিলা স্বাস্থ্যাবাসে অবকাশযাপনে গেছিলেন—স-সঙ্গিনী—সে সময় রিভলভারধারী গুর্খা দেহরক্ষী ছায়ার মতো অনুসরণ করত তাঁদের। কিন্তু আজ সন্ধ্যারাত্রে ওঁরা যাচ্ছেন জনবহুল বম্বে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে—নিতান্ত কাছাকাছিই। মেরিন-ড্রাইভের প্রাসাদ থেকে মালাবার হিল্‌সে হ্যাঙিং-গার্ডেনস-এর বাঙলোয়। দূরত্ব পাঁচ-মাইল হয়-কি-না-হয়।

সন্ধ্যা তখন সাতটা। তবে এদিকটায় গাড়ি-ঘোড়া কম। রাস্তায় আলো জ্বলছে। মক্‌বুল তাই হেড-লাইট জ্বালেনি, সাইড-লাইট দুটি জ্বেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ মক্‌বুল রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখতে পেল একটি 'ম্যাক্সওয়েল' গাড়ি ওকে ওভারটেক করতে চাইছে। মক্‌বুল পাস্ দিল, গাড়ির গতি কমিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগনালও দিল।

ম্যাক্সওয়েল গাড়িটা পথ খোলা পেয়েও অনেকক্ষণ ওভারটেক করল না। তারপর রাস্তা একটু নির্জন হতেই হঠাৎ ক্যাডিলাক গাড়িটাকে অতিক্রম করে বেমক্কা বাঁয়ে ঘুরে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। অত্যন্ত দ্রুত ব্রেক কষে, স্টিয়ারিঙ ঘুরিয়ে কলিশন এড়ালো মকবুল। তার গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ার পর মকবুল মাথা বার করে অপর গাড়ির ড্রাইভারকে বলে ওঠে: কাইসে চালাতে হ্যায়, ইয়ার?

জবাব দিল লোকটার ওষ্ঠাধর নয়, তার হাতের রিভলভার।

মকবুল তার শেষ জীবনের সঙ্গিনীর গালে-গাল রাখল: ক্যাডিলাক গাড়িটার স্টিয়ারিঙ হুইলে। হুইলটার চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে—মকবুলের শীর্ণ শরীরের রক্তবিন্দু!

ও-গাড়ি থেকে নেমে জনা-পাঁচেক হাতিয়ারবন্দ ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে ক্যাডিলাক গাড়িখানাকে। একজনের হাতে টাঙি, একজনের কুরকি। বাকি তিনজনের হাতে লোডেড রিভলভার। বাওলা-সাহেব কিছু বলার আগেই সর্বপ্রথম আততায়ী তাঁর দেহে পর-পর দু-দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিল। একটা হৃদপিণ্ডে, একটা তলপেটে। আবদুল কাদের বাওলা—বোম্বাইয়ের সিটি-ফাদার জ্ঞান হারানোর আগে দ্বিধ্বনি-বিশিষ্ট একটি শব্দ উচ্চারণের সুযোগটুকু মাত্র পেয়েছিলেন: আল্লা!

ম্যাথুজ বিপরীত দিকের পাল্লাটা খুলে সবেমাত্র রাস্তায় পা দিয়েছেন, ঠিক

তখনই কুঠারধারীর অস্ত্রটা এসে সজোরে আঘাত করল তাঁর মাথায়। মেরী মাতার অসীম করুণা— কুঠারের ধারালো দিকটা দিয়ে নয়। ফলে ম্যাথুজ ভূলুণ্ঠিত হলেন বটে, তবে ছিন্নশির অবস্থায় নয়।

গুণ্ডাদলের সম্মুখে এখন বাধাহীন খোলা পথ। উভয় অর্থেই। মেরিন ড্রাইভ থেকে মালাবার হিল্‌সের দিকে যাবার পথের উপর একটাও গাড়ি নজরে পড়ছে না। আক্রান্ত ক্যাডিলাক-গাড়ির চারজন আরোহীর মধ্যে তিনটি বৃদ্ধই বিনারণে ভূতলশায়ী। সেদিক থেকে নারী অপহরণের পথটা পরিষ্কার।

তিন-সেকেন্ডের ভিতর উপর্যুপরি ঘটে গেল দু-দুটি ঘটনা।

রাজকার্যে নিয়োজিত কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার ফলাফল হল মারাত্মক।

প্রথম ঘটনাটার জন্য ওরা নিজেরাই দায়ী। আক্রমণকারীদের নিজেদের মধ্যেই ছিল না সমঝোতা। জনাতিনেক চাইছিল মমতাজকে সশরীরে 'জিন্দা' অপহরণ করতে, লাখ টাকা ইনামের লোভে। বাকি দুজনের ধারণা এতটা লোভ করা মূর্খামি। ধরা পড়ে গেলে ফাঁসি যেতে হবে ওদেরই—'রাজকার্যের দোহাই দিয়ে' রেহাই পাওয়া যাবে না। ফলে তাদের অভিমত হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী ঐ মেয়েটিকে জিন্দা রাখা বোকামি। ওর আধ-লাখ-টাকা-দামের নাকটা কেটে নিয়ে মেয়েটাকে হত্যা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনজনে মমতাজকে চ্যাংদোলা করে টানতে টানতে নিয়ে এল ম্যাক্সওয়েল গাড়িটার সীটে। চতুর্থজন দ্যাখ-না-দ্যাখ খাপ থেকে ভোজালিটা টেনে বার করে মমতাজের নাকে মারল এক কোপ! চশমা পরলে নাকের যে অংশটায় চশমার ছোঁয়া লাগে—যাকে ইংরেজিতে বলে নাকের 'ব্রীজ'—ঠিক সেখানে। ভোজালিতে যে-রকম ধার তাতে 'সেপটাম কার্টিলেজ' বা নাসিকাগ্রিক তরুণাস্থিটা অনায়াসে কেটে বেরিয়ে আসার কথা। মাখনের স্ল্যাবে ছুরি চালালে যেমন এক পরৎ উঠে আসে। দুর্ভাগ্যবশত তা হল না। কারণ মমতাজ চকিতে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। ফলে আঘাতটা লাগল ওর কপালে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে পড়ল আততায়ীর কুর্তায়। গাড়ি থেকে নেমে মমতাজ গগনবিদারী আর্তনাদ করে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই—নিতান্ত কাকতালীয় ভাবে—ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা।

একটা হুডখোলা মরিস্ ট্যুরার বাঁক ঘুরে ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাতে চার-চারজন যাত্রী। অসামরিক পোশাক বটে, কিন্তু ওঁরা চারজনই মিলিটারী অফিসার। বোম্বাই ব্যাটেলিয়ানের কমিশনড অফিসার্স! মালাবার গল্‌ফ-কোর্সে গল্‌ফ খেলে এখন ক্যান্টনমেন্টে ফিরছে। গাড়ির চালক নিতান্ত ভুল করে বাঁয়ে মোড় নেবার বদলে ডাইনে মোড় নিয়েছিল। আর তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে চারজনেই শুনতে পেয়েছে রমণীকণ্ঠের এক মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ঘ্যাঁ-চ্ করে ব্রেক কষেছে লেফটানেন্ট সেগার্ট। গল্‌ফ খেলার পর কয় পেগ গিলেছিল হিসাব নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে আকাশকে সম্বোধন করে লোকটা বলেছিল: আ ড্যামজেল ইন ডিস্ট্রেস্, সামহোয়্যার ইন দিস্ উইল্ডারনেস্!

বাকি তিনজন—লেঃ বেন্টলী, লেঃ স্টিভেন্স আর লেঃ কর্নেল ভাইকার্স —

ঝপাঝপ লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। প্রথমটা ওরা মনে করেছিল পথ-দুর্ঘটনা—সেটাই স্বাভাবিক; কারণ দুটি গাড়ি নাকে-নাক ঠেকিয়ে রাস্তার 'বার্ম'-এ নিথর দাঁড়িয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওদের ভুলটা ভেঙে যায়। রিভলভার, টাঙি আর কুঠারধারীদের দর্শনে।

ওরা তিনজনেই নিরস্ত্র। শুধুমাত্র লেঃ বেন্টলের হাতে একটা গল্‌ফ-স্টিক।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদটা চারজনেই শুনেছে। ভূতলশায়ী মানুষগুলোকে ওরা ভেবেছিল দুর্ঘটনার শিকার; কিন্তু তিন-চারজনে একটি যুবতীকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বাস্তব অবস্থাটা ওরা সমঝে নেয়।

—হোয়াট দ্যা ডেভিল আর য়ু ডুইং হিয়ার, নীগার্স?

কতটা ওদের ব্রিটিশারের স্বাভাবিক বীরত্ব, কতটা ক্লাব-অ্যালকহলের পবিত্রতার প্রভাব এবং কতটা দায়ী স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'আইভ্যানহো', তা এখন হিসাবের বাইরে—কিন্তু উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে ওরা চারজন যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সাহসিকতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য!

লড়াইটা হয়েছিল দশ থেকে পনের সেকেন্ড। আদালতে মামলা চলাকালীন তার বর্ণনা এক-এক সাক্ষী এক-এক রকম দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত সন্দেহের অতীত। প্রথমত, একপক্ষে ছিল পাঁচজন সশস্ত্র 'অপরাধজীবী' এবং অপরপক্ষে চারজন নিরস্ত্র সমরশিক্ষিত ইংরেজ। তার ভিতর শুধু একজনের হাতে ছিল একটা গল্‌ফ-স্টিক। সেটাকে অস্ত্র বলা যাবে কিনা তা আপনাদের বিবেচ্য। নিরস্ত্র লেঃ সেগার্ট লোকটার উদ্যত-রিভলভারকে উপেক্ষা করে সবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাকে জড়িয়ে ধরতে। লেঃ সেগার্ট পর-পর দুবার গুলিবিদ্ধ হয়—একবার বাঁ কাঁধে, একবার পায়ে; কিন্তু সে তার আক্রমণকারীকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। এই লোকটাই বাওলা-সাহেবের হত্যাকারী। সেগার্ট তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ভূতলশায়ী লোকটা কোনক্রমে তার ডান হাতটা আলগা করে এবার সেগার্টের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করতে চাইল। পারল না। কারণ খণ্ডমুহূর্ত পূর্বে লেঃ বেন্টলে সজোরে চালিয়েছে তার গল্‌ফ-স্টিকটা ঐ লোকটার খুলি লক্ষ্য করে। লোকটা সংজ্ঞা হারায়। ইতিমধ্যে রিভলভারের শব্দে ও চিৎকার চেঁচামেচিতে ক্রমে ক্রমে আশপাশের লোকজন ছুটে আসতে শুরু করেছে। অপরাধজীবীদের চারজন ম্যাক্সওয়েল গাড়িটায় লাফিয়ে ওঠে। দ্রুতগতি বাঁকের পথে হাওয়া হয়ে যায়। পড়ে থাকে একজন—গলফ্-স্টিকের বাড়ি খেয়ে। বোম্বাইয়ে সিটি-ফাদারকে যে স্বহস্তে বধ করেছে, ইন্দোরের 'নটি-ফাদারের' টোপ গেলায়।

☆ ☆

জে. জে. হাসপাতাল কাছেই। আহতদের অনতিবিলম্বেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। ম্যাথুজ, মক্‌বুল এবং মমতাজ চার-পাঁচদিন পরে মুক্তি পায় হাসপাতাল থেকে।

লেঃ সেগার্টকে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। আর আবদুল কাদের বাওলা পরদিন সকালে মারা যান।

বম্বের সিটি-ফাদারের মৃত্যু অথবা ইংরেজ মিলিটারীম্যানের রক্তপাত—কারণটা যাই হোক—এবার ভারতীয় গোয়েন্দা ও পুলিস বিভাগ 'কঙ্কতিকা সম্মার্জনী' চালিয়ে লাহোর থেকে বোম্বাই—হায়দ্রাবাদ থেকে ইন্দোর—ব্যতিব্যস্ত করে তুলল! নয়জন আসামীর বিরুদ্ধে বাওলা-হত্যাপরাধের মামলা রুজু হল বোম্বাইয়ের অরিজিনাল ক্রিমিনাল জুরিসডিকশনে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিস্টার জাস্টিস্ ক্রাম্প্-এর আদালতে, জুরী-মহোদয়দের উপস্থিতিতে, বিচার শুরু হল মাত্র চার মাসের মধ্যে: সাতাশে এপ্রিল 1925 তারিখে।

আসামী নয়জনের নাম-বয়স-পরিচয়:

1. সফি আহ্মেদ (21)—ইন্দোর অশ্বারোহী পুলিসের রিসালদার।
2. পুষ্পাশী পাণ্ডে (23)—অ্যাসিস্টেন্ট এ. ডি. সি., ইন্দোর স্টেট।
3. বাহাদুর শাহ্ (20)—ইন্দোর মহারাজা-নিযুক্ত ড্রাইভার।
4. আকবর শাহ—ইন্দোরের একজন ব্যবসায়ী।
5. শ্যামরাও দিঘে (28)—ইন্দোর এয়ার-ফোর্স-এর ক্যাপ্টেন।
6. মমতাজ মহম্মদ (25)—ইন্দোর সি. আই. ডি. পুলিসের ইন্সপেক্টর।
7. আবদুল লতিফ্ (25)—মটর গাড়ির চালক, ইন্দোর রাজস্টেটের।
8. করামৎ খাঁ (28)—ইন্দোর অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক।
9. আনন্দ রাও ফাঁসে (32)—ইন্দোর বাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট-জেনারেল।

ব্যাপার কী? ঘটনা বোম্বাইয়ের। খুন হলেন বোম্বাই শহরের নগরপতি। কিন্তু এতগুলি ইন্দোরবাসী আসামী এসে ভিড় করল কেন কাঠগড়ায়? সকলেই সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চায়। তার চেয়েও বড় বিস্ময়, প্রথম আসামী সফি আহ্মেদ-এর তরফে আইনজীবী যিনি আদালতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি জে. এন. সেনগুপ্ত, কলকাতা বার-এর এক নম্বর ব্যারিস্টার। সফি আহমেদের সারা বছরের রোজগারের চেয়ে যাঁর একদিনের 'ফী' বেশি! দ্বিতীয় থেকে আট নম্বর আসামীর জন্য বোম্বাই-হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ভেলিঙ্কারকে নিয়োগ করা হল এবং নবম আসামীর—ইন্দোর সামরিক বাহিনীর অ্যাডজুটান্ট জেনারেল আনন্দ রাও ফাঁসের—তরফে কাউন্সেলার হিসাবে ইন্দোররাজ নিয়োগ করলেন ভবিষ্যৎ-পাকিস্তানের জনক ব্যারিস্টার মহম্মদ আলি জিন্নাকে!

☆ ☆

এখানে স্থানাভাব—নাহলে আপনাদের শোনাতাম তিন তিনটে ব্যারিস্টারের নাকে-ঝামা-ঘষে দিয়ে, বিশেষত জিন্না-সাহেব এবং সেনগুপ্তের সওয়ালের সম্মুখে, কী দৃপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিল মমতাজ। তিন ব্যারিস্টার মিলে আপ্রাণ চেষ্টা

করেছিলেন যাতে তুকাজীরাও হোলকারের নামটা কোন ক্রমেই মামলায় না উঠে পড়ে; কিন্তু মমতাজের সুচতুর উত্তরদানের কায়দায় সে নামটা বারে বারে উঠে পড়ছিল। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া" কাগজে মমতাজের অনবদ্য জবানবন্দী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। এক সময়ে মিঃ জিন্না আদালতে আবেদন করেন যাতে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিকে আদালতকক্ষে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। কীটদষ্ট প্রাচীন আইনের বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না:

Mr. Jinnah remarked that these passages are likely to influence the jury and on that alone he was entitled to a rule. Although the Times of India might be the leading paper in Bombay City, it must realize that it would not possibly go on commenting on the trial while it was proceeding.

His Lordship said that it could be stopped by excluding the reporter.

Mr. Jinnah assured the Court that the defence were not actuated by any other consideration, except that there should be no undue interference with the due course of the administration of justice.

Mr. Justic Crump: Oh! It's a storm in a tea-cup.

Mr. Jinnah: Then, My Lord, let us have the tea-cup in Court. Let the Times of India come here and explain how it came to incorporate all these remarks.

His Lordship promised to think over the matter and pass suitable orders in time.

Nothing, however, came of the matter.

সওয়াল-জবাবের সামান্য উদ্ধৃতি শোনাই বরং; যাতে বোঝা যাবে মমতাজ কী-ভাবে বাঘা-বাঘা ব্যারিস্টারকে কাত করেছিল; টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টার—এবং তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার — হৃদয় জয় করেছিল:

ব্যারিস্টার: এ কথা কি সত্য যে আপনি প্রয়াত বাওলা-সাহেবের রক্ষিতা হিসাবে তাঁর হাবেলীতে ছিলেন?

মমতাজ: না, সত্য নয়।আমি তাঁর কন্যার পরিচয়ে তাঁর হাবেলীতে ছিলাম।

ব্যারিস্টার: আপনি কি বিবাহিত, বিধবা, না কুমারী?

মমতাজ: কুমারী।

ব্যারিস্টার: কিন্তু আপনার একটি মৃত কন্যা-সন্তান হয়েছিল। তাই নয়?

মমতাজকে ইতিপূর্বেই ব্যারিস্টার-সাহেব হোস্টাইল উইটনেস্ হিসাবে আদালত

কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই এই 'লীডিং কোশ্চেন'।

মমতাজ নির্বিবাদে দৃঢ়স্বরে বললে: না।

ব্যারিস্টার: না? আপনি ভুলে যাবেন না, কমলাবাঈ, আপনি হলফ নিয়ে আদালতে সাক্ষী দিচ্ছেন!

মমতাজ: ভুলব কেন? ভুলিনি তো সে-কথা!

এই সময় বিচারক সওয়াল-জবাব থামিয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু ডাইরেক্ট এভিডেন্সে আপনি তো বলেছিলেন যে, আপনার একটি কন্যাসন্তান হয়েছিল?

মমতাজ: আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার। বলেছিলাম। কিন্তু ব্যারিস্টার্-সাহেব আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করছেন, আমি কোনও 'মৃত-সন্তান' প্রসব করেছি কিনা। তার জবাব: 'না'। অ্যান এম্ফাটিক: নো! জন্মের পরে আমার কন্যাসন্তান জীবিত ছিল। তার কণ্ঠস্বর আমি স্বকর্ণে শুনেছিলাম। তারপর তাকে তার পিতার আদেশে হত্যা করা হয়!

ব্যারিস্টার ঝাঁপিয়ে পড়েন: অবজেকশন য়োর অনার। সাক্ষী অবান্তর কথা বলছেন। প্রসিডিংস্ থেকে এই অবান্তর কথাগুলি কেটে দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছি হুজুর।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মমতাজ আর্তনাদ করে উঠেছিল: এই কি বিচার, ধর্মাবতার? এরপর এ ধর্মাধিকরণে কেউ কি আমার কাছে জানতে চাইবে না: কে, আমার কন্যাসন্তানের সেই হত্যাকারী ধর্ষকামী জনক?

বিচারক জোরে জোরে হাতুড়িটা ঠুকে বলেন: অর্ডার! অর্ডার! ব্যারিস্টার বেগতিক দেখে বলেন, আমার ক্রস্ একজামিনেশন এখানেই শেষ।

অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার জামশেদজী কাঙ্গা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ধর্মাবতার! রিডাইরেক্ট-একজামিনেশনে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। আপনি অনুমতি করলে...

ব্যারিস্টার জিন্না-সাহেব বলেন, কিন্তু ওঁর ঐ কন্যাসংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন আমরা তুলতে দেব না। সেটা হবে ইর্‌রেলিভেন্ট, ইম্মেটিরিয়াল অ্যান্ড অ্যাবসার্ড!

অ্যাডভোকেট-জেনারেল আদালতের রুলিং চাইলেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি যে সাক্ষীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তার নাম 'মমতাজ বেগম'। এটা প্রতিষ্ঠিত তথ্য। আসামীপক্ষের ব্যারিস্টার তাঁকে কোন্ অধিকারে 'কমলাবাঈ' নামে সম্বোধন করেন? যে মুহূর্তে ঐ নামটি উচ্চারিত হয়েছে, সাক্ষী তাতে সাড়া দিয়েছেন, কোর্টের বিবরণে তা নথীবদ্ধ হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই রিডাইরেক্ট-এ বাদীপক্ষ ঐ 'কমলাবাঈ' নামটার পূর্ণ ইতিহাস জানতে চাইতে পারেন। এবং সেটা শতকরা শতভাগ রেলিভেন্ট অ্যান্ড মেটিরিয়াল!

জজসাহেব এ যুক্তি মানতে বাধ্য হলেন।

কমলাবাঈয়ের সন্তানকে তার ধর্ষকামী পিতার আদেশে কীভাবে আঁতুড়ে হত্যা করা হয় বলতে বলতে সাক্ষী মমতাজ বেগম কান্নায় ভেঙে পড়ে! আদালতে অজ্ঞান হয়ে যায়।

টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টার যদি এ কিস্‌সা সবিস্তারে না ছাপে তবে তাকে জার্নালিজ্‌ম-এর জীবিকা ত্যাগ করে মুদি-দোকান খুলে বসতে হয়! জিন্না-সাহেব যাই বলুন!

হাজার হাজার টাকা খরচ করেও কিন্তু মামলা জেতা গেল না।

হিজ লর্ডশিপ রায় দিলেন—দুজন নির্দোষ, মমতাজ মহম্মদ আর করামত খাঁ। তারা বেকসুর খালাস। তিনজন হত্যাপরাধে দোষী— তারা চরমতম শাস্তি পাবে: সফি আহ্‌মেদ, পাণ্ডে আর দিঘে! মৃত্যুদণ্ড। বাকি চারজন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল!



তুকাজিরাও হোলকার ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন রায় শুনে।

তৎক্ষণাৎ আপীল করলেন প্রীভি কাউন্সিলে।

নভেম্বর মাসে সেই সর্বোচ্চ সংস্থা বম্বে হাইকোর্টের রায় পুরোপুরি বহাল রাখলেন। একচুল বদলালেন না।

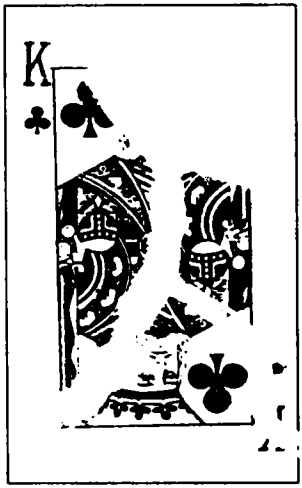
এবার বড়লাট বাহাদুরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা।

নাকচ হল তাও।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সফি আহমেদ—যে বাওলাকে হত্যা করেছিল এবং সেগার্টকে আহত করেছিল, পাণ্ডে—যার কুঠারে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন ম্যাথুজ, এবং দিঘে—যে ভোজালি দিয়ে মমতাজের নাকটা কাটতে চেয়েছিল—তিনজনই ফাঁসির দড়িতে ঝুলল।

অমৃতসর পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এফ. এইচ. পাক্‌ল্ সে সন্ধ্যায় 'হুইস্কি অন রক্‌স্' পান করেছিল অথবা ফরাসী 'শ্যাম্পেন', সে-কথা ইতিহাসে লেখা নেই। ইতিহাসের সেটা কাজও নয়। দিল্লীতে সফদর হাশ্‌মি, বানতলায় অনিতা ধাওয়ান, খিদিরপুরে মেহ্‌তা বা ধানবাদে শঙ্কর গুহনিয়োগী যেদিন খুন হল সেই-সেই দিনে কোন্-কোন্ 'ষড়যন্ত্রী-মশাই' নৈশাহারের অনুপান হিসাবে কী কী জাতীয় পানীয় গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাস কি তা লিখে রেখেছে? তবে? এটাই তো রেওয়াজ: নবীন কায়নায়।

তবে তুকাজিরাও অতঃপর কী করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত জানা যায়! সেটুকু জানিয়েই আমার ছুটি।



এপ্রিল মাসের তের তারিখ, 1926।

মহারাজ তুকাজিরাও হোলকারের খাশ-কামরা। সন্ধ্যা তখন সাতটা। সচরাচর এ সময় মহারাজ নাচঘরে বাইজীর গান শোনেন অথবা নৃত্যকলা উপভোগ করেন। কিন্তু আজ তিনি এসে বসেছেন তাঁর নিভৃত খাশ-কামরায়। বসেছেন নয়, গদিমোড়া আধুনিক কামদার ডিভান-জাতীয় একটি মখমলের শয্যায় অর্ধশয়ান। সম্মুখে হাতির দাঁতের পায়া-ওয়ালা জেড-পাথরের টেব্‌ল্। তার উপর শ্বেতাশ্বচিহ্নিত বোতল, চষক, কাচের পাত্রে বরফ, 'টং'। আর-একটি প্লেটে কিছু শূলপক্ক পক্ষিমাংস। মহারাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন দশাসই পুরুষ, যোড়হস্তে। মহারাজ এক চুমুক মদিরা পান করে বললেন, বালাজীরাও! তোমার মেয়াদ খতম হয়ে গেছে। সেকথা জানাতেই ডেকে পাঠিয়েছি। এবার আবার কারাগারে ফিরে যেতে হবে। বাকি মেয়াদ খাটতে। কিছু বলার আছে তোমার?

লোকটা মাজা ভেঙে বললে, আর দশটা দিন সময় দিন, সরকার! তার মধ্যে যদি না পারি তবে কারাগারে না পাঠিয়ে আমার গর্দান নেবেন, গরিবপরবর!

—তুমি জানো চিড়িয়া কোথায় আছে?

—জী হুজুর। ইতিমধ্যেই আমি কাজ হাঁসিল করতে পারতাম; কিন্তু গোপনে কাজটা করা যেত না, মহারাজ! জানাজানি হয়ে গেলে আবার সবাই বলত আপনিই আমাকে পাঠিয়েছেন ছুকরিটাকে উঠিয়ে আনতে।

—বাজে কথা বল না। তুমি ভয় পেয়েছ। তুমি জানতে পেরেছ কমলাবাঈ দু-দুটো বন্দুকধারী গুর্খা দারোয়ান পুষেছে।

—হক কথা, হুজুর। পুষেছে। তাছাড়া একজোড়া জার্মান শেপার্ড কুত্তাও পুষেছে। কিন্তু তাই দেখে পিছিয়ে আসার মানুষ বালাজীরাও নয়। আপনি জানেন, গোটা চম্বল-এলাকায় লোকে আমাকে 'সর্দারজী' ডাকে!

লোকটা হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু হঠাৎ খুলে গেল পিছনের দরজাটা। ভারী পর্দা সরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ—মহারাজের দেহরক্ষীদলের প্রধান। আভূমিনত অভিবাদন করে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন, মহারাজ! দেওয়ানজী এসেছেন। আপনার সাক্ষাৎ চাইছেন।

ভ্রূকুঞ্চন হল তুকাজি রাওয়ের। বাওলা-মার্ডার-কেসের ব্যাপারে মহারাজ আর মহামন্ত্রীর নানান বিষয়ে মতভেদ হয়েছিল। ইদানীং দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলেন। গত তিন মাস—অর্থাৎ সফি আহ্‌মেদদের ফাঁসির পর—রাজা-মন্ত্রীতে সামনাসামনি দেখাই হয়নি। মহারাজ বিরক্ত হয়ে বলেন, দেওয়ানজীকে বলে দাও যে, আমার তবিয়ৎ আজ ঠিক নেই, কাল সকালে দেখা করতে।

ক্যাপ্টেন 'যো হুকুম' বলবার অবকাশ পেল না, কারণ তার পূর্বেই ভেলভেটের ভারি পর্দাটা সরিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ দেওয়ানজী। বালাজীরাও নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করল। মহামন্ত্রী বললেন, তুমি আজ ফিরে যাও, বালাজীরাও। শুনলে না, মহারাজের মেজাজ সরিফ নেই? কাল সকালে এসে দেখা কর।

এবার বালাজী অভিবাদন করে বললে, যো হুকুম, দেওয়ানজী।

লোকটা পালিয়ে বাঁচে। দেওয়ানজী এবার নর্মদাপ্রসাদের দিকে ফিরে বলেন, মহারাজের সঙ্গে আমার কিছু গোপন পরামর্শ আছে, নর্মদাপ্রসাদ। তুমিও বাইরে যাও। তবে কাছাকাছি থেকো। যেন ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।

নর্মদাপ্রসাদও অভিবাদন করে নিষ্ক্রান্ত হল।

দেওয়ানজী বসলেন না। দাঁড়িয়েই বললেন, ভেবেছিলাম বাওলা-সাহেবের হত্যা মামলার ফলাফল দেখে আপনি সংযত হবেন। সারা ভারতের সংবাদপত্রে এখন প্রতিদিন প্রথম পাতায় থাকে ইন্দোররাজের নাম। তাতেও আপনার চৈতন্য হল না, মহারাজ? আবার ঐ কুখ্যাত ডাকাতটাকে লাগিয়েছেন?

মহারাজ বললেন, আমি আপনাকে একটা কথা বলব, দেওয়ানজী? ইন্দোর রাজ্যের জন্য আপনি তো কম করেননি। আমার পিতাজীর জমানা থেকে। আপনি এবার অবসর নিন। কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার যেখানে চাইবেন আপনার জন্য একটা বাড়ি খরিদ করে দেব। মাস-মাস পেনশনও পেয়ে যাবেন। আপনার মাকে নিয়ে শেষ জীবনটা....

—আমার মাকে নিয়ে...? মানে?

—ঐ যে ইন্দোর থেকে যে-ভদ্রমহিলাটি প্রথম সন্তান হতে বাপের বাড়ি গেছিলেন, আর ইন্দোরে ফিরে আসেননি, তাঁকে আপনি 'মা' ডাকেন না? তাঁর কথাই বলছি!

দেওয়ানজী সহাস্যে বললেন, তবেই দেখুন মহারাজ! আপনার বেতনভুক গুপ্তচরেরা পর্যন্ত ইদানীং আর আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। আপনি খবর পাননি, ইন্দোরের মহারানী বর্তমানে এখানেই আছেন। এই প্রাসাদেই। তাঁর রানী-মঞ্জিলে!

মহারাজ সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

—কী? সে ইন্দোরে ফিরে এসেছে? কবে এসেছে? কার হুকুমে এসেছে?

দেওয়ানজী সহাস্যবদনে বলেন, এটা কী বলছেন, মহারাজ? মহারানী-মা তাঁর নিজের মহলে ফিরে আসবেন এজন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে কেন? তিনি এসেছেন পর্শুদিন। তা ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি থাক। আমি যে অত্যন্ত জরুরী কথাটা আলোচনা করতে এসেছি সেটাই আগে শুনুন....

—না!! আমার কাছে ঐটাই সব চেয়ে জরুরী কথা। কার হুকুমে সেই বদ্‌জাত মাগীটা....

—থামুন! শুনুন: স্যার আন্টনি অ্যাশ্‌লে এসেছেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা-কক্ষে

বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি এসেছেন আপনাকে একটি অত্যন্ত জরুরী এবং একান্ত গোপনীয় লেফাফা স্বহস্তে অর্পণ করতে। গভর্নর-জেনারেলের ব্যক্তিগত পত্র—প্রাইভেট অ্যান্ড কন্‌ফিডেনশিয়াল।

ফোলানো বেলুনে যেন ছুঁচ ফোটানো হল। চুপসে গেলেন হোলকার। নেশা ছুটে গেল তাঁর। স্যার অ্যান্টনি অ্যাশ্‌লে হচ্ছেন ইন্দোররাজ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট-এর রেসিডেন্ট এজেন্ট। 1818 খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় তদানীন্তন ইন্দোর রাজ্য ইংরেজের করদরাজ্যরূপে স্বীকৃত হয়। মান্দাসোর সন্ধির শর্ত অনুসারে শহরতলী মহৌতে একটি বিরাট প্রাসাদে শতাধিকবর্ষ ধরে বাস করছেন ঐ ইংরেজ-সরকারের প্রতিভূ: রেসিডেন্ট! সাতে-পাঁচে থাকেন না। আজ একশো বছর। না তিনি, না তাঁর পদাধিকারী পূর্বসূরীরা। পার্টিতে এসে মদ্যপান করেছেন, নেচেছেন, শিকারে গিয়ে বাঘ মেরেছেন, অথবা অপরের-মারা-বাঘের গায়ে ঠ্যাং তুলে আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা করেছেন। ব্যাস! চোরে-কামারে এছাড়া কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। সেই রেসিডেন্ট স্যার আশ্‌লে হঠাৎ ইন্দোর রাজপ্রাসাদে এমন বিনা-নিমন্ত্রণে সশরীরে? সে-কথাই জানতে চাইলেন মহারাজ: গভর্নর জেনারেল-এর চিঠি তো পিয়নের মাধ্যমে আসার কথা। হাতে-হাতে চিঠি বিলি করতে স্বয়ং স্যার অ্যাশ্‌লে কেন এসেছেন?

—নিশ্চয় তার কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

—চিঠিতে কী লেখা আছে তা আপনি জানেন না বলতে চান?

—আজ্ঞে না, মহারাজ, সে-কথা তো আমি বলিনি।

—তার মানে আপনি জানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। জানি।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ। চাপা গর্জন করে ওঠেন, কেমন করে? কীভাবে তা জানলেন আপনি? চিঠি তো আমার নামে? ব্যক্তিগত পত্র? সীলমোহর করা? আপনি কার হুকুমে তা খুলেছেন, সটাই বলুন আগে?

দেওয়ানজী বললেন, উত্তেজিত হবেন না, মহারাজ। বসুন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে। এখনি। এই মুহূর্তে। অহেতুক মাথা-গরম করবেন না। আমি আপনার বাবার বয়সী, আপনার পিতৃবন্ধু...

—আমি বসব কি দাঁড়াব, তা আমার খুশি! আপনি আমার বাবার বয়সী কি ঠাকুর্দার, সে কথা অবান্তর। আপনি কেন আমার বিনা অনুমতিতে আমার চিঠি খুলে পড়েছেন সেই কৈফিয়ৎটাই আগে দিন!

দেওয়ানজী ধীরস্বরে বললেন, বেশ। তাই শুনুন প্রথমে। আপনাকে লেখা বড়লাটের চিঠিখানি আমি দেখিনি। কিন্তু বড়লাট-বাহাদুর সেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠির একটি অনুলিপি রেসিডেন্ট স্যার অ্যাশ্‌লেকে পাঠিয়েছেন যথাবিহিত কার্য সম্পন্ন করার জন্য। স্যার আশ্‌লে আমাকে তাঁর অনুলিপি-পত্রটি দেখিয়েছেন—রাজ্যের শুভাশুভের কথা বিবেচনা করে—অহেতুক রক্তপাত এড়ানোর জন্য।

—রক্তপাত! কেন? কী এমন কথা লিখেছেন লর্ড রেডিং—?

—তবেই বুঝুন, মহারাজ! রাজ্যশাসনে আপনি কী পরিমাণে অমনোযোগী। সংবাদপত্র পর্যন্ত পড়ার সময় পান না। ভারতের গভর্নর জেনারেল আজ আর ফার্স্ট মার্কুইস্ অব লর্ড রেডিং নন! তিনি হোমে ফিরে গেছেন। এপ্রিলের ছয় তারিখে নয়াদিল্লিতে বড়লাট-বাহাদুর হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেছেন লর্ড আরউইন। চিঠির নিচে তাঁরই স্বাক্ষর আছে।

—চিঠির নিচে কার স্বাক্ষর তা আমি জানতে চাইনি দেওয়ানজী, চিঠির মোদ্দা কথাটা কী, তাই দয়া করে বলুন?

—বড়লাট-বাহাদুর আপনাকে দুটি বিকল্প পথের যে কোন একটি সিদ্ধান্তকে বেছে নেবার সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু তা নিতে হবে এখনি, এই মুহূর্তে। আপনার সিদ্ধান্ত এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে স্যার অ্যাশ্‌লে স্বয়ং এসেছেন।

এইবার রক্তশূন্য মনে হল তুকাজিরাও হোলকারের মুখখানা। ধীরে ধীরে বললেন, দুটি বিকল্প পথ! কী কী?

—বাওলা-হত্যা মামলার জের মেটেনি। সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্র এবং রাজন্যবর্গের সর্বোচ্চ সমিতি মনে করে যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের পশ্চাৎপটে ইন্দোর-মহারাজের নেপথ্য-নির্দেশ কাজ করেছিল। তিন-তিনটি লোক ফাঁসিতে ঝুলেছে— তবু নাকি সুবিচার হয়নি; কারণ বাওলা-হত্যার মূল উদ্দেশ্য একটি নারীহরণ—যার নিয়ামক আপনি। সে-মামলার মূল আসামী নাকি এখনো শাস্তি পায়নি!

—সুতরাং?

—ভাইসরয় আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, হয় এ বিষয়ে একটি 'এনকোয়্যারি কমিশনে'র সম্মুখীন হতে স্বীকৃত হোন, অথবা....

—অথবা?

—পত্রবাহক স্যার অ্যান্টনি অ্যাশ্‌লের হস্তে আপনার পদত্যাগপত্র অর্পণ করে গদিচ্যুত হন!

মিনিটখানেক আগুনঝরা দৃষ্টিতে দেওয়ালে টাঙানো একটা স্টাফ্‌ড-বাঘের মাথার দিকে তাকিয়ে রইলেন তুকাজিরাও হোলকার! বাঘের চোখ দুটো আসল নয়, কাচখণ্ড—কিন্তু জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কিন্তু বেচারি নিরুপায়! মুণ্ডুটুকু বাদে তার বাদবাকি বলিষ্ঠ দেহটা অন্তর্হিত! মুণ্ডুটা ডাইনে বাঁয়ে সঞ্চালিত হল। বাঘের নয়। তুকাজিরাও-এর। বললেন, গদি আমি ছাড়ব না। কিছুতেই নয়। করুক শালারা এন্‌কোয়ারি! কী প্রমাণ আছে ওদের হাতে? সেই বজ্জাৎ মাগীর একতরফা অভিযোগ? আমার হুকুমে তার সন্তানকে আঁতুড়ে হত্যা করা হয়েছে! বললেই হল?

দেওয়ানজী পুনরায় বললেন, আপনি শান্ত হন, মহারাজ! হঠকারিতা করবেন না! ভুলে যাবেন না—যে মুহূর্তে ওরা বুঝবে যে, অন্তিমে আপনি গদিচ্যুত হবেনই, সেই মুহূর্ত থেকে ওরা সব সত্যি কথা ফাঁস করে দেবে। কাকে কী পরিমাণ

ঘুষ দিয়েছেন, কাকে কী হুকুম দিয়েছেন। অন্তত পঞ্চাশজন সাক্ষী এনকোয়ারি কমিশনে এসে সাক্ষী দেবে আপনার বিরুদ্ধে!

—না, দেবে না। ওরা বেইমান নয়।

—তাহলে কেন আপনি জানতে পারেননি যে, মহারানী এবং ভবিষ্যৎ হোলকার প্রাসাদে উপস্থিত? দু-রাত্রি একদিন আগে?

—ভবিষ্যৎ হোলকার?

—রানী-মা তো একা ফিরে আসেননি! আর প্রমাণের কথা বলছেন, এই নিন প্রমাণ—এক নম্বর প্রমাণ....জেব থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে দেওয়ানজী টেবিলের উপর রাখলেন। শ্বেতাশ্বচিহ্নিত হুইস্কির বোতলটায় চাপা দিলেন।

—কী ওটা?

—ষোলখানা হাজার টাকার নোটের নম্বর। যে ষোলো হাজার টাকায় অ্যাডজুটেন্ট ফাঁসে বোম্বাইয়ের জেনারেল মোটর্স থেকে বাইশে ডিসেম্বর ম্যাক্সওয়েল গাড়িটা কিনেছিল!

—তাতে কী প্রমাণ হয়? ফাঁসে তো জেল খাটছে!

—কিন্তু যার টাকায় ঐ গাড়িটা কেনে সে তো জেল খাটছে না!

—মানে?

—ঐ ষোলখানি নম্বরী হাজার টাকার নোট বিশ তারিখে ফাঁসে পেয়েছিল চৌপট্টি-ব্রাঞ্চ, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক থেকে। একখানা বেয়ারার চেক ভাঙিয়ে। তার নিচে আপনার স্বাক্ষর।

তুকাজিরাওয়ের ভ্রূকুঞ্চন হল। দাঁতে-দাঁত চেপে বললেন, এত কথা আপনি জানলেন কী করে? নম্বরী-নোটের লিস্ট আপনার জেব-এ এল কেমন করে?

—যেহেতু আমি এ-রাজ্যের দেওয়ান, এ-রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—না! যেহেতু আপনি বেইমান! বিশ্বাসঘাতক! আমাকে গদিচ্যুত করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে তার মূল নিয়ামক আপনি! অস্বীকার করতে পারেন?

পুনরায় শান্তস্বরে দেওয়ানজী বললেন, হঠকারিতা করবেন না, মহারাজ! আমার পরামর্শ শুনুন। পদত্যাগপত্র আমি টাইপ করে নিয়ে এসেছি—আপনি তাতে স্বাক্ষর দিন...

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ছিলেখোলা ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠলেন মহারাজ। তরোয়ালটা খাপ থেকে টেনে বার করলেন মুহূর্তে। কাঁপতে কাঁপতে বললেন: বেইমান! এই মুহূর্তেই...

দেওয়ান শঙ্কররাও প্রৌঢ়, কিন্তু সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনিও সর্বদা হাতিয়ারবন্দ্। তিনিও একই খণ্ডমুহূর্তে আত্মরক্ষার্থে তরবারি নিষ্কাশিত করে হাঁক পাড়লেন: নর্মদাপ্রসাদ!

মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। ধ্বনিটা প্রস্তর-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসার আগেই দুলে উঠল ভেলভেটের পর্দাটা। হাতিয়ারবন্দ্ দুজনেই সেদিকে ফিরলেন।

সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ। তার হাতে উদ্যত পিস্তল।

তুকাজিরাও ধীরে ধীরে তরবারি কোষবদ্ধ করে তাঁর দেহরক্ষীকে বললেন, ঠিক হ্যয়, ক্যাপ্টেন! তুম্ যা সকতে হো।

একচুল নড়ল না ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ।

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে তুকাজিরাও বলেন, ক্যা হুয়া! শুনা নেহী? লীভ আস অ্যালোন।

ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ যেন প্রস্তরমূর্তি।

এবার দেওয়ানজী নিজ তরবারি কোষবদ্ধ করে ওর দিকে ফিরে বললেন, হাঁ, তুম্ যা সক্তে হো! লেকিন হোঁশিয়ার রহ্না।

ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ ফৌজী কায়দায় স্যালুট দিল। কাকে, তা বোঝা গেল না। অ্যাবাউট টার্ন করে, নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল তুকাজিরাও-এর। বললেন, এতক্ষণে বুঝলাম। আপনি উৎকোচে আমার দেহরক্ষীদের পর্যন্ত বশীভূত করেছেন। একটা সাত বছরের বাচ্চাকে গদীতে বসিয়ে এই সুযোগে বেনামে রাজা সাজবেন, এই তো?

এতক্ষণে উপবেশন করলেন দেওয়ানজী। বললেন, তুকাজিরাও! পিতার দেহান্তে তুমি যখন ইন্দোরের গদীতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলে, তখন তোমারও বয়স ছিল সাত। আমার ত্রিশ। আজ তোমার বয়স ত্রিশ, আমার চল্লিশ! সাত-বছরের বালককে গদীতে বসিয়ে রাজা-সাজার সুযোগ তো যৌবনেই পেয়েছিলাম, তুকাজিরাও। কিন্তু সে সুযোগ তো তখন আমি নিইনি। আর কেউ না জানুক, তুমি অন্তত তা জান! তোমাকে আমি মানুষ করতে পারিনি—এটাই আমার একমাত্র ব্যর্থতা! নাহলে তোমার বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম—তিনি স্বর্গ থেকে দেখছেন—আমি নিমকহারামী করিনি! এই বৃদ্ধ বয়সে আবার একই স্বপ্ন দেখছি এই আমি: একটি সাত-বছরের বালককে গদীতে বসিয়ে ইন্দোর-রাজ্যকে সমৃদ্ধতর করে তোলা! নাও সই কর...

টাইপ-করা পদত্যাগপত্রটা মেলে ধরেন টেবিলে।

তুকাজিরাও বলেন, বড়লাট-বাহাদুরের অরিজিনাল চিঠিখানা আমি এখনো দেখিনি, দেওয়ানজী!

—তা বটে! তাহলে স্যার অ্যাশ্‌লেকে এ-ঘরে ডাকি?

ইন্দোর-দিল্লী চার্টার্ড প্লেনে তৃতীয় দিনেই বড়লাট কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার সংবাদ ফিরে এল। তুকাজিরাও-এর একমাত্র নাবালক পুত্রকে ইন্দোরের মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় বড়লাট-বাহাদুর ইন্দোরের নতুন মহারাজ রূপে সাময়িক স্বীকৃতিও দিয়েছেন। আদেশে বলা হয়েছে পদচ্যুত তুকাজিরাও আদেশনামা

প্রাপ্তির চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ইন্দ্রের রাজ্যসীমার বাইরে চলে যাবেন এবং এক বৎসরের ভিতর এ রাজ্যে পদার্পণ করবেন না। তাঁর ভরণপোষণ ও ভাতার ব্যবস্থা নবনিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশক্রমে নতুন মহারাজ অনুমোদন করবেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদ যদি তুকাজিরাওকে ভরণপোষণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে তিনি যেন বড়লাট-বাহাদুরের কাছে সেই মর্মে দয়াভিক্ষা করে আবেদন করেন। তুকাজিরাওয়ের পূর্বকৃতি অনুসারে বড়লাট কিছু পেনশনের ব্যবস্থা সে-ক্ষেত্রে করতে পারেন। আদেশনামায় আরো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তুকাজিরাওয়ের সমস্ত ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট, পার্সোনাল ভল্ট বা রাজকোষে সঞ্চিত ব্যক্তিগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হল। সে সমস্তই মহীন হোলকারের সম্পত্তি। তুকাজিরাওয়ের কটিবন্ধ থেকে খুলে রাজ-তরবারিটি স্যার অ্যাশ্‌লে নিয়ে গেছেন। নতুন হোলকার-রাজার অভিষেকের দিনে বড়লাট-বাহাদুরের তরফে তিনি সেটি বালক-রাজার কটিবন্ধে স্বহস্তে বেঁধে দেবেন।

☆ ☆





এ তিনদিন রুদ্ধদ্বারকক্ষে ক্রমাগত মদ্যপান করে গেছেন ভূতপূর্ব মহারাজ। তৃতীয় দিন মদ্য-সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। নর্মদাপ্রসাদকে ডেকে কারণটা জানতে চাইলেন তুকাজিরাও।

নর্মদাপ্রসাদ তার প্রাক্তন মনিবকে অহেতুক স্যালুট করল। বলল, রানী-মা হুকুম দিয়েছেন, আপনাকে আর ওসব দেওয়া চলবে না।

—রানী-মা! অফ অল পার্সন্স! কেন?

—আপনার পদত্যাগপত্র হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড আরউইন অ্যাক্সেপ্ট করেছেন। আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইন্দোর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। রানী-মা বললেন, ও-সব খাওয়া বন্ধ না করলে আপনি তা পারবেন না। এবার তো সেলুনে যাচ্ছেন না—ফার্স্টক্লাসে!

—ও হ্যাঁ। সেলুন নয়। তা ফার্স্টক্লাস কেন? ঐ গান্ধীর মতো থার্ডক্লাস নয় কেন?

—তাও হতে পারে। আপনি যদি চান।

—ও! না, না থাক্। ক্রমে তো তাই নামতে হবে। আপাতত ফার্স্ট-ক্লাস টিকিটই কেটে দাও। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমি, নর্মদাপ্রসাদ?

—মাপ করবেন, তা আমি জানি না। তবে এখনি দেওয়ানজী আসছেন। তিনিই আপনাকে জানাবেন।

দেওয়ানজী সত্যিই এলেন, একটু পরে। বললেন, কোথায় যেতে চান বলুন? হরিদ্বার, কাশী অথবা প্রয়াগ...

—কেন? ভারতবর্ষে এত এত জায়গা থাকতে ঐ তিনটি জায়গায় কেন?

—আপনি আমাকে তিনটি তীর্থস্থানের একটি বেছে নিতে বলেছিলেন, মনে নেই? আপনাকে স্টেটের খরচে একটি বাসস্থান দেওয়া হবে—যেখানে আপনি থাকতে চান। ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান স্টেটের খরচে দেওয়া হবে। আপনার হাতখরচ হিসাবে মাসিক এক হাজার টাকা অনুমোদন করেছেন রানীমা! তবে একটি শর্তে।

—এক হাজার টাকা! মাত্র? তাও আবার শর্তসাপেক্ষে? কী শর্ত আরোপ করেছেন আপনাদের মহামহিম রানীমা?

—সেটা তিনি স্বয়ং আপনাকে এসে জানাবেন।

ঠিক তখনই নর্মদাপ্রসাদ ভেলভেটের পর্দাটা তুলে ধরল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন তুকাজিরাওয়ের ধর্মপত্নী!

প্রণাম করলেন না, নমস্কারও নয়। বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, ক্যাপ্টেন নর্মদাপ্রসাদ। তবে কাছাকাছিই থেক। না! আপনি যাবেন না, দেওয়ানজী!

আমি ওঁকে যা বলব তা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন নয়, ভূতপূর্ব-মহারাজের সঙ্গে রাজমাতার কথোপকথন। আপনার উপস্থিতিটা প্রয়োজন। আমি তো রাজনীতির কিছুই জানি না।

নর্মদাপ্রসাদ স্যালুট করে নিষ্ক্রান্ত হল কক্ষ থেকে।

তুকাজিরাও অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকেন রাজমাতাকে।

মধ্যযৌবনে রাণীমার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। লালপাড় একটি বেনারসী পরেছেন তিনি, জরোয়া পাড়। তেমনি ব্রোকেডের ব্লাউস। সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে নানান আভরণ। সীমন্তে সিন্দূর, কপালেও প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। মাথায় জড়োয়া মুকুট! বললেন, 'মহারাজা' আপনি আর নন, কিন্তু কী বলে সম্বোধন করব বুঝে উঠতে পারছি না। পুরানো অভ্যাসবশে শেষবারের মতো 'মহারাজ'ই বলি। শুনুন, দেওয়ানজী বলেছেন হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশীর মধ্যে যেকোন স্থানে—আমি ওটা সম্প্রসারিত করে জানাতে চাই, ভারতবর্ষের যেকোন শহরে—আপনার পছন্দমতো একটি দু-তিন-কামরার মোকাম ভাড়া করে আপনি থাকতে পারেন। মাসে-মাসে বাড়ি-ভাড়া রাজ-স্টেট থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। ভৃত্য-পাচক-দারোয়ানও স্টেট থেকে মাহিনা পাবে। হাতখরচের জন্য মাসিক হাজার টাকার পরিমাণটা আপনার কাছে কম মনে হয়েছে—কিন্তু আমরা মনে করি, মাসোয়ারার পরিমাণটা বৃদ্ধি করলে আপনার মদ্যপানের মাত্রাটা বৃদ্ধি পাবে শুধু। আমাদের তরফে একটিই শর্ত। যে-বাড়ির ভাড়া ইন্দোর রাজস্টেট থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে সেই বাড়িতে কোনও স্ত্রীলোক প্রবেশ করতে পারবে না! এ জন্যই আমাদের নিজস্ব দারোয়ান রাখা হচ্ছে, আপনার নিরাপত্তার জন্য নয়। কোনও স্ত্রীলোক ঐ বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়েছেন সংবাদ পাওয়ামাত্র আপানার মাসোয়ারা বন্ধ হয়ে যবে! বুঝেছেন?

তুকাজিরাও দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললেন, তোমার ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকতে চাই না আমি।

তৎক্ষণাৎ রাণীমা বলেন, খুবই আনন্দের কথা! কায়িক পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবেন তাহলে। এই তো পুরুষ মানুষের মতো কথা! বাঃ!

তুকাজি চাপা গর্জন করে ওঠেন: না, রাণী-মা! আমি আপনার দয়া প্রত্যাখ্যান করছি সেজন্য নয়। সহমরণপ্রথা রোধ হয়েছে, কিন্তু আমি আপনার গা-থেকে একটি একটি করে সব অলঙ্কার খুলে নেব। তোকে থান পরিয়ে ছাড়ব! বুঝেছিস্? আমি আত্মহত্যা করব!

দেওয়ানজী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে রাণীমা বলেন, সে সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করে রেখেছি আমি। শুনুন ভূতপূর্ব মহারাজ, আপনার মৃত্যুসংবাদ এখানে এসে পৌঁছনো মাত্র আমি ইন্দোরের জুম্মা মসজিদে গিয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা হব এবং উপযুক্ত একটি মুসলমান নওজোয়ানের পাণিগ্রহণ করব। রাজবাড়িতে বিয়ে হয়েছে আমার—যৌবনে যোগিনী সাজব কেন? আর কিছু বলবেন? ভাল কথা, মাসোয়ারাটা নিচ্ছেন, না নিচ্ছেন না? কী ঠিক হল?

তুকাজিরাও জবাব দিলেন না। আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ঐ মেয়েটির দিকে—একদিন যার দেহে নির্দয়ভাবে রক্ত ঝরিয়েছেন।

সেই মেয়েটিই বললে, তাহলে আরও একটা কথা বলি, মহারাজ। আপনি যে ইন্দোর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এ সংবাদটা প্রজারা জেনে গেছে। এতদিন যাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন তারা হয়তো আপনার গাড়ি ঘিরে কিছু নাচ-গান-আনন্দ করতে চাইবে, তাতে বাধা দেবেন না। আর স্টেশনে জনাচারেক মিলিটারী অফিসার হয়তো ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। ওদের ভয় পাবেন না। ওরা কথা দিয়েছে, আপনাকে মারধোর বা হেনস্তা করবে না আদৌ। শুধু প্লাস্টার-অফ-প্যারিসে আপনার নাকের একটা ছাপ তুলে নেবে। তা দিয়ে ওরা কিছু পেপার-ওয়েট বানাবে। যে মেয়েটির নাক-কাটার জন্য একদিন আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন সেই মেয়েটিকেও ওরা একটা পেপার-ওয়েট উপহার দিতে চায়। এ নিয়েও রাগারাগি করবেন না। ওরা আপনার অপরাধে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। এ ট্রফিটা ওই মেয়েটি দাবী করতেই পারে। পারে না?

☆ ☆

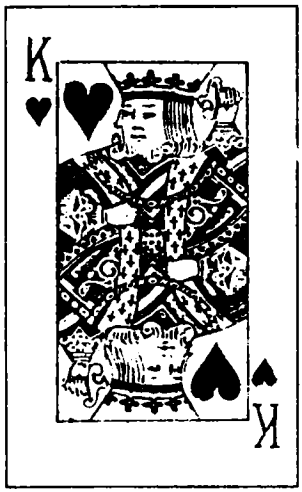
স্বীকার্য, শেষের দিকের ঘটনা কথাশিল্পীর কল্পনামাত্র। ইতিহাসে এসব কথা লেখা নেই। অর্থাৎ উন্নাসিক রাজার নাকের প্লাস্টার-কাস্ট বানানোর কথা। কিন্তু তুকাজিরাও হোলকারকে ভারতবর্ষের শাসকের নির্দেশে গদী ছেড়ে নেমে আসতে হয়েছিল এবং তাঁর সাত বছর বয়সের পুত্র নবীন 'হোলকার' হয়েছিলেন, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

পড়তে পড়তে আপনাদের কী মনে হল জানি না, লিখতে লিখতে আমার তো মনে হচ্ছিল, 'রোজ কত কি ঘটে যাহা-তাহা/এমন কেন সত্যি হয় না, আহা!'—মানে, অনেক-অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার গ্লানি অপনোদনের পরে আজকের দিনে যেসব দুঃশাসক উন্নাসিক ভঙ্গিতে বলে: 'নবীন কায় নায়, এমনটা তো হয়েই থাকে!' তাদের নাকের প্লাস্টার-কাস্ট বানিয়ে আমরা কবে, কী করে, টেবিলে সাজিয়ে রাখব?

'তামাম ন-শুদ'



এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা : পাতিয়ালা



এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা : এমনটা তো হয়েই থাকে! কেমনটা? যেমনটা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে পান।

আপনারা ভাবেন—বলেনও—কই এমনটা তো আগে কখনো হতো না। কাগজ খুললেই দেখতে পাই খুন-জখম-রাহাজানি। পুলিস নির্বিকার। ধরুন নারী-নির্যাতনের কথাই। ৪মে, ১৯৯২-র আনন্দবাজারে দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টার শিরোনাম ছিল : "পশ্চিমবঙ্গে নারী-নির্যাতন।

"ত্রিপুরায় মহিলাদের উপর অত্যাচার বা নিপীড়ন সব চাইতে বেশি হয়, সি.পি.এম. সাংসদ সুভাষিণী আলির এই অভিযোগের উত্তরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে পাল্টা অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ ইহাই : পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় একজন মহিলা ধর্ষিতা হইতেছেন। তদুত্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় এই রাজ্যে নারী-নিগ্রহের ব্যাপারে কী বলিবেন, তাহা এখনও অবধি জানা নাই। সি.পি.এম. সাংসদ এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা সুভাষিণী মহোদয়া নিজের ঘরের খবর না লইয়াই পরের ঘরের কাচের জানালায় ঢিলটি না ছুঁড়িলেই ভাল করিতেন। তাহাতে জ্যোতিবাবু মহাশয়, তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বটেন, অন্তত বিব্রত হইবার হাত হইতে বাঁচিতেন। পশ্চিমবঙ্গে নারী-নিগ্রহ বিষয়টি যত চাপিয়া যাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের সি.পি.এম. সদস্যদের পক্ষে ততই ভাল।"

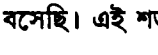
সেকথা সত্য। গত চার বছরে এই রাজ্যে নারী-নিগ্রহ বৃদ্ধির হার ৫৮.৫৭%। গত বৎসর—অর্থাৎ ১৯৯১ সালে—নারী-ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেছে ৪৪২টি। দিনে একটিরও বেশি। এটা অবশ্য থানায় ডায়েরি করা অভিযোগের হিসাব। যে-সব হতভাগিনী বা তাদের অভিভাবক তা করেনি তা আমাদের হিসাবের বাইরে। একই সময়কালে বধূহত্যা হয়েছে ২১৭টি, নারী আত্মহত্যা ৭৬৪টি। এ তথ্যের সূত্র পুলিসের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে দাখিল করা পশ্চিমবঙ্গ পুলিস অ্যাসোসিয়েশানের বার্ষিক রিপোর্ট।

সবচেয়ে লজ্জার কথা : আমরা এটাকে স্বাভাবিক বলে ধীরে ধীরে মেনে নিচ্ছি। নৃশংসতম নারী-নির্যাতনের সংবাদে আমরা যখন মর্মাহত তখন বলা হচ্ছে : "এমনটা তো হয়েই থাকে।"

এক হিসাবে কথাটা মিথ্যা নয়—কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা?

পাতিয়ালা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সর্বত্র—মিশরে, নসসে, রোমে এবং পাঠান-মুঘল যুগের ভারতবর্ষে অকথ্য নারী-নির্যাতন হয়েছে। তেমনিই একটি দুর্ভাগার নির্যাতনের কাহিনী আজ আপনাদের শোনাতে বসেছি। এই শতাব্দীর প্রথম পাদের সত্য ঘটনা।



সাধারণ ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো ফারাক ছিল না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আর পরে। জীবন চলত টিকিয়ে টিকিয়ে, গো-গাড়ির চাকার মতো। গড়িয়ে-গড়িয়ে, ককিয়ে-ককিয়ে। কী যুদ্ধের আগে, কী পরে। বালি-ধুধু মরাগাঙের ওপারের কিনার ঘেঁষে নির্ভয়ে ভেসে বেড়াত চখাচখী। শশার ক্ষেতে চরণপাত করত হলুদবরণ পেরজাপতি, শঙ্খচিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশে ভেসে চলত তুলো-পেঁজা শাদা মেঘ। আর মেঠো আলপথে দুল্‌কি-চালে চলত বাবুবাড়ির পাল্‌কি: হুম্ ব্রো! হুম্ ব্রো! এই শতাব্দীর সেই প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে। সে-আমলে খড়ো-চাল মুদির দোকানে ঐ তৈলতৃষিত গো-গাড়ির চাকার সঙ্গে ঐকতান তুলে নিকেলের চশমা-চোখে প্রৌঢ় দোকানির অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতেন আবহমানকালের বিরহী শ্রীরামচন্দ্র, দণ্ডকবনের একান্তে—সীতার বিরহে।

ভারতবর্ষের সেই 'ট্র্যাডিশন' সমান তালে চলত।

অবশ্য কিছু মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান—তারা সকলেই শহরের 'পড়িলিখি' বাবুমশাই—ভাগ্য ফিরিয়েছিল যুদ্ধের ডামাডোলে। দালালের ভূমিকায় নানান মালপত্র সরবরাহ করে, অথবা মানুষ, আড়কাঠি হিসাবে।

তেমনি মুঠিভর কিছু বদনসিবের সংসারে খোয়া গেছিল পরিবারের উঠতি জোয়ানটা—যুদ্ধান্তে তারা আর ফিরে আসেনি। তারা জাঠ, বেলুচ, গুর্খা, মারাঠী কিংবা শিখ। বাঙালী কদাচিৎ।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্য ধরনের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তাঁদের অবস্থাটা ছিল তেঠ্যাঙা নড়বড়ে টেবিলের মতো। ঠেকো সরে গেলেই হুড়মুড়িয়ে মুখ-থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সেটাই ছিল প্রাক্‌যুদ্ধ জমানার রীতি, সেই লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে। রাতারাতি তক্‌দিরের হাতফিরি করত আমীর আর ফকির। রামের বদলে শ্যাম, মীরজাফরের বদলে মীরকাশেমকে গদিতে বসাতে পারলে পকেট ভারী হতো বিদেশী প্রভুদের।

তারপর কোন্ সাগরপারে বুঝি খুন হলো এক অচিন দেশের যুবরাজ। না সেই ফৌত হওয়া মানুষটা, না তার খুনী—কেউই ইংরেজ বা জার্মান নয়। তবু ধুন্ধুমার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সারা পৃথিবী জুড়ে।

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বয়ং সূর্যদেবের পর্যন্ত অস্ত যাবার হিম্মৎ ছিল না, সেই সাম্রাজ্যের সাহেব-প্রভুরা ডেকে পাঠালেন দেশীয় রাজা-মহারাজা-নবাবদের। যুদ্ধে সহযোগিতার প্রার্থনা করলেন, সাহায্য

চাইলেন। কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন রাজন্যবর্গ। ফ্রিজাবরোধের-বাইরে-বেরিয়ে-আসা বিগলিততনু আইস্ক্রিমের মতো। জানকবুল সহযোগিতার অঙ্গীকার করলেন সবাই, কুরান-গ্রন্থসাহেব-গীতা স্পর্শ ক'রে। চৌদ্দ-আঠারো—পুরো চার বছর—জানকবুল সাহায্য করলেনও। অর্থাৎ বিদেশী মানুষকে মারবার জন্য টাকা আর স্বদেশী মানুষকে মরবার জন্য নওজোয়ান জুগিয়ে। যুদ্ধান্তে তাঁদের ভাগ্য ফিরে গেল। কম-বেশী সবারই। ব্রিটিশ প্রভুরা যে-সব তাসের দেশের রাজা-মহারাজা-নবাবদের পদানত ভৃত্যের চেয়ে বেশি সম্মান দিতেন না, তাঁদেরই ডেকে এনে পাশের চেয়ারে বসতে দিলেন। ওঁরা ধন্য হয়ে গেলেন। ওঁদের জীবনযাত্রায় যে উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতা তার লাগামে ঢিলা পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কোনো নবাবজাদা বা মহারাজা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারতেন না যে, কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবার প্রয়োজনে ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে ডাক আসতে পারে। এমনকি রাজন্যবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সেজন্য—(কী কাণ্ড!)—জেনিভা পর্যন্ত উড়ে যেতে হতে পারে। যাঁদের সঙ্গে বছরে একবার করমর্দন করার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়ে যেত রাজা-রাজড়ার দল, এখন সেই তাঁদের কাছ থেকে দিল্লীতে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আসতে থাকে। ভারতের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যনিয়ন্ত্রক কোনো নতুন বিল এলে—রাজন্যবর্গের মতামত না নিয়ে হিজ এক্‌জল্টেড্ এক্সেলেন্সি মহামহিম বড়লাট-বাহাদুর তাকে অ্যাক্টে পরিণত হতে দিতেন না!

ভারতের ইতিহাসে ঐ তিন-চার দশক, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান থেকে সর্দার প্যাটেলের ডাণ্ডায়-ঠাণ্ডা-হওয়া-তক্, ভারতীয় রাজা-মহারাজা-নবাবেরা ছিলেন সুখের সপ্তম স্বর্গে। যে স্বর্গসুখের স্বপ্নও দেখতে পারেননি প্রাগ্বর্তী একাধিক সহস্রাব্দীতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ। তৈমুর-নাদিরশাহ্‌র মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে লাট-বাহাদুর এখন সৈন্য পাঠিয়ে ডাণ্ডাপেটা করবেন; পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশা ট্যা-ফুঁ করলে লাট-বাহাদুর তাকে ঠাণ্ডা করবেন! আঃ! কী নিশ্চিন্ত আরাম! বৎসরান্তে নির্দিষ্ট রাজস্ব, আর যুদ্ধ বাধলে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করলেই রাজাবাদশাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শাসক প্রভুরা হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে কোনো কোনো রাজা-বাদশা লাগাম-ছেঁড়া উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মহামহিম বড়লাট-বাহাদুর যেন শতপুত্রবতী গান্ধারীর জন্মান্ধ স্বামী। কাশ্মীর থেকে ত্রিবাঙ্কুর, আহমেদাবাদ থেকে ব্রহ্মদেশব্যাপী দুর্যোধন-দুঃশাসন কীভাবে রাজ্য শোষণ করছে তা তিনি দেখেও দেখতে পেতেন না।

সংবাদপত্রে বিবৃতি দেবার সময় অবশ্য তাঁর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি অন্য জাতের :

> I cannot consent to employ British troops to protect any one in the course of wrong-doing. Misrule on the part of a Prince or Nawab, which is upheld by the British Power, is misrule for the responsibility of which the British Govt. becomes in a measure involved. It becomes, therefore, not

only the right but the paramount duty of the British Govt. to see that the Administrator of a State in such a condition is removed and the gross abuses are removed as well.

পড়লে মনে হয়, বক্তৃতাটা দিচ্ছেন ইদানীং কালের কোনো মুখ্যমন্ত্রী রিগিং-যুদ্ধান্তে ঠিক নির্বাচন জেতার পর—বিধানসভায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে! 'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট' শব্দটার পরিবর্তে 'জনগণ-নির্বাচিত আমার সরকার' কথাগুলি বসিয়ে দিন, আর 'রাজন্যবর্গের' বদলে 'ব্যুরোক্র্যাসি'—অমনি অস্থিতে-অস্থিতে প্রণিধান করবেন ওয়াজিদ আলি-সাহেবের সেই মর্মান্তিক পংক্তিটার শাশ্বত সত্য:

"ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে।"

ব্যতিক্রম কি নেই? আছে! গত বছরই তো দেখেছি যতীন চক্রবর্তীমশাইকে। পদত্যাগ করার পর সাইকেল রিক্‌শায় চেপে ইলেকশন ক্যাম্পেন করতে। আগামী দিনে হয়তো দেখব সুইটজারল্যান্ড প্রত্যাগত মাধবরাও সোলাঙ্কিকে এক্কায় চেপে আহ্‌মেদাবাদে নির্বাচন লড়তে।

সে আমলেও ঐ জাতের ব্যতিক্রম হতো। অ্যাডভোকেট কে. এল. গওবা প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতের লাহোরে বসে লিখেছিলেন:

All would probably go well but for certain mechanical breakdowns. If only the Viceroy would put cotton wool in his ears; if only intrigues would come off as planned, if only money could ensure silence, if only documents would not wander in the post....! But £ 1,50,000 could not keep Mr. "A's" identity sacrosanct, a woman's scream shook the Bharatpur gaddi, Gaikwar of Baroda lost his throne, and the Maharaja of Indore had to abdicate because a mere nautch girl, Mumtaz, survived to tell a tale. (Famous Trials for Love & Murder, Lahore, 1946).

[মাঝে মাঝে 'যান্ত্রিক বিপর্যয়' না হলে সব কিছুই হয়তো বিনা বাধায় পাড়ি দেওয়া যেত। যদি বড়লাট-বাহাদুর দয়া করে কর্ণমূলে কিছু কার্পাস-খণ্ড স্থাপনের অসুবিধাটা মেনে নিতেন, দরবারী ষড়যন্ত্রগুলো যদি পরিকল্পনা-মোতাবেক ঘটানো যেত, অর্থ যদি সবরকম কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা রাখত আর নথীপত্রগুলো ডাকযোগে যাতায়াত করতে না পারত তাহলে.:...! কিন্তু সব সুখ কি হয়রে দাদা? দেড় লক্ষ পাউন্ড খরচ করেও মহামান্য 'A-সাহেব' তাঁর পবিত্র সু-নামটা গোপন রাখতে পারলেন না, একটি হতভাগিনীর কণ্ঠ-নিঃসৃত শীৎকার ভরতপুর গদীকে টলিয়ে দিল। বরোদার গায়কোয়াড় গদিচ্যুত হলেন, আর ইন্দোরের মহারাজাকে তাঁর সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসতে হলো—কেন? একটি সামান্য নর্তকী, মমতাজ বেগম, দুর্ঘটনা এড়িয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে রইল—যেন শুধু সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়াবার জন্য।]

স্বীকার্য সব কয়টি ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের পারম্পর্য প্রণিধান করতে পারিনি।

কী করব বলুন? আইন-আদালত কোর্ট-কাছারির ত্রিসীমানায় যাবার সৌভাগ্য তথা দুর্ভাগ্য হয়নি। তবে স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় কিছু ল-জার্নাল ঠুকরে দেখেছি। স্তম্ভিত হয়ে গেছি রাজা-মহারাজা-নবাব বাহাদুরদের অপকীর্তির বহর দেখে। স্বাধীন ভারতের মহামন্ত্রী, আধামন্ত্রী, সওয়া-মন্ত্রীরা যেসব অপকর্ম নির্দ্বিধায় আজকাল করে থাকেন ওঁরাও তাই-তাই করতেন। এখনকার মতো সে আমলেও কাঁদত বিচারের বাণী, নীরবে, নিভৃতে। সময় ও সুযোগ পেলে এবং পুনরুক্তিদোষের ক্লান্তিতে আপনারা বিরক্ত না হলে আপনাদের শোনাব ভরতপুর দরবারের এক নারীর কাহিনী, যেমন শুনিয়েছি ইন্দোর মহারাজার রাজাবরোধে মমতাজ-বেগমের কথা।

আজ আপাতত শোনাতে বসেছি এক পুরুষসিংহের কিস্‌সা। যাঁর ক্ষেত্রে সম্রাটপ্রতিভূ ন্যায়াধীশ বড়লাট বাহাদুর তাঁর দুই কর্ণমূলে কার্পাসখণ্ড প্রদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সারা ভারতের সংবাদপত্র যখন সেই নারীর আর্তনাদের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল তখন রাজাধিরাজ হাসিমুখে বলেছিলেন: *"এস্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা"*—এমনটা তো হয়েই থাকে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, জাস্টিস পাঠক! যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য-বৈ মিথ্যা বলিব না, এবং কথাসাহিত্যের খাতিরে কথোপকথন বা ঘটনা-পরম্পরা কল্পনা করিতে বাধ্য হইলেও আদালতনথির লক্ষ্মণ-গণ্ডির সীমারেখা অতিক্রম করিব না।

☆ ☆ ☆



এই সত্য কাহিনীর নায়ক:



শ্রীল শ্রীযুক্ত মেজর জেনারেল হিজ হাইনেস্ মহারাজা স্যার ভূপিন্দর সিংহ বাহাদুর অব পাতিয়ালা, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোনও রণাঙ্গণে যদিচ তিনি পদার্পণমাত্র করেননি, তবু যুদ্ধজয়ী মিত্রপক্ষের সরিকবৃন্দ যুদ্ধান্তে তাঁকে নানান খেতাবে বিভূষিত করেছিলেন। ইম্পিরিয়াল ওয়্যার-ক্যাবিনেটের এই অবৈতনিক সদস্যকে মিত্রপক্ষের সহযোগী শাসকবৃন্দ যৌথভাবে সম্মানিত করেছিলেন, 'গ্র্যান্ড কর্ডনস্ অব দ্য অর্ডার অব লেঅপোল্ড, দ্য ক্রাউন অব ইতালী, দ্য অর্ডার অব দ্য নাইল, দ্য ক্রাউন অব রুমানিয়া, গ্রান্ড ক্রসেস্ অব দ্য অর্ডার অব সেন্ট সেভিয়ার অব গ্রীস' ইত্যাদি প্রভৃতি উপাধিতে।

আপনারা হয়তো এসব খেতাবের নামও শোনেননি! তাই না? হক্কথা বলব: আম্মো শুনিনি। অন্তত বেসরকারী মহামানবদের ক্ষেত্রে ফরাসী সরকার সর্বোচ্চ যে খেতাবটি প্রদান করে থাকেন, যা লাভ করেছিলেন গত শতাব্দীতে অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ তাঁর ভাস্কর্যের জন্য এবং বর্তমান শতাব্দীতে সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য—সেটাও অর্পণ করা হয়েছিল ঐ মহারাজ ভূপিন্দর সিংহ বাহাদুরকে—যুদ্ধে অর্থ ও মরনেবালা সৈন্য সরবরাহ করার অপরিসীম পারদর্শিতায়: ''লীজন অনার অব ফ্রান্স''।

আমাদের কাহিনীর কালে মহারাজ বত্রিশ বছরের যুবাপুরুষ। শালপ্রাংশু মহাভুজ বললে যথেষ্ট হয় না—তিনি দানবাকৃতি। উষ্ণীষ ছাড়াই তাঁর উচ্চতা ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। কাশ্মীররাজ ব্যতিরেকে উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্যই বৃহত্তম এবং তাঁর রাজস্বের পরিমাণ পাঞ্জাবের আর পাঁচজন রাজার সম্মিলিত রাজস্বকে ছাপিয়ে যায়। বেগমমহলের বাইরে পাঁচটি জিনিসে তাঁর আসক্তি—

প্রথমত, 'রোলস্ রয়েজ' গাড়ি। সর্বোচ্চ সংখ্যক রোলস্ রয়েজ গাড়ির মালিক ছিলেন তিনি। শোনা যায়, সে আমলে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। তাঁর একজন বিশেষ কর্মচারী হিসাব রাখত আমেরিকার কোনো ধনকুবের নতুন 'আর.-আর.' কিনছেন কিনা।

দ্বিতীয়ত, কুলীন সারমেয় সম্ভার। ভারতের তো বটেই, বিদেশের 'ডগ-শো' থেকে তাঁর সারমেয় কুলতিলকেরা লোভনীয় পুরস্কার নিয়ে এসেছে।

তৃতীয়ত, ঘোড়া। মহারাজার স্টেব্‌ল্ ছিল দর্শনীয়। ঘোড়দৌড়ের রেসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অংশগ্রহণ করত পাতিয়ালার উচ্চৈঃশ্রবা—কলকাতা, বোম্বাই, সিমলা, দার্জিলিঙ।

চতুর্থত, শিকার। প্রতিবৎসরই শীতকালে পাতিয়ালা, হিমাচল প্রদেশ এমনকি মধ্যপ্রদেশ অরণ্যেও সপার্ষদ হানা দিতেন হিজ হাইনেস্। তাঁর প্রাসাদে স্টাফড্ বন্যজন্তুর মুণ্ডগুলিই সাক্ষী দেবে কত বড় শিকারী ছিলেন তিনি।

পঞ্চমত, পাতিয়ালার ক্রিকেট টীমে মহারাজা নাকি ভাল ব্যাটস্ম্যান ছিলেন, ফার্স্ট-স্লিপে ফিল্ডিং করতেন। সেসব আমার কাছে শোনা কথা; কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ অব পাতিয়ালার অনবদ্য ব্যাটিং আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইডেন গার্ডেন্সএ। জ্যাক রাইডারের টীমের বিরুদ্ধে লালা অমরনাথ ছাড়া সেবার আর কেউই খেলতে পারেননি। একমাত্র যুবরাজ অব পাতিয়ালা হাত খুলে একের পর এক কভার ড্রাইভ মেরেছিলেন। সেটা ত্রিশের দশক। আমি তখন হাফপ্যান্টধারী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে যখন দেশবিদেশ থেকে নানান খেতাব আসছে বন্যাস্রোতের মতো আর ঘরে ঘরে ঘরে-না-ফেরা সৈনিকের মা-বোন-সীমন্তিনীরা দাঁতে দাঁত দিয়ে চাপা কান্নাকে রুখছে, সেই উনিশ শ' আঠারোতে মহারাজ ভূপেন্দ্র সিংহ বাহাদুর পাঁচ বৈধ সন্তানের জনক, তিন বিবির মরদ। অবৈধ শয্যাসঙ্গিনী এবং অবৈধ সন্তানের হিসাবটা—মুঝে মাফ কিয়া যায়—ঠিক জানা নেই।

প্রথম বিবাহ করেছিলেন এগারো বছরের বালিকাকে। সেই 'বড়ি-বেগমের' সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কৈশোর উত্তরণের পূর্বেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর মহারাজ বিবাহ করেন হোম সেক্রেটারি গুর্নাম সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে। তাঁর পিতৃদত্ত নামের হদিস পাইনি। তবে পাতিয়ালার রাজদরবারের নিভৃতে এবং পরবর্তীকালে আদালতে প্রকাশ্যে যে নামটা উচ্চারিত হতে দেখেছি সেটা সাংক্রর মহারানী। তাঁর ভাগ্য ভাল। কারণ রাজমাতা প্রথম পুত্রবধূর দুর্ভাগ্য থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সিংহবিক্রম পুত্রের কাছ থেকে এই দ্বিতীয় পুত্রবধূকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছিলেন যতদিন না সাংক্রর মহারানী যৌবনপ্রাপ্তা হন।

মহারাজা আপত্তি করেননি। তাঁকে শয্যাসঙ্গ দেবার বিকল্প ব্যবস্থা প্রায় কিশোর বয়স থেকেই সুবন্দোবস্ত। সাংক্রর মহারানী পাতিয়ালার পাটরানী—এঁরই প্রথম সন্তান, যুবরাজ অব পাতিয়ালাকে আমি ব্যাটিং করতে দেখেছিলাম ইডেনে, জ্যাক রাইডারের টীমের বিরুদ্ধে। ত্রিশের দশকে।

আমাদের কাহিনীর শুরু হচ্ছে উনিশ শ' বারো সালে।

আপনারা যাতে সময়ের ধরতাইটা ধরতে পারেন তাই সমকালীন কিছু ঘটনার উল্লেখ করা গেল। পূর্ব বৎসর কলকাতায় প্রথম ভারতীয় টীম মোহনবাগান আই. এফ. এ. শীল্ড পায়। আর ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বারো সালেই বর্ণাঢ্য দিল্লী দরবারে যোগ দিতে যাবার পথে শোভাযাত্রায় হস্তিপৃষ্ঠে-আসীন বড়লাট বাহাদুর কে এক রাসবিহারী বোসের বোমার আঘাতে চিৎপট্টাং হন!

অসুস্থ বড়লাট বাহাদুরকে সিমলার অবকাশ প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়।

তাই হিজ হাইনেস্ সপার্ষদ সিমলায় তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। লাট বাহাদুরের অনতিদূরে থাকবার সদিচ্ছায়। মহারাজার অনুপস্থিতির সুযোগে সাংরুর মহারানী তাঁর ভাই আর ভাইবৌকে পাতিয়ালা প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। ভাই নিজেব নয়, খুড়তুতো। বয়সে মহারানীর চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোট। একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে পিঠোপিঠি ভাইবোনের বাল্যকাল কেটেছে। লাল সিং-এর বাবা প্রীতম সিং যে গুর্নামের বৈমাত্রেয় ভাই তা পাড়ার লোক জানত না—এমনই ছিল দু'ভাইয়ের ভালবাসা। তারপর প্রীতম আর তার স্ত্রী স্বর্গে গেল। লাল সিং গুর্নামের পরিবারেই মানুষ হতে থাকে। সেই লাল সিং-এর বিবাহ স্থির হওয়ায় গুর্নাম—ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক হিসাবে—যথারীতি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কন্যা-জামাতাকে। যদিও জানতেন যে, না রাজা, না রানী—কেউই বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখতে আসবেন না। সেটা রীতি নয়। বস্তুত বিবাহের পর সাংরুর মহারানী পিতৃগৃহে আদৌ পদার্পণ করেননি। লাল সিং-এর বিবাহ-আসরে রাজদূত হিসাবে রাজবয়স্য বটুকেন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিল রৌপ্যথালিকায় মাঙ্গলিক নিয়ে—মহারাজের আশীর্বাদী: ধান-দুর্বা-হরিদ্রা-নারিকেল এবং নববধূর জন্য একটি মহার্ঘ্য বেনারসী। উপায় কী? লাল সিং-এর পারিবারিক খানদান অবশ্য অনস্বীকার্য—হোম সেক্রেটারি গুর্নাম সিং তার চাচা, সাংরুর মহারানী তার বড়িবহিন, কিন্তু অর্থকৌলীন্যে সে যে কীটাণুকীট! জিন্দ্ আর্মির থার্ড ব্যাটেলিয়ানের বিউগ্‌ল্-বাদক। প্রহরে প্রহরে ঢা ঢা করে তাকে বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে প্রহর ঘোষণা করতে হয়। পদমর্যাদায় সে ছিল নিম্নতম সৈনিকমাত্র। যামঘোষী শৃগালের সমপর্যায়ে।

রাজাসাহেব যদি পাতিয়ালাতেই থাকতেন তাহলে সাংরুর মহারানী ভাই বা ভাইবৌকে আদৌ নিমন্ত্রণ করতেন না। কারণ তাহলে রাজবাড়ির প্রতিটি লোকের জীবনযাত্রা থাকত রাজাসাহেবের কর্মচক্রের সঙ্গে বাঁধা। রাজাসাহেব চলেন ঘড়ির কাঁটার নির্দেশে। গোটা রাজবাড়িকে ছুটতে হয় তাঁর কর্মচক্রের সঙ্গে ঐকতান রচনা করে।

রাজাসাহেব শয্যাত্যাগ করেন সূর্যদেবের গাত্রোত্থানের ঘণ্টাখানেক আগে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে মর্মর সোপান-শোভিত পোর্টিকোতে এসে যখন দাঁড়ান তখন আস্তাবলের হেড-সহিস খোদাবক্সের সাক্ষাৎ পান। লোকটা আভূমি নত হয়ে সেলাম করে। ধরিয়ে দেয় রাজাসাহেবের হাতে তাঁর প্রিয় আরবীয় অশ্বিনীর লাগাম। ধবধবে শাদা। প্রায় আধঘণ্টা ঘোড়দৌড়ের কসরৎ। প্রাসাদ-অভ্যন্তরেই, উদ্যানবেষ্টিত পথে। ফিরে আসেন সূর্যোদয় মুহূর্তে। আধঘণ্টা গ্যালপিং গতিতে দৌড় করে আরবীয় অশ্বিনীর গা তখন পিচ্ছিল। রাজাসাহেবও ঘর্মস্নাত।

এবার ওঁর খাশকামরা-সংলগ্ন স্নানাগারে 'টার্কিশ্ বাথ'। একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সুন্দরী তার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্তা। স্নানান্তে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে রাজপরিবারের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত গুরুদ্বারে উপস্থিত হন। বৃদ্ধ পুরোহিত গ্রন্থসাহেব থেকে ক্রমাগত পাঠ করে চলেন ভোর থেকে। রাজাসাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাবে

তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনও পরিবর্তন হয় না। সেটা নিয়মবহির্ভূত। রাজাসাহেব ঘড়ি ধরে পনের মিনিট শ্রোতৃবৃন্দের একান্তে পাঠশ্রবণ করেন। এখানে তাঁর কোনো গদি নেই, নির্দিষ্ট আসন নেই। তবে কোন্ কিনারে তিনি সচরাচর এসে বসেন সেটা সবাই জানে। তাই অলিখিত আইনে সেদিকটা ফাঁকা পড়ে থাকে। সে যাই হোক, ঘড়ির বড়-কাঁটাকে সমকোণ রচনা করার সুযোগ দেবার পর রাজাসাহেব প্রণামান্তে আশীর্বাদী নিয়ে ফিরে আসেন নিজের খাশমহলে!

এই সময় নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে রাজবয়স্য বটুকেন্দ্রনাথ দত্ত—লোকটা বাঙালী, কায়স্থ, তিনপুরুষ পাতিয়ালায় বাস—হাজির থাকে একটি ভেলভেটের মঞ্জুষা হাতে। মহারাজের চেয়ে বটুক শুধুমাত্র বয়সে তিন বছরের বড়, আর সবকিছুতেই ছোট। আকৃতি-প্রকৃতিতে সে যেন মহারাজের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। সে বামন, অত্যন্ত ধূর্ত। রাজাবরোধের সর্বত্র তার গতায়াত। সব সংবাদই তার নখাগ্রে। মায়, দিনের প্রথম প্রহর থেকেই সে জানতে পারে মহারাজের শয্যাসঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য সে রাত্রে কোন ভাগ্যবতীর! কেমন করে? সে কথাই বলছি।

গুরুদ্বার থেকে রাজাসাহেব খাশকামরায় প্রত্যাবর্তন করলে বটুক সবিনয়ে মণিমঞ্জুষাটির ডালা খুলে তাঁর সামনে মেলে ধরে। তাতে তিন সারিতে দশ-বিশটা সুবর্ণ অঙ্গুরীয়—নানান জাতের। হীরা, পান্না, মুক্তা, চুনি-খচিত। রাজাসাহেব মনস্থির করতে একটু সময় নেন। আংটিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। বটুক অন্য দিকে ফিরে অন্যমনস্কতার অভিনয় করে। তারপর এদিক ফিরে দেখে রাজাসাহেব ইতিমধ্যে ওর ভিতর একটা তুলে নিয়েছেন। এ নিয়ে কোনও কথোপকথন হয় না। বটুক নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করে। চলে যায় সরাসরি নীলমাধব মোতিলালের খাশকামরায়। মোতিলাল মহারাজের অলঙ্কার এবং হীরা-পান্না-মুক্তার হিসাব-রক্ষক। জীবিকার জন্যই ওর উপাধি মোতিলাল। নীলমাধব লক্ষ্য করে দেখে। বলে, হায় ভগবান, আজ আবার উনি মুক্তার আংটিটা তুলেছেন?

বটুক ধমক দেয়, তাতে তোমার কী, মোতিলাল? মহারাজার তিন রানী! তুমি জান না? চুনি-বসানো আংটি না তুললেই তুমি-আমি খুশি থাকব, তাই নয়?

মোতিলাল বিচিত্র হেসে বলত, তা বটে! চুনি-বসানো আংটি তুললেই বুঝতে হবে তোমার-আমার কপাল পুড়েছে!

বটুক একগাল হেসে বলে, আমার নয়, মোতিলাল। আমি বেথা করিনি। আমার মাপে বৌ পাইনি বলে। তোমারও ভয়ের কারণ কিছু নেই, কারণ ভাবিজীর বয়স.....

—থাক!—মাঝপথেই বৃদ্ধ মোতিলাল বটুককে থামিয়ে দেয়।

গুহ্যতত্ত্বটা খুব কম লোকই জানে। তার ভিতর প্রাসাদ অভ্যন্তরে বেগমমহলের বাইরে সে গোপনবার্তাটা জানে মাত্র দু'জন—রাজরত্নভাণ্ডারের রক্ষক নীলমাধব মোতিলাল আর রাজবয়স্য বটুকেন্দ্রনাথ দত্ত—যাকে চুনি-আংটি নির্বাচিত হলে রাজপসন্দ-এর গভীরে প্রবেশ করতে হয়। মায় যুবরাজ পর্যন্ত এ গুহ্যবার্তার বিষয় অনবহিত। অবশ্য রাণীমহলে অনেকেই তা জানে।

রাজাসাহেবের তিন-তিনটি রাণী। তাঁদের পৃথক পৃথক পিতৃদত্ত নাম আছে বটে কিন্তু বেগমমহলে তাঁদের পরিচয় যথাক্রমে সাংকুর মহারাণী, মঝ্‌লি-মহারানী আর ছোটী-মহারাণী। 'মহারানী' সবাই, কিন্তু পাটরানী বাস্তবে সাংকুর মহারানী। ঐ তিনটি প্রকাশ্য নামের অভিধা ছাড়া তিন তিনটি 'আদরের নাম' আছে তিন রানীর। রাজাসাহেবের আদরের ডাক: 'হীরেমন', 'পান্নারানী', আর 'মোতিবিবি'। বড়রানী, অর্থাৎ সাংকুর মহারানী, তিনটি সন্তানের জননী। তিনি হীরেমন। পান্নারানীরও এক ছেলে, এক মেয়ে; শুধু অষ্টাদশী মোতিবিবি এখনো ভূপেন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে কোনো সন্তান উপহার দিয়ে উঠতে পারেননি। রাজাসাহেবের অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি নেই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাজাসাহেব দাম্পত্যজীবনে সমদর্শী। ঋষি বাৎস্যায়নের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। ঋষি বাৎস্যায়ন বলেছেন: ''বাসকপাল্যন্ত যস্যা বাসকো যস্মশ্চতীতে''—অর্থাৎ ''হে রাজন! তোমার ভিন্ন ভিন্ন মহিষীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মিলনরাত্রির আয়োজন করবে। যেদিন যার 'বাসক' বা 'পালা' পড়বে, সে-রাত্রে সেই মহিষীকে নিয়ে শয়ন করবে।''

ঋষি বাৎস্যায়ন আরও নির্দেশ দিয়েছেন: ''দিবাভাগেই স্থির হয়ে যাবে কোন রাত্রে কার বাসক (পালা)। রাজা প্রাতরাশের সময়েই রানীদের একজনের (বস্তুত সে রাত্রে যার পালা) অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে তাঁর মনোগত বাসনাটি জ্ঞাপন করবেন—''তত্র রাজা যদ্ গৃহ্নয়াত্তস্যা বাসকমাজ্ঞয়েৎ।''

তার মধ্যে রাজা যার অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করবেন সে-রাত্রে তারই পালা।

সেই রানীই সেদিন সায়াহ্নে অলক্তকরাগে রঞ্জিত করবে তার রাতুল চরণ, সীমন্তে দেবে সিন্দূর-বিন্দু, কপোলে লোধ্ররেণুর প্রলেপ, স্তনযুগলে চন্দনের আলিম্পন।

ঋষি বাৎস্যায়ন আরও বলেছেন: ''হে রাজন! তুমি সমদর্শী হতে ভুলো না। দেখো, যেন রূপযৌবন-নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি মহিষী সমান কালের ব্যবধানে তার প্রাপ্য বাসক পায়।''

হিজ হাইনেস্ অব পাতিয়ালা এ নির্দেশের আধাআধি মেনে চলতেন। অঙ্গুরীয় গ্রহণ করায় নানান বখেড়া। তার চেয়ে অঙ্গুরীয় প্রদান কম হাঙ্গামার। প্রাতরাশকালে তিন রানীই আবশ্যিকভাবে উপস্থিত। প্রাতরাশ সমাধা করে তিনি হস্তপ্রক্ষালনপাত্রের পাশে একটি মণিখচিত অঙ্গুরী নামিয়ে রাখতেন। রত্নটি হীরা, না পান্না অথবা মুক্তা সমঝে নিয়ে তিন রানীর একজন সেটা উঠিয়ে নিয়ে আঙুলে পরতেন।

বলা বহুল্য, বাৎস্যায়নের ঐ নির্দেশটিও বড় একটা মানা হতো না—ঐ সমদর্শী হবার নির্দেশটা। বিগতযৌবনা সাংকুরের চেয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা মোতিবিবির অঙ্গুরীয় লাভ হতো বেশিবার।

☆ ☆ ☆



গন্ধার সিং বললে, এটা কী বলছিস রে বে-অকুফের মতো? রাজবাড়ি থেকে নেওতা এল, বড়ি মহারানী তোর বউয়ের জন্য পাল্‌কি পাঠাবেন, আর তুই পালকির পাশে পাশে পায়ে হেঁটে যাবি?

লাল সিং রুখে ওঠে: না তো কী? পায়ে হেঁটে ছাড়া আমি কি হামাগুড়ি দিয়ে যাব?

—নেহি দোস্ত! তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে যা! আমার উষ্ণীষ, আমার কৃপাণ!

গন্ধার সিং ওর বচপনের দোস্ত্। খুব ছেলেবেলায় ওরা তিনজনে এক সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে খেলা করত। লাল, গন্ধার আর সাংরুর! ওরা একই গ্রামের মানুষ। সাংরুর জেলার। পাতিয়ালার পুবে। ভাগ্যের কী বিচিত্র বিধান। তিন বাল্যসঙ্গীর একজন এখন মহারানী, একজন বিউগ্‌ল্‌বাদক আর একজন—হ্যাঁ, ডাকাত! ছোটখাটো ডজনখানেক বাঁধনছেঁড়া নওজোয়ানের নেতা এখন ডাকু-সর্দার গন্ধার সিং। অশ্বপৃষ্ঠে পাকদণ্ডী পথে হানা দিয়ে সার্থবাহের সর্বস্ব লুটে নেয়। দূর দূর গ্রামের জোতদার বা মহাজনের গদিতে ডাকাতি করে। এটাই তার পেশা। এটাই তার জীবিকা। নানক সিং খবর রাখে। আপত্তি করে না। কারণ ভাগ পায়। শুধু মাঝে মাঝে গন্ধারকে শাসায়: বাড়াবাড়ি করিস না গন্ধার, জানে মারা যাবি! ঔর হোঁসিয়ার! রাজাসাহেবের স্বার্থে যেন আঘাত না লাগে। তাহলে আমি তো ছাড় স্বয়ং দেওয়ানজীও তোকে জানে-মানে বাঁচাতে পারবেন না।

গন্ধার তা জানে। সে হিসেব কষেই ডাকাতি করত।

নানক সিং ছিল সদর কোতোয়ালীর বড় হুজুরের বাপ্। অংরেজি লব্‌জ-এ ওর পদটার নাম: সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস, পাতিয়ালা, রাজস্টেট।

কিসমৎ একেই বলে। নাগরদোলার মতো। এই ওঠে, এই নামে। মাথায় গন্ধারের দেওয়া রেশমী উষ্ণীষ আর মাজায় অনেকের মাথা-নেওয়া কৃপাণখানা বেঁধে তৈরি হবে নেবার সময় লাল সিং স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি নেপথ্যে একটি মহাশক্তিধর বজ্র উদ্যত হয়ে আছে।

নিজের সাম্প্রতিক সৌভাগ্যে সে বিভোর। লাল সিং নগণ্য বিউগ্‌লার। সকাল সন্ধ্যা ঢা ঢা করে বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে সে প্রহর ঘোষণা করে। তাতেই তার গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন। এমন এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ সৈনিকের ভাগ্যে পরমকারুণিক লিখে দিলেন এক আসমানের হুরীর নাম: দলীপ কৌর। পাঞ্জাবিনীদের মধ্যেও এমন দীর্ঘাঙ্গিনী নিতান্ত দুর্লভ। এমন আনারকলির মতো রঙ! এমন খুবসুরৎ!

উষ্ণীষ সমেত লাল সিং ওকে ছাপিয়ে যেতে পারে না, দেহদৈর্ঘ্যে। অথচ আশ্চর্য! দলীপের মধ্যদেশ কী ক্ষীণ! এমন একটি ডম্বরু আকৃতির সুতনুকাকে দেখেই

বোধকরি বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস লিখেছিলেন, ''মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালী''।

গাঁয়ের মেয়ে। বাল্যেই বাপ-মা হারা, মামার কাছে মানুষ। মামাকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। দূর গাঁয়ে বসে বেচারি লাল সিংয়ের হক-হদিস পায়নি। শুনেছিল পাত্র সাংরুর মহারানীর ছোট ভাই, হোম সেক্রেটারির ভাতিজা। এর বেশি খবর পায়নি।

তা সে জন্য খেদ নেই দলীপের। 'উইমেন্স লিব' শব্দটা তখনো পয়দা হয়নি। মরদ নির্বাচনে ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার প্রেরণা সে যুগে ছিল ভারতীয় হিন্দু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। তাছাড়া লাল সিং সুদর্শন, মাথায় খাটো হলেও। লাল সিং বুঝমান, দৃঢ়চরিত্রের খালসা শিখ আর সবচেয়ে বড় কথা সে দলীপের মহব্বতে বিলকুল মাতোয়ারা। বহুকে সে আনারের মতো তুলোর কটোরায় তুলে রাখতে চায়। তাকে ইঁদারা থেকে জল তুলতে দেয় না, বর্তন মোলতে দেয় না—কী? না দলীপের আসমানী হুরীর মতো সুরৎ খারাপ হয়ে যাবে। দলীপ হাসে মরদের পাগলামিতে। বলে, হর গাঁয়ে ঘরওয়ালীরা উনুনের ধারে বসে জোয়ারের রুটি বানায়, কুয়ো থেকে পানি খিঁচে, বর্তন মোলে। আমিই বা কী এমন নাজুক...

লাল বাধা দিয়ে বলত, সে তুই বুঝবি না পাগলি!

দলীপও তার দুলহাকে ভালবেসেছিল প্রাণ ঢেলে।

রাজবাড়ি থেকে ননদিনীর নিমন্ত্রণ পেয়ে দলীপ উচ্ছ্বসিত। ঐ অদেখা ননদিনীর উপহার দেওয়া 'রানি-কালারের' বেনারসী শাড়িখানা পরল। কানে দুলিয়ে দিল রূপার ঢেঁড়ি ঝুমকো, সিঁথির বাঁ পাশে ঝুটো মোতির ঝাপটা। রানি-কালারের শাড়িতে তাকে রানীর মতোই লাগছিল।

কিং খাবে মোড়া পাল্‌কিতে দলীপ চলেছে রাজবাড়ি। পাশে পাশে অশ্বপৃষ্ঠে কৃপাণধারী লাল সিং। কে বলবে থার্ড ব্যাটেলিয়ানের বিউগ্‌ল্‌দার? মনে হচ্ছে রূপমতী রাজকন্যার পাশাপাশি বুঝি কোন রূপকথার রাজপুত্র।

ঘণ্টাখানেক আগুপিছু হলে হয়তো দুর্ঘটনাটা আদৌ ঘটত না। কিন্তু এটুকু ওয়ক্ত ওকে মেহেরবানি করে মঞ্জুর করলেন না দীনদুনিয়ার মালেক। মধ্যাহ্নে রুপোর থালায় যে রাজকীয় ভূরিভোজ হলো তেমন খানা জিন্দেগীভর খায়নি দলীপ, অথবা তার দুলহা। সাংরুর মহারানী নিজে সামনে বসিয়ে ওদের যত্ন করে খাওয়ালেন। তাঁর চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে দুজনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন কত আজীব চিড়িয়াঁ, যার নামও শোনেনি ওরা। ম্যাকাও, কাকাতুয়া, লেডি আমহার্স্ট ফেজেন্ট, বার্ড অব প্যারাডাইস। দুপুরে দলীপ 'কলের গান' শুনল, আর ওরা দুই ভাইবোন বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করল। সাংরুর মহারানীর বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দশ বছর। বাপের বাড়ি যাননি একবারও এর মধ্যে। তাই তাঁর কৌতূহলের আর অন্ত নেই। সাংরুর মহারানী, লাল সিং আর গান্ধার সিং ছিল বাল্যবন্ধু। একই গাঁয়ে মানুষ। একসঙ্গে মাস্টারজীর পাঠশালায় পড়তে যেত। কত দিনের কত হারিয়ে যাওয়া

স্মৃতি— ঝুলায় পাশাপাশি বসে আকাশছোঁয়া ওঠাপড়া, দেওয়ালীর রাতে পিদিম্ জেলে বাড়ি সাজানো, তারাবাতি জ্বালা; বাসন্তী উৎসবে হুল্লোড় করে রঙ মাখানো। প্রসঙ্গত গন্ধার সিং-এর কথাও উঠে পড়ে। লাল জানত, উঠবেই। কারণ বালক বয়সেই লাল সিং সমঝে নিয়েছিল যে, ওর বড়িবহিন আর গন্ধার সিং— তারা তখন কৈশোরে সবে পদার্পণ করেছে—পরস্পরকে অন্য চোখে দেখত। যাকে বলে: প্যার, ইশক, মহব্বৎ। ব্যাপারটা জমতে পারেনি—কৈশোরে পদার্পণ মাত্র সাংরুরের বিবাহ হয়ে যাওয়ায়। তবে ছোটভাইয়ের কাছ থেকে গন্ধারের কথা জেনে নেবার আগে মহারানী তার সহচরীর সঙ্গে প্রাসাদ ঘুরে দেখতে দলীপকে অন্তরালে পাঠিয়ে দিলেন।

পাতিয়ালা-প্রাসাদ ঘুরে- ফিরে দেখবার জিনিসই বটে। লাহোরের শালিমার বাগিচার অনুকরণে মহারাজা নারিন্দর সিং শিখরাষ্ট্রের রাজধানী পাতিয়ালায় বানিয়েছিলেন এই মোতিবাগ প্রাসাদ। মহারাজ ভূপেন্দ্র সিং সেটিকে আকারে বৃহত্তর, শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। শিশমহলের কাচের অলঙ্করণ চোখ ধাঁধায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন: ব্যাভেরিয়ান শ্যান্ডেলিয়ার। দেওয়াল-জোড়া ভেনিসীয়-দর্পণ। প্রাসাদসংলগ্ন সংগ্রহশালাটি ভালো করে দেখতে গেলে সারাটা দিন লেগে যায়। হাতে লেখা নানান পুঁথি—সংস্কৃত, পালি, উর্দু, গুরুমুখী। রাজস্থান আর কাংড়া-উপত্যকায় কয়েকশ বছর ধরে শিল্পীরা যেসব জলরঙের ছবি এঁকেছেন তার সংকলন। কিছু কিছু য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পীর তেলরঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্যানভাস: প্রাকৃতিক দৃশ্য, যুদ্ধদৃশ্য, মহারাজ-বংশের নানা বিগত যুগের ভূপতিদের প্রতিকৃতি। চীনামাটির তৈজস আর এনামেলের সুন্দর কারুকার্যকরা কৃপাণ ও যুদ্ধাস্ত্র। পরিচারিকা দলীপকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। ঘোমটার একপ্রান্ত উঁচু করে কাজলকালো হরিণ নয়নে নববধূ তার কৌতূহল চরিতার্থ করতে থাকে। জলসাঘরে অবশ্য ওরা গেল না। পুরুষ প্রহরী ব্যতিরেকে সে-মহলে যাওয়া যায় না। সেখানে প্রাচীরব্যাপী বিরাট বিরাট নগ্নিকা নারীর স্নানদৃশ্য। মার্বেলের ন্যুড। সাহেব চিত্রকরের আঁকা ভেনাস, কিউপিড, ফন, ব্যাকাস আর স্যাটীর। এই জলসাঘরকেই ভবিষ্যতে ধন্য করেছিলেন উস্তাদ বিন্দু খান, উস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান-সাহেব।

দলীপ যখন এসব ঘুরে ঘুরে দেখছে তখন সাংরুর মহারানী তাঁর একান্ত-কক্ষে প্রসঙ্গটা তোলেন: গন্ধারের প্রসঙ্গ। লাল তার বড়ি বহিনকে জানাতে চাইছিল না যে, গন্ধার ইদানীং কোন্ জীবিকায়.....কিন্তু দেখা গেল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মহারানী অনেক খবরই জানেন, তার মধ্যে তাঁর বাল্যসখার সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানাও। বললেন, ভেইয়া, ম্যায়নে সব কুছ্ জান্‌তি। বহ্ বদনসিবকো জরাসে হোঁশিয়ার কর দেনা। অগর রাজাসাবকো পতা মিল যায় তো....

বাক্যটা সমাপ্ত হয় না। তার আগেই বাইরে কিসের যেন কোলাহল। হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে সেই নৌকরনি, দলীপকে নিয়ে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। দুজনের পুরন্ত বুকই ওঠানামা করছে দৌড়ানোর জন্য।

মহারানী জানতে চান, কী হয়েছে? অমন করছিস কেন?

—সর্বনাশ হয়েছে! মহারাজ আচমকা ফিরে এসেছেন সিমলা থেকে।

সাংরুর মহারানী তাকে প্রচণ্ড চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন: চুপ যা, বে-অকুফ! কোনও প্রহরীর কানে গেলে তোর জিবটা উপড়ে নেবে।

তা বটে! লজ্জায় যতটা তার চেয়ে ভয়ে বেচারি মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ওর দোষ নেই। বেচারি একে সুন্দরী তায় যৌবনবতী। মহারাজকে সে যমের মতো ভয় করে। ঘুঙট-আড়ালে রাখে তার মুখ, দোপাট্টা-আড়ালে বুক।

লাল সিং জানতে চায়, কী হয়েছে দিদি?

মহারানীকে জবাব দিতে হয় না। তার পূর্বেই ঘোষক মহারানীর দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে পুকার দেয়: হোঁসিয়ার! মহারাজ-বাহাদুর বড়ি বেগমকী মহলপে পধার রহেঁ হেঁ।

পরমুহূর্তেই কে একজন খিদ্‌মদ্‌গার রানীমহলের প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারের সামনে ঝোলানো ভেলভেটের পর্দাটা তুলে ধরে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে। যে-যেখানে ছিল নত হয়ে অভিবাদন করে। কক্ষে পদার্পণ করেন মহারাজ ভূপিন্দর সিং বাহাদুর।

হ্যাঁ, রাজার মতো চেহারা বটে। রূপে নয়, আকৃতির বিশালতায়। যেন মধ্যমপাণ্ডব! তেমনি জমকালো সাজপোশাক। রোলস্ রয়েস-এ এম্‌ন আরোহীই মানায়।

মহারানীর ঘরখানা প্রকাণ্ড। বিলিয়ার্ডস্-ফাইনাল খেলার আয়োজন হলে দর্শকের স্থানাভাব হতো না। ঘরের একান্তে ডবল-বেড পালঙ্কটা নজরেই পড়ে না। এ-প্রান্তে দেওয়াল-সই-সই কিছু খাড়াপিঠ মখমলের গদিমোড়া চেয়ার—ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের। ও-প্রান্তে যুগ্মাসনের একটি ঝুলা—তার লৌহশৃঙ্খল স্বর্ণমণ্ডিত। আর একটি প্রকাণ্ড সিংহাসন। সেটিও স্বর্ণখচিত। এ ঘরে এসে উপবেশনে মন হলে রাজাসাহেব ঐ আসনে গিয়ে বসেন।

ঘরভর্তি নতশির নরনারীর অভিবাদনে ভ্রূক্ষেপও করলেন না উনি। সাংরুর মহারানীর দিকে ফিরে বললেন, দুদিন আগেই সিমলা থেকে ফিরে এলুম, বুঝলে? বড়লাট বাহাদুর সামলে উঠেছেন। যে কম্‌বক্তটা ঐ বোমাটা ছুঁড়েছিল সে এখনো ধরা পড়েনি—দুচার দিনের ভিতরই লোকটা ধরা পড়ে যাবে। তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে সি. আই. ডি. তলাশ চালাচ্ছে! পালাবে কোথায়?

রানীসাহেবা বলেন, বড়লাটবাহাদুর যে জানে মারা যাননি....

কথাটা শেষ হয় না। মহারাজা অট্টহাস্য করে ওঠেন: লাটসাহেব বাহাদুরকে জানে মারবে একটা বাংগালি ভেড়ুয়া!

—বাংগালি? লোকটা কি বঙ্গাল মুলুক থেকে এসেছিল?

রাজাসাহেব জবাব দেন না। তাঁর হঠাৎ নজর পড়ে দলীপ কৌরের দিকে। দু আঙুলে ঘুঙট ফাঁক করে সে দেখছিল ঐ দশাসই রাজামশাইকে। চোখাচোখি হতেই ঘোমটা টেনে দেয়। কিন্তু তার পূর্বেই রাজাসাহেব দেখে ফেলেছেন নার্গিস-এর মতো ঐ বেহেস্তী হুরীর অনিন্দ্য-আনন। অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন: বহ্ কৌন?

মহারানী চোখ ইশারায় দুজনকে অভিবাদন করতে বলেন। মৌখিক জবাব দেন, ও হলো লাল সিংয়ের বহু। এই হচ্ছে লাল, মেরে লাল, ছোটা ভাই।

মহারাজা সবিস্ময়ে বলেন, ক্যা তাজ্জব! গুর্নামের আর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল বলে তো শুনিনি?

গুর্নাম সিং ওঁর শ্বশুর; কিন্তু প্রজা তো বটে! তাই নাম ধরেই তাকে ডাকতেন মহারাজা।

রানী বলেন, না আমার আপন ভাই নয়। ওর পিতাজী—প্রীতম সিংজী—ছিলেন আমার নিজের চাচা....

মহারাজের কর্ণকুহরে বোধকরি এসব কথা আদৌ প্রবেশ করেনি। তিনি হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে দলীপের দুটি কাঁধ ধরে ফেলেন। প্রণামরত মেয়েটিকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেন। রাজস্পর্শে শিহরিত তনু দলীপ তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে মরদের আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়।

মহারাজ লাল সিংকে সরাসরি প্রশ্ন করেন: ও তোমার ঘরওয়ালী?

লাল সিং পুনরায় অভিবাদন করে বলে, জী! মহারাজ!

—কদ্দিন সাদি হয়েছে তোমাদের?

—সতের দিন।

—হুম্। তা তুমি কুর্সির উপর না উঠে তোমার ঐ ঘরওয়ালীর মুখে চুমু খেতে পার?

লাল সিং-এর দুকান লাল হয়ে ওঠে অপমানে! কিন্তু এই আজব প্রশ্নে ফিক করে হেসে ফেলেছে দলীপ—আর সেটা খণ্ডমুহূর্তের জন্য নজরে পড়ে যায় মহারাজের। তিনি ঠা-ঠা করে হেসে ওঠেন।

দলীপ ঘোমটা টেনে আরও পিছনে সরে যায়। মহারানী মুহূর্তে সচকিতা হয়ে ওঠেন। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি একটু কঠিন স্বরেই বলে ওঠেন, এবার তুই ঘর যা লাল!

রাজাসাহেবের হাসি থেমে যায়। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলেন: না!!

রাজাসাহেব যেন ওঁর পিঠে ছোরা মেরেছেন। চকিতে ঘুরে দাঁড়ান সাংরুর মহারানী: কী না?

রাজাসাহেব দক্ষ অভিনেতা। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে বলেন, তা কেমন করে হয়, হীরেমন? লাল সিং এ গরীবখানায় শুধু মেহ্মান নয়, সে তোমার-আমার রিস্তেদার। একটা রাত এখানে আমাদের আদর-আপ্যায়নের অত্যাচার তাকে সহ্য করতেই হবে....কোই হ্যায়?

রাজাসাহেবের করতালি মর্মরপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হবার অবকাশ পেল না। তার পূর্বেই ছুটে আসে খিদ্মদ্গার। কুর্নিশ করে।

মহারাজা তাকে নির্দেশ দেন, মহামান্য অতিথিকে মেহ্মানখানায় নিয়ে যেতে। অভ্যর্থনা-পরিচর্যার কোনও ত্রুটি হলে সে বেয়াদপি যে সহ্য করা হবে না—সবকটারই

গর্দান নেওয়া হবে—তাও শুনিয়ে দেন।

☆ ☆

মেহ্‌মানখানার বিলাসবহুল কক্ষে মহামান্য রিস্তেদারের খিদমতে কোনও ত্রুটি হলো না। খাদ্য, পানীয়, মদিরা—পরিচর্যার নানান আয়োজন। শুধু হতভাগ্য লাল সিং জানতে পারল না—কোথায় কীভাবে তার বউ রাতটা কাটাচ্ছে। সমস্ত রাত নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময় পায়চারি করল। দুগ্ধশুভ্র কামদার শয্যায় আদৌ শয়ন করতে পারল না।

নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না। পরদিন সকালে দিনের আলো ফুটলো।

খিদ্‌মদ্‌গার ছোট-হাজরি হাতে কক্ষে প্রবেশ করে দেখল পূর্বরাত্রে সে যে নৈশাহার সরবরাহ করে গেছিল, তা পড়ে আছে অস্পর্শিত। এমন ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। নিঃশব্দে সে সেই অভুক্ত থালাটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।

একটু পরে প্রহরী এসে সংবাদ দিল—বাইরে মহামান্য অতিথির অশ্বটিকে উপস্থিত করা হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গেল মহারাজ ভোর রাত্রে কোথায় বুঝি শিকারে চলে গেছেন। ঘরের বাইরে এসে দেখল কিংখাবে মোড়া পাল্‌কির এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে দলীপ।

বড়ি-বহিনের সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি না জানতে চেয়েছিল লাল সিং। প্রহরী সবিনয়ে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন। মহারাজ হুকুমজারি করে গেছেন আপনাদের দুজনকে সরাসরি ডেরায় পৌঁছে দিতে হবে। তার আগে....

—বুঝেছি। চল।

☆ ☆ ☆





কিংখাবে মোড়া পালকির পাশে-পাশে নিমন্ত্রণরক্ষা সমাপ্ত করে নিজ কুটিরে ফিরে চলেছিল লাল সিং, প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায়। এখন তার মাথায় নেই উষ্ণীষ, মাজায় বাঁধা নেই কৃপাণ। তরোয়ালখানা উষ্ণীষে জড়িয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়েছিল এবার। তাই ওকে আর রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল : চোরের দায়ে ধরা-পড়া কোনও বে-অকুফ উল্টো গাধায় চেপে রাজপ্রাসাদের সিংদরজার বাইরে যাচ্ছে।

পাল্‌কি-বাহকেরা বোধহয় ভিতরের কথাটা জানে অথবা আন্দাজ করেছে। হয়তো এর আগেও ঘরানা-ঘরের যৌবনবতীদের—কুমারী, সধবা, বিধবাদের — এভাবে নিশাবসানে তাদের নিজ নিজ ডেরায় পৌঁছে দিয়েছে। পাল্‌কির পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে সঙ্গ দান করেছে হতভাগিনীর বাপ-ভাই অথবা—যেমন এক্ষেত্রে— মরদ। কারণ পাল্‌কি ওর দোরগোড়ায় নামিয়ে দেওয়ামাত্র যখন দলীপ হুড়মুড়িয়ে ভিতরে চলে গেল তখন তারা নিক্কথায় আবার পাল্‌কি তুলে নিল কাঁধে। ফিরে যাবার আগে প্রথামাফিক রাজবাড়ির একরাত্রের মহামান্য অতিথিকে সেলাম বাজালো বটে কিন্তু বক্‌শিশের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করল না।

চাবির থোকাটা ছিল দলীপের পেট-কোঁচড়ে বাঁধা। তড়িঘড়ি সে সদর খুলে ভিতরে ঢুকে গেল, দু হাতে দরওয়াজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

লাল সিং ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ঘোড়াটাকে দ্বারপ্রান্তে শিশু দেওদারগাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে পুঁটুলি বগলে দোর ঠেলে উঠোনে ঢুকল। দেখল তার পূর্বেই দলীপ ওদের একমাত্র কক্ষের দ্বার খুলে ভিতরে চলে গেছে। রুদ্ধ করে দিয়েছে শয়নকক্ষের দরজা।

এক-কামরার নুড়িয়া টালির খুপরি। ঘরের সামনে এক চিলতে একটা বাঁশ-খুঁটির বারান্দা। ও প্রান্তে পাকঘর। উঠোনেই কাঁচা পাতকুয়ো। স্নানাগার বা শৌচাগারের বালাই এ পাড়ায় কারও বাড়িতে নেই, থাকে না।

লাল অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করল। দলীপ সাড়া দিল না। কণ্ঠস্বর চড়াতেও সাহস পেল না। প্রতিবেশীরা কৌতূহলী হয়ে উঠবে। গত রাত্রে ওরা যে রাজবাড়ির অতিথি ছিল এ তথ্যটা হয়তো দুচারজন জানে। অন্তত প্রতিবেশী জীবনলাল আর তার কৌতূহলী ঔরৎ। লাল দরজার ফাঁকে মুখ লাগিয়ে বললে, আমার কী কসুর? আমার উপর নারাজ হচ্ছিস কেন? কলিজা কি তোর একারই টুটেছে? খোল্! দরওয়াজা খোল দে পাগলি।

কিন্তু দলীপ কোনও সাড়া-শব্দ দিল না। অগত্যা ওখান থেকে উঠে পড়তে হলো ওকে। বললে, আজ তো আমার ছুট্টি নেই। ছাউনিতে যাচ্ছি। ঘোড়াটাকে

দানাপানি দিস। নিজেও কিছু রেঁধে খাস। ও বেলা আসব। ডিউটি খতম হলে।

লাল সিং রিজার্ভ-ফোর্স-ফৌজের খিদ্‌মদ্‌গার। ছাউনিতে তাকে রাত্রিবাস করতে হয় না। সূর্যাস্তে বিউগ্‌ল বাজিয়ে সে প্রতিদিন ডেরায় ফিরে আসে। রাত নয়টায় শয়নসঙ্কেতের বিউগ্‌লধ্বনি বাজায় ওর পরিবর্তে অন্য একজন জওয়ান।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতির সময় সে খানা-মোকামের দিকে আদৌ যায়নি। সার দিয়ে যারা ফৌজীখানা গ্রহণ করেছে তারা টেরও পায়নি যে, জিন্দ্‌-আর্মির থার্ড-ব্যাটেলিয়ানের একজন সামান্য বিউগল্‌দার তার অ্যালুমিনিয়ামের থালাখানা হাতে নিয়ে আজ পংক্তি ভোজনে সামিল হয়নি। নিরুদ্ধ আক্রোশে সে দাউ দাউ করে জ্বলেছে সারাদিন। উপায় নেই, কোনো উপায় নেই—এ অপমান তাকে সহ্য করতে হবে। এমন দুর্ঘটনা পাতিয়ালায় আগেও ঘটেছে, লাল জানত—কিন্তু স্বয়ং মহারানীর ছোটভাইয়ের বউকে যে এভাবে....

সারাদিন অভুক্ত মানুষটা যখন ঘরে ফিরে এল তখন গোধূলি লগ্ন। সদর হাট করে খোলা, দলীপ বসেছিল বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তবু আশ্চর্য! তার পরিধানে এখনো সেই রানি কালারের শাড়িখানাই। কোনও গরম জামা বা চাদর জড়ায়নি। প্রসাধন চিহ্ন একই রকম! এমনকি ওর কপালে—কী জানি কী করে—কালরাত্রে টিপটা ধেবড়ে গেছিল, সেটাও মুছে ফেলা হয়নি।

লাল সিংকে উঠানে পা দিতে দেখেই দলীপ মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। লাল ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল সদর। উঠোনটা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে এল দলীপের কাছে। প্রথম প্রশ্ন যেটা করল তা ওদের সর্বনাশ সংক্রান্ত নয়। কথাবার্তায় ও সহজ হতে চাইছিল। বললে, ঘোড়াটাকে দেখছি না? গন্ধার এসে নিয়ে গেছে?

নতনেত্রে দলীপ জবাব দিল, গন্ধারজী নয়, ওর শালা হরনাম সিং।

—ও! তা তুই ঘোড়াটাকে দানাপানি কিছু দিয়েছিলি তো?

নতনেত্রেই দলীপ জবাব দেয়, প্রয়োজন হয়নি। তুমি চলে যাবার ঠিক পরেই রুকমিণীদিদির ভাই হরনাম সিং এসে ঘোড়া, কৃপাণ, উষ্ণীষ সব নিয়ে যায়।

—ও, আচ্ছা! আমার খাবার দে! বড় ভুখ লেগেছে!

লাল এগিয়ে যায় পাতকুয়ো তলায়। এক বালতি জল উঠিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। দড়িতে টাঙানো আঙোছা নিয়ে মুখ-হাত মুছতে মুছতে ওর নজর হয় দলীপ একই ভঙ্গিতে নিশ্চুপ বসে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারে এতক্ষণে। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় পাকঘরের দিকে। নিকানো উনান। ঝক্‌ঝকে মাজা বাসনপত্র সব উপুড় করে সাজানো। ঠিক যেমন রেখে গেছিল দলীপ রাজবাড়িতে নেওতা খেতে যাবার আগে।

পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসে ঘরওয়ালীর কাছে, যার সঙ্গে বিয়েটা তিন হপ্তাও পার হয়নি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে, বহু! মুঝে মাফ কর দে! আমি তোর অযোগ্য মরদ। যে দুশমনটা তোর ইজ্জৎ নিল সে আমার নাগালের বাইরে। বাঘনখ হাতে পরে নিয়ে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে পারি,

কিন্তু ঐ দানবটাকে ছুঁতে পারব না। তার আগেই ওর দেহরক্ষীরা আমাকে দুটুকরো করে ফেলবে।

দলীপ জবাব দিল না। নতনেত্রে নিশ্চুপ বসেই রইল।

—তবু তুই যদি তাই চাস তো বল! সেটাই হবে আমার প্রতিজ্ঞা। সেটাই হবে আমার জীবনের ব্রত। জানকবুল প্রতিশোধ নিতে যাব আমি!

এবার দলীপ মুখ তুলল। বলল, না! তুমি সে চেষ্টা কর না। ঘরওয়ালীর ইজ্জৎ রাখতে তুমি জান দিলে দুশমনটার লাভ বৈ লোকসান হবে না। ও সেটাই চাইবে, ও সেটাই চাইছে।

—মৎলব?

—আমি বিধবা হলে ও আমাকে সাদি করতে পারবে। সমাজ, ধর্ম, অংরেজ সরকার কেউই আপত্তি করতে পারবে না। আর তুমি বেঁচে থাকলে....হাজার হোক দুশমনটা তো দেশের রাজা! 'সমাজ', 'লোকলজ্জা' বলেও তো কিছু কথা আছে। সধবা ঔরৎকে....

—বুঝলাম! তাহলে তুই কী করতে চাস?

—একটাই পথ আছে। পালাতে হবে। পাতিয়ালা থেকে। চুপি চুপি....

—তাই হবে। দেশে ঘরে এখনো কিছু জমি-জেরাৎ আছে—

—না! বে-অকুফের মতো কথা বল না। দেশঘর বলতে তো সাংরুর জিলা। সেটা তো পাতিয়ালার পাশের বাড়ি। পাতিয়ালা রাজ এস্টেটের ভিতর। আমাদের পালিয়ে যেতে হবে দূরে—বহোৎ দূর কোনও আন্‌জান মুলুকে। যেখানে ঐ দুশমনটার চর আমাদের খুঁজে পাবে না।

—সে কোন দেশ?

দলীপ ওর চোখে-চোখ তাকায়। বলে: বংগাল-মুলুক।

—বংগাল মুলুক! সেখানে তোর জান-পহ্‌চান কেউ আছে?

—আছে! মেরি ছোটা-ভাই। তার নাম বা পতা যদিও জানি না।

—কী আবোলতাবোল বক্‌ছিস! সে কে?

—ঐ যে দামাল ছেলেটা লাট বাহাদুরের উপর বোমা ছুঁড়েছিল।

লাল সিং ঘাবড়ে যায়। বলে, সে তোর ছোট ভাই? কী সূত্রে? দলীপ সেটা বুঝিয়ে বলতে পারেনি। তত্ত্বটা তার মরদকে বুঝিয়ে বলার মতো ভাষার দখল তার ছিল না। কিন্তু তার গ্রাম্যবুদ্ধিতে, নারীত্বের সহজাত প্রবৃত্তিতে সে বুঝে নিয়েছিল—ঐ অত্যাচারী পাতিয়ালার মহারাজ আর তার রক্ষাকারী বড়লাট বাহাদুর কোন এক অনবলোকিত বিনি সুতোর মালায় গাঁথা দুটি শয়তানীসত্তা। যুগে যুগে যেভাবে অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধা থাকে দেশের শাসক আর তার ক্যাডার বাহিনীর মস্তান! ওর মন বলছিল হিন্দুস্থাঁর বিপরীত প্রান্তে ঐ বংগাল মুলুকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠছে। যেতে হলে তেমন দেশেই ওদের যেতে হবে।

দলীপকে নীরব দেখে লাল বলে ওঠে, ঠিক আছে, রাতে সেটা পরামর্শ করে ফয়সালা করা যাবে। তুই তো দেখছি সারা দিনে শাড়িটাও পালটাসনি। ওঠ, যা,—আস্নান করে নে। আমি দিল্লী সড়কের উপর কর্তার সিং-এর ধাবা থেকে গরম গরম গোস-রুটি নিয়ে আসছি। বেশ বুঝতে পারছি তুই আজ উনুনে আঁচ দিস্‌নি, তাই না?

দলীপ জবাব দেয় না।

ঘণ্টাখানেক পরে লাল সিং যখন গোস-রুটির ডাব্বা নিয়ে ফিরে এল ততক্ষণে দলীপের স্নান সারা। পরে নিয়েছে ঘরোয়া সালোয়ার-কামিজ, দোপাট্টা। প্রসাধন চিহ্নের বিন্দুমাত্র এখন নেই। দুজনে মুখোমুখি বসে পড়ে নৈশাহারে। আহার শুরু করে একই পাত্র থেকে। মুসলমানদের রোজা-ভাঙার ইফ্‌তারির মতো শিখেরাও একই পাত্র থেকে আহার করে। বোধকরি গুরু গোবিন্দের একতামন্ত্রের বিভিন্ন আদেশের এ এক তির্যক রীতি। আহারপর্ব সমাধা হবার আগেই যামঘোষকেরা সরব হলো। পাতিয়ালা সদর শহর, কিন্তু ওদের বাস যে চকবাবা-মহল্লায়, সেখানে আরণ্যকজীবন শহুরে পরিবেশের সঙ্গে করমর্দন করছে। এখানে সারারাত প্রহরে প্রহরে যামঘোষকের দল সাড়া জাগায়।

আহারান্তে জুঠা বর্তন উঠিয়ে নিয়ে গেল দলীপ। কুয়োপাড়ে রেখে দিয়ে এল। নিচু পাঁচিল, কিন্তু চোরের উপদ্রব নেই। অন্তত এই সদর শহরে। বড় কোতোয়াল সর্দার নানক সিং-এর কড়া শাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে লাল। এ কী? ওদের দ্বৈতশয্যায় যথারীতি বিছানা পাতা, মচ্ছরদানি খাটানো; কিন্তু তক্তপোশে মাত্র একটি বালিশ। মেঝেতে একটা তোশক-কম্বল পাতা। সেখানে দ্বিতীয় উপাধান।

দলীপ ততক্ষণে একহাতে কাঙরি অপর হাতে প্রদীপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। লাল তার দিকে ফিরে শুধু বললে: মৎলব?

জ্বলন্ত কাঠকয়লার কটোরা ঐ 'কাঙরি' আর প্রদীপটাকে নামিয়ে রেখে যুক্তকরে নতনেত্রে দলীপ এতক্ষণে ফিরিয়ে দিল তার মরদের জবাব: মাফ কর দে! মুঝে মাফ কর দে, লাল!

—তার মানে? তুই আমার বিছানায় শুবি না?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল দলীপ।

ওর দিকে লাল দুটো হাত বাড়িয়ে দেবার উপক্রম করতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তিন পা পিছিয়ে গেল মেয়েটি। সেখান থেকে মিনতি করল: মুঝে ছুঁয়ো মৎ!

বজ্রাহত হয়ে গেল লাল সিং: কী বলছিস! আমি....আমি লাল সিং....তোর মরদ....তোকে ছোঁব না?

অশ্রুর আবেগে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ, তবু কোনোক্রমে ও বোঝাবার চেষ্টা করল, না! তবে, সারা জিন্দেগিভর নয়। কিন্তু....কিন্তু....

কেমন করে বোঝাবে আনপড় গ্রাম্য মেয়েটি?....বেচারির মনে হচ্ছে ওর সারাটা দেহ পাঁক মাখানো, গন্দা—অপবিত্র! পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে ওর মরদের সঙ্গে এক বিস্তারায় শুতে। লাল কি পারে না ওকে একবার মুক্তিতীর্থ অমৃতসরে নিয়ে যেতে?

—অমৃতসর! কেঁও? অমৃতসর কেন?

হ্যাঁ, সেই অমৃতসরই। সেখানে অকাল তখৎ-এর কিনারা ঘেঁষে যে স্বর্ণমন্দির, তার কুণ্ডে দলীপ একবার অবগাহন স্নান করতে চায়। ওর মনে হচ্ছে তাহলেই ওর দেহের—এবং হ্যাঁ, মনের—সব ক্লেদ ধুয়ে যাবে। যে দুর্ঘটনা ওর জীবনে ঘটে গেছে তাকে আর 'না' করা যাবে না। কিন্তু দেবতার দ্বারে স্নানান্তে নির্যাতিতা মেয়েটি একবার তার ফর্জ জানাবে। তারপর দায়-দায়িত্ব আর ঐ অভাগিনী নারীর নয়, দেবতার।

লাল সিং বলল, ঠিক হ্যয়। ম্যায়নে মানলি।

ধর্ষিতা ঘরওয়ালীর কঠিন শর্তটা সে মেনে নিল। যব তক ঐ বদনসিব ঔরৎটাকে অমৃতসরের তালাওয়ে অবগাহন স্নানের সুযোগ করে দিতে না পারছে ততদিন সে তার ধর্মপত্নীর অঙ্গস্পর্শ করবে না।

ছুটি পাওনা ছিল না। থাকবে কোথা থেকে? সাদির বাবদে সব জমা ছুটি খরচ করে বসে আছে। গন্ধার সিং বুদ্ধি যোগালো। গন্ধার ওর বচপনের দোস্ত। তবু এই ঘরের কেচ্ছা তো তাকেও বলা যায় না। কিন্তু মুখ খুলতেই হলো না লালকে। গন্ধার রাজ্যের সব খবর রাখে। রাজবাড়ির ভিতরের খবর সে মোটা টাকা খরচ করে সংগ্রহ করে। বটুককে মাসান্তে কমিশন জুগিয়ে। এটা ওর ব্যবসায়ের প্রয়োজনে। রাজ্যে ডাকাতি করতে হলে রাজার নেকনজরে থাকতে হয়। লাল সিংকে ইতস্তত করতে দেখে গন্ধার নিজে থেকেই বললে, ম্যয় জান্‌তা হুঁ, ইয়ার! লেকিন ক্যা কিয়া যায়? এস্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা!

—এইসান তো হোতাই হ্যয়! কী বলতে চাইছিস তুই?

গন্ধার ওকে বুঝিয়ে বলে, গদির উপর উঠে বসার অধিকার যারা পায় তাদের সাতখুন মাপ। তোর উচিত হয়নি বউকে নিয়ে মহারানীর নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া।

—কেন? আমার কসুর কী হলো?

—খুবসুরৎ লেড়কিকে সাদি করা। যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে...

লাল সিং ওকে বললে ওর নতুন সমস্যার কথা। রাজবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর দলীপ ওর সঙ্গে বিছানায় শুতে নারাজ। সে বায়না ধরেছে তাকে অমৃতসরে নিয়ে যেতে হবে।

—তা হলে তাই যা—

—লেকিন আমার ছুট্টি পাওনা নেই যে।

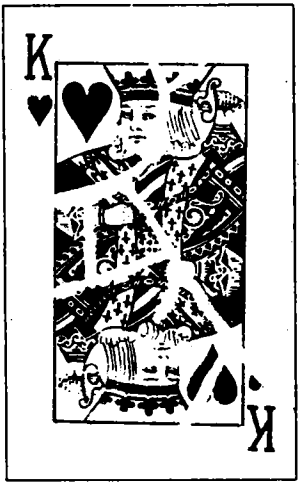
গন্ধার সিং অনেকক্ষণ দাড়ি চুমরালো। কীসব চিন্তা করল। তারপর বললে, ঠিক হ্যায়! ম্যায় লে যাউঙ্গা। ঘাবড়াও মৎ, দোস্ত! তেরা ভাবিজীভি যায়েঙ্গী।

গন্ধারের ঘরওয়ালী রুক্‌মিণীবাঈ অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছে। তাকে একবার তীর্থ করিয়ে আনতে হবে। সুতরাং সেই মতোই ব্যবস্থা হলো।

অমৃতসর এমন কিছু দূরের রাস্তা নয়। ট্রেনে চেপে রাতারাতি পাড়ি দেওয়া যায়। শিরহিন্দ্‌-লুধিয়ানা-জলন্ধর ব্যস্‌।

তিনটে জংশন স্টেশন পাড়ি দিলেই শিখধর্মের—কাশী-মক্কা : অমৃতসর। লাল সিং নিতান্ত বাল্যকালে একবার পিতাজীর হাত ধরে সেখানে গেছিল। আবছা মনে পড়ে। বড় হয়ে তার আর যাওয়া ঘটে ওঠেনি। তীর্থে সস্ত্রীক যাওয়াই বিধি, কিন্তু ফৌজী কানুন কি এই সহজ কথাটা বুঝবে? 'ছুট্টি নেই' অজুহাতে মরদ পড়ে রইল পাতিয়ালায়, আর বিবি চলল পরপুরুষের সঙ্গে অমৃতসর। অবশ্য রুক্‌মিণীদিদিও সঙ্গে আছে।





চতুর্থ শিখগুরু রামদাসজীর হাতে গড়ে উঠেছিল অমৃতসর শহর, ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে। তখন দিল্লীশ্বর শাহ্-এন-শাহ্ আকবর। শহরের প্রাণকেন্দ্রে যে প্রকাণ্ড তালাও সেটা গুরু রামদাসই খনন করান। সে আমলে শহরের নাম ছিল 'চক-রামদাস', শাদা বাঙলায় 'রামদাসনগর'। পঞ্চম গুরু অর্জুন—যিনি শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সংকলন শুরু করেন—তিনি ঐ পুষ্করিণীর কেন্দ্রস্থলে নির্মাণ করেন একটি অপূর্ব মন্দির। মন্দির বেষ্টিত তালাও-এর পানি অমৃততুল্য—তাই ওর নাম 'অমৃত সরোবর', যা থেকে কালে শহরের নাম হয়ে যায় অমৃতসর। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে দেহান্ত হলো সেই মহামানবের, যিনি 'দীন ইলাহী' ধর্ম প্রবর্তন করে এই দেশটাতে হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেহান্তে গদিতে চড়ে রাজ্যশাসনের প্রথম বৎসরই জাহাঙ্গীর শিখ জাগরণের আতঙ্কে মৃত্যুদণ্ড দিলেন গুরু অর্জুনের। পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দ তাতে দমলেন না আদৌ। অত্যাচারী ভারতশোষকের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেলেন। বার বার তিনবার পরাস্ত হলেন তিনি; কিন্তু আত্মসমর্পণ করলেন না; সন্ধির প্রতিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শাহজাহাঁর চতুর্থ পাঞ্জাব অভিযানকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করলেন ১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠা করলেন পঞ্জাবে শিখদের একচ্ছত্র প্রভাব। কিন্তু তবু শিখ-মুঘল সম্পর্কের তিক্ততার অবসান ঘটল না। মহামতি আকবরের উদারতা বা মানসিকতা ছিল না তাঁর পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য—খসরৌ বা দারাসুকো ভারতসম্রাট হতে পারেননি। গদি দখল করল ধর্মান্ধ আলমগীর! দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দজীর চার চারটি পুত্রের মৃত্যু হলো মুঘল বাহিনীর হাতে। তবু গুরু গোবিন্দ্ সেই ধর্মান্ধ আলমগীরকে জিজিয়া কর দিতে সম্মত হলেন না। দেনওনি জিন্দেগিভর।

১৭০৭ সালে ফৌৎ হলো হৃতসাম্রাজ্য ধর্মান্ধ ভারতশোষক আলমগীর। এবারও ঠিক পরের বছরই সিরহিন্দ নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ-নিযুক্ত গুপ্তঘাতক অতর্কিত আক্রমণে ছুরিকাবিদ্ধ করল গুরু গোবিন্দকে। পঞ্জাব থেকে অনেক দূরে—মহারাষ্ট্রে। পুরুষসিংহ গুরু গোবিন্দ্ আহত অবস্থাতেও শিরশ্ছেদ করেছিলেন তাঁর আততায়ীর; কিন্তু দুর্ঘটনার পর চতুর্থ দিন তাঁরও দেহান্ত হয়। তিনিই শেষ গুরু। ঐ গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ্ এই দশ গুরুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীই গ্রন্থসাহেব—যা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সুরক্ষিত। ১৭৬১ সালে আহ্মেদ শাহ্ আব্দালী অমৃতসর দখল করে এবং বিধর্মীর মন্দিরটি ধ্বংস করে। কিন্তু এক দশকের ভিতরেই আবার তা পুনর্নির্মাণ করা হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংজী নূতন করে গড়ে তোলেন বর্তমানে দৃষ্ট ত্রিতল মর্মরমন্দির। গম্বুজটি মুড়ে দেন

প্রথমে তামার পাতে, তার উপর সোনার পাত দিয়ে। মন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে অষ্টভুজাকৃতি বাবা-অটল স্তম্ভ—নয় তলা উঁচু। সরোবরের একান্তে 'অকাল তখৎ': দেবতার শাশ্বত আসন।

জানি আপনারা কী বলতে চাইছেন: ধান ভান্‌তে এ শিবের গীত কেন?

আজ্ঞে না, অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলিনি। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শত শত সহস্র সহস্র খালসা শিখের আত্মদাহনের এ কাহিনীটুকু প্রাসঙ্গিক। এই চালচিত্রের উপরেই না আমাকে গড়তে হবে বিংশ শতাব্দীর ঐ খলনায়ক—লাট বাহাদুরের পদলেহনকারী লালসাজর্জর অমানুষটার মূর্তি? ঠিক যেমন চাপেকার ব্রাদার্স থেকে গান্ধীজী, ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজীর পশ্চাদপটে বিচার করতে হবে আজকের দিনে আমাদেরই ভোটে নির্বাচিত ভারতশোষক এবং বঙ্গশোষকদের! ঐ যারা আজকের দিনে বলছে: এমনটা তো হয়েই থাকে!



অপরাহ্ণ পাঁচটা দশে ট্রেন। দিল্লী-অমৃতসর এক্সপ্রেস। কিন্তু 'অপরাহ্ণ' কথাটা শুধু খাতাকলমে। জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে, সূর্য যখন দক্ষিণায়নের শেষপ্রান্তে, তখন পাতিয়ালায় এই সময় সূর্যাস্তের পর ঘোর অন্ধকার। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া। বরফ পড়ছে না, এই যথেষ্ট। পাতিয়ালা স্টেশনে এখানে-ওখানে একপায়ে খাড়া গ্যাসবাতি পিট পিট করছে। আর জ্বলছে জোনাক পোকা। থোকা থোকা। দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেনটা দক্ষিণ দিক থেকে আসবে। দশ মিনিট দাঁড়াবে, জল খাবে ক্লান্ত ইঞ্জিনটা। তারপর ঐ যেদিকে অস্ত গেছে সূর্যটা সেই পশ্চিমমুখো দৌড়াতে শুরু করবে।

কথা ছিল গন্ধার সস্ত্রীক স্টেশনে পৌঁছাবে পৌনে পাঁচটার আগে। ওরা থাকে রেললাইনের ওধারে। লাল সিং-এর চকবাবা মহল্লাটা হচ্ছে রেলপথের দক্ষিণ পাড়ে। স্থির ছিল লাল তার ঘরওয়ালীকে নিয়ে একই সময়ে গিয়ে উপস্থিত হবে স্টেশনে—বড় ঘড়িটার তলায়।

কিন্তু ওদের এক্কাটা স্টেশন চত্বরের কাছাকাছি আসার পরেই কেমন যেন ঘাবড়ে গেল লাল। স্টেশনে এত পুলিস কেন? সেই বাংগালি দুশমনটা ধরা পড়ছে নাকি? পাতিয়ালা ইস্টিশনে?

হ্যাঁ, ডিসেম্বরের শেষাশেষি সেই দুঃসাহসী বাংগালি বিপ্লবীটার—যে নাকি দিল্লী দরবারের শোভাযাত্রায় বড়লাটকে হাতির পিঠে উল্টে ফেলেছিল—নামটাও জানা গেছে: চুন্দর দত্ত! এমন বিটকেল নাম বাংগালিদের হয় নাকি? —লাল সিং জানে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, সেই ছোকরার মাথার উপর এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে জীবিত অথবা মৃত। উনিশশ' তের সালের এক লক্ষ টাকা! তবু ছোকরা সি. আই. ডি.-র দৃষ্টি এড়িয়ে তামাম হিন্দুস্থাঁ দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

স্টেশন চত্বরে পৌঁছে শুনল—না, 'চুচুন্দর দত্ত' ধরা পড়ার জন্য এত পুলিস আসেনি ইস্টিশন চত্বরে। হেতুটা অন্য: হিজ হাইনেস মহারাজা অব পাতিয়ালা সস্ত্রীক অমৃতসরে যাচ্ছেন এই ট্রেনে—তীর্থদর্শনমানসে। বোধকরি এতাবৎকালের সঞ্চিত পাপ ঐ কুণ্ডে ধুয়ে ফেলতে। তাই মহারাজার স্পেশাল সেলুনটা ঐ মেলট্রেনের ল্যাজে বেঁধে দেওয়া হবে। বন্দুকধারী পুলিস এসেছে সাবধানতার কারণে। হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড মার্কুইস অব হার্ডিঞ্জ, গভর্নর-জেনারেল কাম ভাইসরয় অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, যদি হস্তিপৃষ্ঠে চিৎপটাং হতে পারেন তাহলে হিজ হাইনেসের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে বইকি!

কী সর্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয়! এ কী কাকতালীয় যোগাযোগ! লাল সিং ফিস্‌ফিস্‌ করে তার স্ত্রীর কানে কানে বললে, ঘুংঘট্‌টা লম্বা করে টেনে দে, কেউ না চিনতে পারে। ঐ দুশমনটাও এই ট্রেনে অমৃতসর যাচ্ছে। সস্ত্রীক! তবে বড়ি বহিন না আর কোনো মহারানী তা কেউ জানে না।

আতঙ্কিত দলীপ আকণ্ঠ ঘোমটায় মুখখানা ঢাকল। অস্ফুটে বললে, কাজ নেই তীর্থদর্শনে। চল ফিরে যাই!

—দূর পাগ্‌লি। শত শত লোক যাচ্ছে ট্রেনে। মহারাজা তোকে দেখতে পাবে থোড়াই। তোকে দোস্তের কাছে পৌঁছে দিয়েই আমি চুপিসাড়ে কেটে পড়ব। আমাকেও কেউ যেন না দেখতে পায়।

সেভাবেই অন্ধকারে গা ঢেকে পালিয়ে এসেছিল লাল সিং। স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে জিন্দ বাহিনীর থার্ড ব্যাটেলিয়ানের বিউগ্‌লদারকে নিশ্চয় কেউ চিনতে পারেনি, অথবা সাংরুর মহারানীর চাচেরা ভাইকে । তবু ....

☆ ☆



আদালতের নথীপত্র ঘেঁটে এবং হিজ হাইনেসের রোজনামচা নাড়াচাড়া করে প্রকৃত তথ্যটা এতদিন পরে আর উদ্ধার করতে পারিনি। তাই আপনাদের বলতে পারছি না যে এটা নিতান্তই একটা কাকতালীয় ঘটনা অথবা গন্ধার সিং-এর পৈশাচিক ষড়যন্ত্র। গন্ধার কি সব জেনেশুনে মহারাজ বাহাদুরের বাবুর্চির হাতে তুলে দিয়েছিল বনমুরগিটাকে? তিন তিনটি সূত্র খতিয়ে দেখেছি—সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।



জাস্টিস্ পাঠক আর জাস্টিস্ পাঠিকার ডিভিশন বেঞ্চের টেবিলে তিনটি এক্সিবিটই দাখিল করছি, হুজুর-হুজুরাইন দেখুন, আপনারা কী সিদ্ধান্তে আসেন।

প্রথমত হিজ হাইনেসের রোজনামচা। আজ্ঞে না, উনি নিজে কোনো দিনপঞ্জী রাখতেন না। ষোড়শ শতাব্দীর 'আকবরনামা' আর দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'র অনুকরণে বিংশ শতাব্দীর ঐ মহারাজাধিরাজ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সংকলনের উদ্দেশ্যে এক বেতনভুক ঐতিহাসিককে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই রোজনামচা পাঠে জানা যায় যে উনিশ শ' তেরর জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে মহারাজ সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে অমৃতসরে গিয়েছিলেন। মন্দির চত্বরে নিতান্ত ঘটনাচক্রে সাংরুর মহারানীর ভাই লাল সিং এবং তদীয় পত্নী দলীপের সঙ্গে রাজপরিবারের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মহারানীর নির্বন্ধাতিশয্যে ওরা দুজন ধরমশালার আশ্রয় ত্যাগ করে মহারাজের অমৃতসর অতিথিশালায় এসে আশ্রয় নেয়।

এ তথ্যটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। লাল সিং যে ঐ সময় আদৌ অমৃতসরে যায়নি এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

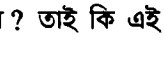
গন্ধার সিং ফিরে এসে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল তা এই রকম: স্বর্ণমন্দিরে আচমকা ওরা তিনজন মহারাজের মুখোমুখি পড়ে যায়। সাংরুর মহারানী আদৌ অমৃতসরে যাননি। মহারাজের কোনো পত্নী বা উপপত্নী সঙ্গে ছিল কি না তা গন্ধার জানে না। কিন্তু মহারাজ ওদের দুজনকেই চিনতে পারেন। গন্ধার সিংকে মহারাজ চিনতেন, আর দলীপকে তো বটেই। মহারাজ ওদের দুজনকে তাঁর তীর্থাবাসে ডেকে পাঠান। গন্ধারকে মহারাজ বলেন যে, মহারানী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন দলীপ অমৃতসরের রাজপ্রাসাদে থাকবে, অতিথিশালায় নয়। গন্ধার কী বলতে পারে? অভিবাদন করে পিছু হটে ফিরে এসেছিল। দলীপ তারপর থেকে রাজাবরোধে।

তৃতীয় একটা সূত্র থেকেও এ ঘটনার উপর কিছুটা আলোকপাত করা যায়। হত্যা মামলার নথী হিসাবে ডিফেন্স কাউন্সেল একটি ডায়েরি দাখিল করেন। তার লেখক পাতিয়ালা রাজএস্টেটের সুপারিন্টেন্ডন্ট অব পুলিস: সর্দার নানক সিং। লোকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি কালানুক্রমিক দলিল—দৈনিক লেখা

দিনপঞ্জিকা—রেখে গেছিল, যার ফলাফল অতি মারাত্মক!

উনিশশ' তের সালে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সর্দার নানক সিং তার রোজনামচায়—খেয়াল রাখতে হবে এটি অফিশিয়াল ডায়েরি নয়, তার ব্যক্তিগত দিনপঞ্জিকা—যা লিখেছে তার আক্ষরিক অনুবাদ:

> "চক্‌বিন্ধেশরী মহল্লার গন্ধার সিং লোকটা দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লুধিয়ানায় ক্ষেত্রী সিঙের বাড়ির ডাকাতি আর ডেরাবাবা নানকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লোকটা যে জড়িত এটা সন্দেহের অতীত। তবু দেওয়ানজী ওকে গ্রেপ্তার করতে রাজী নন। মনে হয়, মহারাজা সব জেনে-বুঝেই ওকে ক্ষমা করেছেন। কেন? যেহেতু ঐ গন্ধার সিং লোকটা ফাঁদ পেতে সাংরুর মহারানীর ভাইবৌকে সোনার খাঁচায় পুরে ফেলল? তাই কি এই পুরস্কার?"



লাল সিং এ দুর্ঘটনার কথা জানতে পারে অনেক পরে। গন্ধার সিং যখন সস্ত্রীক ফিরে আসে পাতিয়ালায়। তার পূর্বেই লালের জীবনে ঘটে যায় একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা। দলীপ অমৃতসরে রওনা হয়ে যাবার দুদিন পরেই। কোথাও কিছু নেই আসমান ফুঁড়ে এসে গেল এক ফৌজী অর্ডার। জিন্দ্ আর্মির থার্ড ব্যাটেলিয়ানের বিউগ্‌ল-বাদক লাল সিংকে কমিশনড অফিসারের র‍্যাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে। লাল সিং অতঃপর পাতিয়ালা রাজস্টেটের লুধিয়ানা বাহিনীর ক্যাপ্টেন!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বিউগ্‌ল-বাদক হচ্ছে খিদ্‌মদ্‌গার শ্রেণীর—আর্দালী, পিয়ন, ঝাড়ুদার, সহিস, রসুইখানার মেহনতী মানুষের সমতুল্য। সচরাচর-লান্স নায়কদের অধীনে। লান্স-নায়কদের উপর ফার্স্ট লেফটানেন্ট, সেকেন্ড লেফটানেন্ট। ক্যাপ্টেন তাদেরও উপর। ব্রিটিশ আর্মিতে এমন আজব পদোন্নতি আদৌ ঘটে না। রাজা-নবাবদের নিজস্ব আর্মিতে তা কালে-ভদ্রে ঘটে। সবাই এককথায় মেনে নিল অবাস্তব ঘটনাটা। লাল সিং হচ্ছে হোম সেক্রেটারির ভাতিজা, পাটরানী সাংরুর মহারানীর ছোট ভাই।

এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা!

খুব অল্পসংখ্যক কয়েকজন—যেমন বটুক বা গন্ধার, মোতিলাল বা নানক সিং সমঝে নিল আসল হেতু: লাল সিং হচ্ছে দলীপ কৌরের মরদ।

লালকে তিন সপ্তাহের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হলো। লাল তার চকবাবা মহল্লার বাড়িতে তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল। প্রতিবেশী জীবনলালের হাতে রেখে গেল সদরের চাবি, যাতে গন্ধারের সঙ্গে দলীপ ফিরে এলে বাড়িতে ঢুকতে অসুবিধা না হয়। লালের প্রমোশনের খবরে জীবনলাল বহুৎ বহুৎ বধাই জানালো। দলীপের চন্দনা পাখিটার দায়িত্বও নিল তার বউ। যে কদিন দলীপ ফিরে না আসছে ততদিন চন্দনাটাকে দানাপানি খাওয়াবে। পাখিটা দু-একটা বোল শিখেছে এত দিনে: "রাম,

রাম!'' ''ধুন গুরু রামদাস।''

দলীপের খুব প্রিয় ছিল ঐ চন্দনা পাখিটা।

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি। দেড় বছর পরের কথা। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফার্ডিনান্ডকে সার্বিয়ায় বেমক্কা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি মিলিতভাবে আক্রমণ করল সার্বিয়াকে, রাশিয়া এসে দাঁড়ালো সার্বিয়ার পিছনে। তিল তিল করে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি দুইদলে বিভক্ত হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। একপক্ষে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুর্কি আর অপরপক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালি। আমেরিকা তখনো রণাঙ্গনে নামেনি।

ইংরেজকে সাহায্য করতে যাবতীয় ভারতীয় রাজন্যবর্গ এগিয়ে এলেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ইংরাজ-সহায়ক হচ্ছেন পাতিয়ালার মহারাজ। তখন তিনি ক্ষমতার তুঙ্গে। প্রজাদের হাতে মাথা কাটছেন: রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে তাঁকে, সৈন্য সংগ্রহ মানসে। মাঝে মাঝেই হাজিরা দিতে হচ্ছে নয়া দিল্লীতে ওয়ার কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে। মাসের মধ্যে সাতটা দিনও পাতিয়ালা-প্রাসাদে থাকার সুযোগ হয় না। ফলে বাৎস্যায়নের ঐ সমদর্শিতার প্রত্যাদেশ ঠিক মতো মেনে চলা সম্ভবপর হচ্ছে না। বটুকেন্দ্রনাথ আর মোতিলালজীর কাছে আসে না অঙ্গুরীয়র কাসকেট চাইতে। মহারাজ যে কটা রাত পাতিয়ালা-প্রাসাদে কাটান সেই কটা রাত তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ঐ সদ্যসংগৃহীত নয়া চিড়িয়া, দীর্ঘাঙ্গিনী যৌবনবতী বেহেস্তী হুরী দলীপ কৌর!

এগারোই মে' ১৯১৫—ঠিক যেদিন আম্বালা জেলে লাহোর কন্সপিরেসি কেস-এর চার আসামীর ফাঁসী হলো: আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধ আর বসন্ত বিশ্বাস; প্রতিবাদে বালমুকুন্দের স্ত্রী রামরাখী আমরণ অনশন শুরু করল—ঠিক সেদিনই রাজবাড়ির ভিতর একটা বিশ্রী ঝামেলা বাধল। দলীপ কৌরের কন্যার জন্ম উপলক্ষে।

দলীপ এতদিনে সম্ভবত বদলে গেছে, পোষ মেনেছে। ঠিক জানি না। জানার কোনও উপায় নেই। দলীপ তো কোনও দিনপঞ্জিকা রেখে যায়নি। কিংবা সে তো সাক্ষীর মঞ্চে উঠে হলপ নিয়ে তার কাহিনী শোনাবার অবকাশ পায়নি। মহারাজার বেতনভুক ঐতিহাসিক যা লিখে গেছেন সেটাই আমার তথ্যের উৎস। তাই পেশ করি আপনাদের খিদ্‌মতে।

দলীপের কন্যা কি বেজন্মা? কোন হারামজাদার ঘাড়ে কটা মাথা যে, ও কথা বলে? বিবাহিতা রমণীর সন্তান বেজন্মা হলেই হলো? মোটকথা ওর কন্যা-সন্তান জন্মানোতে মহারাজা একটা ছোট-খাটো ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করলেন। রাজাবরোধে কাওয়ালী-গানের জলসা আর মিঠাই বিতরণ। নিমন্ত্রণ প্রাসাদের বাইরের কারও নয়।

বোধ করি চক্ষুলজ্জায়।

দলীপ বাস করত প্রাসাদ-অভ্যন্তরে নবনির্মিত একটি হাবেলিতে। রাজাসাহেবের খাশমহলের সংলগ্ন একটি বৃহৎ কক্ষে। এখন সেখানেও টাঙানো হয়েছে স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্খলের ঝুলা, বসানো হয়েছে কৃত্রিম ফোয়ারা। তিনরানীর সঙ্গে দলীপের দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হতো না। মহারাজের অন্যান্য উপপত্নীদের জন্য প্রাসাদের একান্তে ছিল কস্‌বি-হাবেলি। দলীপ যেহেতু পেয়ারের উপপত্নী, তাই সে কস্‌বি-হাবেলিতে থাকত না।

দলীপের খাশদাসী তিন রানীকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ জানাতে এল। মেজ এবং ছোটরানী নেওতা নিলেন, না নিলেন না, ঠিক মালুম হলো না। মেজরানী মুখঝাম্‌টা দিয়ে শুধু বললেন: ফুঃ! আর ছোটরাণী একটা গ্রাম্য পাঞ্জাবী ছড়া শুনিয়ে দিলেন আকাশপানে মুখ করে। ভাবার্থে তার বঙ্গানুবাদ "কালে কালে কতই হলো। পুলিপিঠের লেজ বেরুলো" অথবা "দেখছি কত, দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!"

খাশদাসী প্রত্যুত্তর করেনি। সেলাম বাজিয়ে পিছু হটে চলে এসেছিল। গোল বাধল পাটরানী 'হীরেমন'-এর বেলায়। সাংরুর মহারানী তখন চুল বাঁধছিলেন, খাশকামরা-সংলগ্ন শ্বেতপাথরের অলিন্দে। পাঁচ দাসী তাঁর কেশচর্চা করছিল রানীকে ঘিরে। দলীপের খাশদাসী যখন নিমন্ত্রণপত্রটা রূপার থালায় দাখিল করল তখন সাংরুর মহারানী হঠাৎ বলে ওঠেন: ওমা! দলীপ কৌরের একটি লেড়কি হয়েছে নাকি? আমি তো জানি না! তোরা তো বলিসনি কিছু.....

সহচরীদের ছদ্মতাড়না করলেন উনি। তারা দোপাট্টায় মুখ ঢাকল হাসি লুকাতে। দলীপের গর্ভলক্ষণ থেকে সন্তানজন্ম নিয়ে অনেক অনেক রসিকতাই হয়ে গেছে এ মহলে। মহারাণী দূতীকে বললেন, বড় আনন্দের কথা শোনালি। ওরে কে আছিস....ওকে একটু মিষ্টিমুখ করা.....তা, হ্যাঁ-গো মেয়ে, কাওয়ালী আসরে ঐ মেয়েটার বাপের নেওতা হয়েছে তো?

খাশদাসী কী বলবে? তার চতুর্দিকে সবাই দোপাট্টায় মুখ লুকিয়ে হাসছে। আমতা-আমতা করে বলে, কার কথা বলছেন, রানীমা?

—ওমা, আমি কোথায় যাব! তুই দলীপ কৌরের কথা বলছিস তো? ঐ যে কস্‌বিটা মহারাজার খাশকামরার পাশের ঘরে থাকে? তার তো একটাই খসম্? ক্যাপ্টেন লাল সিং। তাই না? দলীপ তো তারই ঔরৎ?

খাশদাসী কোনো জবাব দেয়নি। ইতিমধ্যে একটি সহচরী একথালা মিষ্টান্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। তাকে উপেক্ষা করে খাশদাসী ফিরে এসেছিল দলীপের কামরায়।

দলীপ সব কথা শুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। পরমুহূর্তেই সে শান্তভাবে গিয়ে দেখা করে সাংরুর মহারানীর সঙ্গে। তখনো তিনি সহচরী পরিবেষ্টিতা। হাসি-মশকরার রেশ তখনো চলছে। রাজপ্রাসাদে বন্দিনী হবার পর দলীপ কখনো এই মহলে আর পদার্পণ করেনি, সাংরুরও যাননি ওর তত্ত্বতল্লা নিতে। দলীপকে

এগিয়ে আসতে দেখে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। দলীপ স্পষ্টভাষে বলে, দিদি! আমার খাশদাসীকে আপনি কিছু মিষ্টি খাওয়াতে চেয়েছিলেন, বোকা মেয়েটা তা না খেয়ে চলে গেছে। তাই আমি নিজেই মিঠাই খেতে চলে এলাম। কই, মিঠাই কই?

মহারানী বাঁকা হেসে বলেন, মিঠাই তোর গলা দিয়ে গলবে তো, দলীপ? আটকে যাবে না?

দলীপ বলল, ওমা আমি কোথায় যাব? দিদির দেওয়া মিষ্টি ছোটবোনের গলায় গলবে না? কেন?

—কারণ দিদি আর ভাইবৌয়ের সম্পর্কটা যে এখন আর নেই, দলীপ। তুই আমার মরদকে দখল করতে চাইছিস! তা বেশ! রাজাসাহেব যতদিন চাইবেন তুই এই রাজবাড়িতে থাকতে পারিস! লেকিন য়্যাদ রাখিস, ''রানী'' পরিচয়ে নয়! 'রখেল' পরিচয়ে! ঘরওয়ালীর পরিচয় নয়, 'কসবি' পরিচয়ে! বুঝলি? আর একটা কথা! তুই আমাকে 'দিদি' বলে ডাকবি না কোনোদিন এর পর থেকে।

দলীপ অদ্ভুত হাসল। বললে, তাই হবে, রানীমা। বাৎ তো সহি হ্যয়। আমি তো আর এখন আপনার ভাই-বৌ নই। তবে একটা কথা, রানীমা। আপনিও অমন আকাশপানে মুখ করে থুক্ ছিটাবেন না!

—কী! কী বল্লি?

—জী হ্যাঁ! য়্যে-ভি সহি বাৎ! সোচ লিজিয়ে—আমি 'কসবিও' নই, 'রখেল'-ও নই। বন্দিনী নারী মাত্র। অশোকবনের সীতামাঈ কি ছিলেন রাবণরাজার 'রখেল'?

—চুপ যা বেয়াদব! সীতামাঈর পেটে কি.....

—জী হাঁ! বহ্ ভি সহি বাৎ! লেকিন কেঁও? যেহেতু মন্দোদরী ঐ দানবটাকে তৃপ্ত রাখতে পেরেছিল, আর আপনারা তিন বিবি মিলে এই দানবাকৃতি মানুষটাকে তৃপ্তি দিতে পারেননি। তাই সেই অতৃপ্ত মানুষটা আজ চরিত্রহীন, লম্পট! তাই আজ সে অন্য নারীর কাছে ভিখারীর মতো হাত পাতে! তাই না রানীমা? ভুল বলছি কি কিছু?

সাংরুর মহারানীর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কোনো মর-মানুষ—যার ঘাড়ে একটি-বৈ মাথা নেই— সে পাতিয়ালার মহামহিম মহারাজকে চরিত্রহীন, লম্পট, ভিখারী বলবার সাহস রাখে, এ যে চিন্তাই করা যায় না!

—এখন তো আপনার অখণ্ড অবকাশ, রানীমা। কী আপ্‌শোসের কথা! মরদ আপনাকে ছোঁয় না। যে কথা কটা বলে গেলাম তা বিচার করে দেখবেন। আমাকে 'কসবি' গাল পেড়ে আপনি অপমান করছেন কাকে? আপনার খসম্‌কেই। তাই নয়? আপনারও তো একটা-বৈ খসম্ নেই!

মহারানীর তখনো বাক্যস্ফূর্তি হয়নি। দলীপ হেলতে দুলতে গজেন্দ্রাণী ঠমকে নিজের হাবেলিতে ফিরে এসেছিল।

রাত্রে দলীপের কাছে আদ্যোপান্ত শুনে মহারাজ ঠা-ঠা করে হাসলেন: কী

বলেছিস তুই সাংরুর মহারানীকে?.....ওরা তিনজনে মিলে এই দানবাকৃতি মানুষটাকে.....ও হো.....হো....

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিল দলীপ। বলেছিল, শুনুন মহারাজ। দু-দুটি বিকল্প সমাধান আছে। আপনি বেছে নিন। হয় আমাকে আনুষ্ঠানিক বিবাহ করুন—'রখেল' নয়, রানীর পরিচয়ে এখানে থাকব আমি, নচেৎ আমাকে মুক্তি দিন। আমি মেয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাই।

—কোথায় যাবি তুই? লাল সিং এখন আর তোকে নেবে?

—সেটা আপনার বিবেচ্য নয়, আমার।

—আর আমি যদি ঐ দুটি বিকল্প পথের কোনোটাই বেছে না নিই?

—তাহলে আমি নিজেই নিজের পথ করে নেব। আপনার নাগালের বাইরে চলে যাব।

—পারবি? তোর হিম্মতে কুলাবে?

—পারব, মহারাজ! তিন তিনটে সাদি করার পর মহারাজের যদি চতুর্থবার সাদি করার হিম্মৎ না থাকে তাহলে ওটুকু আমার হিম্মতে কুলাবে।

—বটে! তবে তাই যা! দেখি তোর হিম্মৎ।

—তার মানে আপনি স্বীকার করছেন, চতুর্থবার সাদি করার হিম্মৎ আপনার নেই!

মহারাজ কামদার উপাধানটা বগলে নিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন। এ কথায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, হিসাব করে কথা বলতে শেখ,দলীপ! তার মানে আমি বলতে চাইছি, আমার কব্জা থেকে পালাবার ক্ষমতা তোর নেই।

হাসল দলীপ। বললে, মহারাজ! আপনি খালসা শিখ হয়ে এটুকু জানেন না যে, মৃত্যুকে যে পরোয়া করে না, তার শুধু উপর অত্যাচারই করা যায়, তার ধর্ম নষ্ট করা যায় না? আপনি আমার হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে পাঁচ-সাত-দশ রাত আমার উপর বলাৎকার করতে পারেন। হাঁ, ম্যয়নে মানলি। সাদি করার হিম্মৎ না থাকলেও সে ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু তারপর? আমি তো প্রথম সুযোগেই নিজের গলায় ছুরি বসাবো! কেমন করে ঠেকাবেন আপনি অথবা আপনার বাহিনী? মুক্তি তো আমার মুঠোয়।

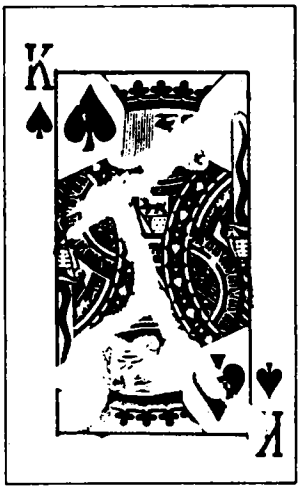
দুরন্ত ক্রোধে মহারাজ ওর গালে চপেটাঘাত করলেন। তিন রানীর মধ্যে যে কেউ হলে উল্টে পড়ত। দলীপও ভারসাম্যচ্যুত হলো। কিন্তু ভূতলশায়ী হলো না। একটা টাল সামলে আবার খাড়া হলো। আশ্চর্য! হঠাৎ কোথাও কিচ্ছু নেই, খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল দুঃসাহসিকা। বললে, আসলে চড়টা কিন্তু আপনি নিজের গালেই মেরেছেন মহারাজ—কারণ বিপুল বৈভবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, একটি বিবাহিতা রমণীকে বিবাহ করার ক্ষমতা এবং হিম্মৎ আপনার নেই।

মহারাজ সিংহের মতো লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন পালঙ্ক থেকে। কিন্তু তাঁর উদ্যত বাহু ধীরে ধীরে নেমে এল। দ্বিতীয়বার ওকে তিনি আঘাত করেননি। ক্ষিপ্ত

মহিষের মতো কক্ষান্তরে চলে গিয়েছিলেন।

পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে দলীপ বসল তার বাচ্চাটাকে স্তন্যদান করতে। যে মেয়ে আইনত বেজন্মা নয়, শুধু লোকচক্ষুতে তাই! এবং যে বেজন্মা মেয়ের মা 'কস্‌বি' নয়, 'রখেল' নয়, অশোকবনে বন্দিনী সীতামাঈর মতো হতভাগিনী মাত্র।





আগন্তুক লোকটার কাঁধে সনাক্তিকরণচিহ্নে বোঝা যায় ও র‍্যাঙ্কে ক্যাপ্টেন। পাঙ্খাপুলার— সেও ফৌজী জওয়ান— টুল ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। ফৌজী স্যালুট করল।

লাল সিং জানতে চাইল, দেওয়ানজী কি ঘরে একা আছেন?

—জী হাঁ, লেকিন এখন মুলাকাৎ হবে না; কারণ উনি বলে রেখেছেন ওঁকে বিরক্ত না করতে। আপনি পরে আসবেন, স্যার।

লাল সিং বললে, তুমি একটু ভুল করছ। আমি কোনও আর্জি নিয়ে দেওয়ানজীর দরবারে আসিনি। উনি আমাকে তলব করেছেন। আমি তাঁর হুকুম তামিল করতেই সামিল হয়েছি। তুমি ভিতরে গিয়ে শুধু খবরটা দাও। বল, আমার নাম ক্যাপ্টেন লাল সিং। ওঁর যদি সময় না থাকে তাহলে আমি ফিরে যাব।

নির্দেশ মতো খিদ্‌মদ্‌গার ভিতরে গেল এবং পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে পর্দাটা উঁচু করে ধরে বললে, যাইয়ে ভিতর।

লাল সিং দেওয়ানজীর খাশকামরায় প্রবেশ করল। প্রকাণ্ড কামরা। দেওয়াল থেকে দেওয়াল কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড শ্যাণ্ডেলিয়ার। তার নিচে মানানসই বিরাট চিপেন্ডেল টেবিল। গদি আঁটা খাড়াপিঠ চেয়ারে বসে আছেন পাতিয়ালা স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী মহিমার্ণব রাজা শ্রীদয়াকিষেণ-কৌল, দেওয়ানজী। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। পূর্ববর্তী রাজার আমল থেকে তিনি এ রাজ্যের কর্ণধার। বর্তমান মহারাজাও তাঁকে সমীহ করে চলেন। মাথায়—উষ্ণীষ, তাতে একটা মুক্তোর ছড়া লটকানো, পরিধানে দুগ্ধশুভ্র চুস্ত্ শেরওয়ানি। গোঁফের প্রান্ত দুটি মোম দিয়ে পাকানো। কাঁচা পাকা দাড়ি। চোখে রিমলেস্ চশমা।

লাল সিং সামনে এসে দাঁড়ালো। বুট জুতোর নালে-নালে খট্ করে শব্দ হলো। ফৌজী স্যালুট করল লাল সিং। এক বছরের ট্রেনিঙে সে অনেক কিছু শিখেছে—এমন কি বিলাতী এটিকেট, অংরেজি লব্‌জও দু-দশটা।

—তোমার নাম ক্যাপ্টেন লাল সিং?

—ইয়েস, য়োর অনার।

—হোম সেক্রেটারি সর্দার গুর্নাম সিং তোমার চাচা?

—ইয়েস, য়োর অনার।

—বছর দেড়েক আগে তুমি জিন্দ্ আর্মির থার্ড ব্যাটেলিয়ানের বিউগ্‌লদার ছিলে, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ছিলাম।

চশমাজোড়া খুলে উনি টেবিলের উপর রাখলেন। বিচিত্র হেসে বললেন, আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পার, ক্যাপ্টেন লাল সিং? কী কারণে তুমি এমন তিন-চার ধাপ ডিঙিয়ে প্রমোশন পেয়েছিলে?

লাল সিং একজোড়া জ্বলন্ত চোখ মেলে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকল। দেওয়ানজী ওকে বসতে বলেননি। এখনো সে অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে আছে, 'অ্যাট-ইজ' হয়নি।

—কী হলো? জবাব দাও?

লাল সিং বললে, ফৌজী হুকুমতে 'কারণ' খোঁজার রেওয়াজ নেই,দেওয়ানজী। আমরা হুকুম পাই, তামিল করি। এটাই ফৌজী কানুন।

—আই সী! সিট ডাউন।

—বসব? আপনার সামনে? কী দরকার, য়োর অনার? কী অর্ডার আছে হুকুম করুন, তামিল করব।

—আই সে, সিট ডাউন।

লাল 'অ্যাট-ইজ' হলো। আল্‌তো করে ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারের একান্তে বসে পড়ল। দেওয়ানজী চশমাজোড়া পুনরায় স্বস্থানে বসিয়ে বললেন, অর্ডারেই যদি কাজ হতো তাহলে তোমাকে ডেকে পাঠাব কেন, ক্যাপ্টেন? এটা অর্ডার নয়, একটা রিকোয়েস্ট,রাখবে?

এক লহমা দেরি হলো জবাবটা দিতে: কার?

—ধর, আমার?

—বলুন?

—তুমি দলীপ কৌরকে তালাক দিয়ে দাও।

লাল উঠে দাঁড়ালো আবার। বললে, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি মুসলমান নই, খালসা শিখ।

—সিট ডাউন, ক্যাপ্টেন!

লাল সিং পুনরায় চেয়ারে বসে পড়ল।

দেওয়ানজী বললেন, সে জন্য তুমি চিন্তা কর না। সে দায় আমার। আই মীন স্টেটের। এই কাগজটা দেখ— ওটায় জনৈক ক্যাপ্টেন লাল সিং গুরুদ্বারে আবেদন করছে যে, তার স্ত্রী দলীপ কৌর তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এজন্য সে বিবাহবিচ্ছেদ প্রার্থনা করছে। বাদ-বাকি দায়দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু সইটা দেবে।

লাল সিং কাগজখানার উপর চোখ বুলিয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে কাগজখানা ওঁর টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললে, আয়াম সরি, স্যার। এ তো জলজ্যান্ত মিছে কথা। দলীপ কৌর আমাকে আদৌ ত্যাগ করে যায়নি। তাকে এ রাজ্যের একজন অত্যন্ত ক্ষমতাবান পুরুষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েদ করে রেখেছেন। কেন, আপনি জানেন না?

দেওয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠেন, বি প্র্যাক্‌টিকাল, ক্যাপ্টেন! তুমি কি বুঝতে

পার না যে, মহারাজ তাকে কোনোদিনই মুক্তি দেবেন না? তাহলে এভাবে অহেতুক জিদ্দিবাজি করছ কেন?

লাল সিং বললে, বিবাহবিচ্ছেদের একটা আবেদনপত্র পেলেই যদি গুরুদ্বার থেকে তা অনুমোদন করিয়ে আনতে পারেন তাহলে ওকেই বা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে বলছেন না কেন? ও তো আনপড় নয়? সেও তো দরখাস্ত করতে পারে যে, তার স্বামী দেড়বছর আগে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে.....

—তোমার পরামর্শ আমরা চাইছি না লাল সিং, চাইছি স্বাক্ষর!

—তার মানে বোঝা যাচ্ছে দলীপ এমন স্বাক্ষর দিতে স্বীকৃত হয়নি।

—যদি তাই হয়.....

—যদি তাই হয়, তাহলে আপনারা কী করে এটা আশা করেন,স্যার? একটা বন্দিনী মেয়ে, যাকে মেরে মেরে হাড্ডিচুর করে দেবার ক্ষমতা আপনাদের আছে—হয়তো দিচ্ছেনও—তাকে রাজী করাতে পারলেন না, আর তার স্বামী মুক্ত পৃথিবীতে.....

বাধা দিয়ে দেওয়ানজী বলে ওঠেন, তুমি ভুল করছ, ক্যাপ্টেন। দলীপের কাছে এমন প্রস্তাব আদৌ রাখা হয়নি।

—তার মানে, আপনাদের আশঙ্কা যে, দলীপকে দিয়ে যদি আবেদনপত্র লিখিয়ে দাখিল করেন, এবং আমি যদি তাতে আপত্তি করি তাহলে গুরুদ্বারে আপনারা অনুমতি পাবেন না। তাই কি, স্যার?

দেওয়ানজী এ কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথার অবতারণা করেন। তুমি কি জান ক্যাপ্টেন লাল সিং যে, ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের ভেতর দলীপ কৌরের একটি কন্যাসন্তান হয়েছে?

লাল তা জানত না। তবু সপ্রতিভের মতো বললে, কাকে কী বলছেন, স্যার? দলীপ আমার স্ত্রী। তার সন্তান তো আইনত আমারই সন্তান! আমি জানব না?

দেওয়ানজী চাপা গর্জন করে ওঠেন, তুমি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছ ক্যাপ্টেন!

লাল সিং নীরব রইল।

ওর মৌনতাকে ভুল বুঝলেন দেওয়ানজী। বললেন, অহেতুক জিদ্দিবাজী করে লাভ নেই। নগদ কত টাকা পেলে তুমি রাজি হবে আমাকে বল। ভয় নেই.....

—টাকা? টাকার কথা তো ওঠেনি, য়োর অনার...

—এখন উঠছে। বল! শুনেছি তোমার ঘরওয়ালী বেশ গতরে-সতরে! তার দেহের ওজনের সমান পাকা-সোনা নিশ্চয় চাইবে না তুমি।

লাল সিং স্থির দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওঁর দিকে। দেওয়ান দয়াকিষেণ কৌলও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। রাজনীতি করেই মাথার চুল পাকিয়েছেন তিনি। বাকযুদ্ধে হার মানেননি কখনো। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বলেন, কী হলো? হ্যাঁ, না, কিছু একটা বল? এবার তো তোমার 'চাল'। তুমি নির্ভয়ে খোলাখুলি বলতে পার।

লাল সিং বললে, আপনি খোলাখুলি আলোচনার অনুমতি দিচ্ছেন?

—ইয়েস, ইয়ং ম্যান! বল, কী চাও, কী ভাবে চাও?

—প্রথমে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, য়োর অনার। খোলাখুলি প্রশ্ন। আপনি অনুমতি দিচ্ছেন।

—ইয়েস, ইয়েস, বল? এত ইতস্তত করছ কেন?

—আমি শুনেছি, এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আপনি তৃতীয় বার বিবাহ করেছেন। আপনার স্ত্রীর বয়স উনিশ-কুড়ি এবং তিনি বেশ গতরে-সতরে। এ কথা সত্যি?

দেওয়ানজী বজ্রাহত হয়ে গেলেন ওর দুঃসাহসে। লাল সিং একনিশ্বাসে বলে চলে, কাল যদি মহারাজ বলেন যে, তিনি আপনার তৃতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তাহলে স্ত্রীর ওজনে সোনা মেপে নিয়ে আপনি কি.....

দেওয়ানজী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন: হাউ ডেয়ার য়ু.....

—বাই ভার্চু অব য়োর কাইন্ড পার্মিশন, য়োর অনার। আপনি খোলাখুলি আলোচনার অনুমতি দিয়েছিলেন বলেই.....

—য়ু মে ক্লিয়ার আউট!

লাল সিং কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জুতোর নালে নালে আবার ক্লিক্ করে শব্দ হয়। ফৌজী স্যালুট সেরে সে অ্যাবাউট টার্ন করে।

আজ্ঞে না, এ তথ্য ঔপন্যাসিকের কল্পনা নয়। সর্দার নানক সিং-এর যে দিনপঞ্জিকার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি সেখান থেকে এ তথ্য সংগৃহীত। সর্দার নানক সিং লিখছে: "Dewanji ordered Lall Singh to meet him in his office and then asked him to divorce his wife Dalip. But Lall Singh asked Dewan-Sahib if next day the Maharaja fell in love with Dewanji's wife, would he agree to divorce his wife? Dewan Sahib had no pat reply."

ব্যাপারটা ওখানেই থামল না কিন্তু। বিশ্বযুদ্ধ চলেছে য়ুরোপ জুড়ে। কিন্তু পাতিয়ালা-প্রাসাদের ভিতর কী জাতের যুদ্ধ চলছিল তার খবর পাওয়া যায় না। এরপর সর্দার নানক সিং তার দিনপঞ্জিকায় যা লিখেছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য:

"When all attempts failed to get a divorce from Lall Singh, the Maharaja thought that there was no other course but to marry the girl. Accordingly, a marriage ceremony was performed and thus without getting a divorce and without the tacit consent of Lall Singh, Dalip Kaur, his legal wife, was made a Maharani."

দেশের শাসক—তা তিনি রিগিং-ছাপ্পাভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন, অথবা বংশপরম্পরায় দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতাই হন — যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তিনি একটি বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না? এ কেমন কথা? এমন তো কতই হয়েছে ইতিহাসে! এমন তো আজও.....

☆ ☆

ভুল বুঝবেন না আমাকে। এ কাহিনী লালসাজর্জর এক মদগর্বী মহারাজার একার নয়, এ কাহিনী দলীপ কৌরের, এ কাহিনী লাল সিং-এর। দলীপ মহারাজার দু-দুটি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে বটে কিন্তু রক্ষিতা হিসাবে বন্দিনী না থাকার প্রতিজ্ঞাকে সে রক্ষা করেছে। সাংরুর মহারানীর বিদ্রূপে সে যেভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার মতো বন্দিনী নারীর পক্ষে সেটাও বিস্ময়কর। তার চেয়েও বড় কথা সে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে কিছুতেই স্বীকৃত হয়নি। তার ছিল একটাই জবাব: লাল সিং তো আমার প্রতি কোনো অন্যায় করেনি। তার বিরুদ্ধে গুরুদ্বারে বা ধর্মাধিকরণে আমি আবেদন করতে যাব কেন? আদরে-সোহাগে বা অত্যাচারে তাকে টলানো যায়নি। মহারাজের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে সে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু অন্যায় আবেদনপত্রে স্বাক্ষরে তাকে বাধ্য করা যায়নি। আমি সেই নির্যাতিতা বিদ্রোহিণীর কাহিনীই শোনাতে বসেছি, তার অত্যাচারীর নয়।

একই কথা লাল সিং সম্বন্ধেও।

দেওয়ানজীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর সে ফৌজী-নোকরি থেকে পদত্যাগ করে। সোনা দিয়ে ওজন করার প্রস্তাবটা বাস্তব না ঔপন্যাসিক সত্য জানি না; কিন্তু লাহোরের অ্যাডভোকেট তাঁর Famous Trials for Love and Murder গ্রন্থে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে লাহোরে বসে লিখেছিলেন:

"Lall singh, backed by Gurnam Singh, refused to besmirch the honour of Sangrur by firmly and resolutely declining to release his wife or accept her weight in gold. To all pressure he demurred and preferred to carry back to *Raju Mazaraya,* his native village, a fond bundle of adultery."

লাল সিং তার গ্রাম রাজু মাজারায়ায় ফিরে গেল। কিছু জমিজমা ছিল তার। পৈত্রিক সম্পত্তি। এতদিন ভাগচাষে ছিল। এখন নিজেই দেখভাল শুরু করে দিল। গুর্নাম সিং-এর স্বার্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম। এতদিন কন্যার মাধ্যমে রাজপরিবারের নানান গুহ্য সংবাদ সংগ্রহ করতেন স্বরাষ্ট্র সচিব। সেইভাবে রাজনীতিতে পাশার দান ফেলতেন। যেদিন থেকে মহারাজ বটুকের মণিমঞ্জুষা থেকে অঙ্গুরীয় নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে দলীপ কৌরের দোপাট্টায় মুখ লুকালেন সেদিন থেকে গুর্নামের বড় অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তিনি চাইছিলেন দলীপ রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসুক।

লাল সিং পাতিয়ালা ছেড়ে চলে আসার আগে তার সেই চকবাবা-মহল্লার ভাড়া বাড়িটা বাড়িওয়ালাকে হস্তান্তর করে দিতে যায়। এতদিন সে ভাড়া গুনছিল— যদি মহারাজ অন্য কোনও যৌবনবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলীপকে মুক্তি দেন। এতদিনে সে বুঝল তা হবার নয়। প্রতিবেশী জীবনলালের সঙ্গেও দেখা হলো তার। শুনল, গন্ধার সিং তখনো বেপাত্তা। বলতে ভুলেছি, অমৃতসর মন্দিরে দলীপকে বন্দিনী করার কিছু দিন পরেই কী জানি কী কারণে মহারাজ গন্ধারের ওপর ভীষণ ক্ষেপে যান। শোনা যায়, গন্ধার হিসাবে কিছু ভুল করে— মহারাজার পেয়ারের কোনও শেঠের গদি লুট করে। নানক সিং-এর কাছে গন্ধার নাকি স্বীকার করেছিল—লুটের মাল পাই-পয়সা প্রত্যর্পণ



করতেও স্বীকৃত ছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডাকাতির রাতে দুপক্ষই গুলি চালায়। গন্ধারের এক শাগরেদ আর শেঠজীর একটি পুত্র মারা যায়। সেই মৃত ব্যক্তিকে গন্ধার কী করে ফেরত দেবে? ফলে গন্ধারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের হয়। গন্ধার খলিফা ব্যক্তি। অথবা সর্দার নানক সিংজীর সঙ্গে ব্যবস্থা করাই ছিল। সস্ত্রীক গন্ধার এবং তার শ্যালক হরনাম সিং রাতারাতি পাতিয়ালা ছেড়ে চলে যায়।

এ প্রায় দেড় বছর আগেকার কথা।

জীবনলালের ঘরওয়ালী বললে, দেবরজী, আপনার মিঠুয়াকে এবার নিয়ে যান। আপনার গাঁয়ের বাড়িতে।

লাল স্বীকৃত হয়। পাখিটাকে ফেরত নেয়। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে না। বোধকরি ঐ বন্দিনী পাখির ভিতর সে আর কোনও মানুষের ছবি দেখেছিল। আগেই বলেছি,চকবাবা-মহল্লাটা ছিল শহর আর অরণ্যের সীমান্তে। ওখানে গাছে গাছে নানান চিড়িয়াঁ। লাল স্থির করল চন্দনাটাকে মুক্তি দেবে। কিছু ভিজে ছোলা খাওয়ালো। তারপর খাঁচার দোর খুলে দিয়ে বললে, যা রে মিঠুয়া, আজ থেকে তুই মুক্ত।

মিঠুয়া খাঁচার দ্বার খোলা পেয়েও বের হয়ে এল না। বোধ করি বন্দীজীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বললে, রাম-রাম!

—হ্যাঁ, রাম-রাম! আয় বাইরে আয়!

ওকে খাঁচা থেকে সযত্নে বার করে আনল। ছেড়ে দিতেই মিঠুয়া গুটি গুটি ফিরে গেল খাঁচায়। বললে, ধুন গুরু রামদাস!

লাল সিং বুঝতে পারে মুক্ত জীবনটাকে ও বিশ্বাসই করতে পারছে না। দলীপকেও যদি মহারাজা আজ প্রাসাদের বাইরে বার করে দেন তাহলে সেও কি আবার

ফিরে যাবে তার সোনার পিঞ্জরে?

লাল সিং ওকে আবার বার করে আনল। বসিয়ে দিল একটা গাছের ডালে। বললে, বুদ্ধু কোথাকার! যা পালা! ভগবান তোকে এক জোড়া ডানা দিয়েছেন কেন! যা! উড় যা!

বেচারি মিঠুয়া! অনেক উঁচুতে পাক খেতে খেতে এই দৃশ্যটা দেখছিল একটা শিক্‌রে বাজ! ঝড়ের বেগে নেমে এল পাখিটা। লাল সিং কিছু করার আগেই তার তীক্ষ্ণ নখে বাজপাখিটা খিমচে ধরল মিঠুয়াকে। না, 'রাম-রাম' নয়, 'ধুন গুরু রামদাস'ও নয়, প্রজাতিগত আর্তনাদ করে উঠল পাখিটা: ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ!



আরও দুই বছর পরের কথা। সেই 'চুচুন্দর দত্ত' নামের লোকটা ইংরেজ গোয়েন্দাদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে জাপানে পালিয়ে গেছে। এতদিনে বোঝা গেছে লোকটার নাম চুচুন্দর নয়: মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু!

লাল সিং এখন পুরোপুরি একজন সম্পন্ন চাষী। দুটি মহিষ কিনেছে। গাঁয়ের জীর্ণ কুটির মেরামত করে নিয়েছে। এক পাড়াতুতো মৌসি ওর দেখভাল করে। রান্নাবান্না করে দেয় বুড়ি। নিঃসন্তানা, বিধবা। মাঝে মাঝে লালকে মুখ ঝামটা দেয়: তুই কী নিরেট গাধারে! সেই আবাগী ফিরে আসবে বলে বসে আছিস? যাকে মন চায় সাদি কর না কেন? বলিস্ তো আমিই সম্বন্ধ দেখি.....

লাল ঝাঁঝিয়ে ওঠে, এমন উত্ত্যক্ত করলে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।

এভাবেই দীর্ঘ দুটি বছর কেটে গেছে। পাতিয়ালার রাজান্তঃপুরে লাল সিং-এর,— নাকি বেআইনী-আইনে মহারাজার — আর একটি কন্যা-সন্তান হয়েছে—যার মা দলীপ কৌর। সাংরুর জিলার রাজুমাজারায়া গাঁয়ে বসে সে খবর পায়নি লাল সিং। সে গহুঁর ক্ষেতিতে পানির এন্তাজাম করেছে, জোয়ার-ভুট্টা ফলিয়েছে, বয়েল গাড়িতে ফসল চাপিয়ে হাটে বেচে দিয়ে এসেছে। মহিষের দুধ বেচেছে, খেয়েছে।

এই সময়েই সে দারু পিনা শুরু করে। বোধ করি বিরহের জ্বালায়। দলীপকে ভুলতে। কিন্তু তার কোনও ইয়ার-দোস্ত্ হয়নি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফিরে আসত গোধূলি বেলায়। পাতকুয়োর জলে আস্নান করত, তারপর উঠানের মাঝখানে খাটিয়াটা টেনে নিয়ে বসত মদের পাত্র নিয়ে। মৌসি আপত্তি করত না। জোয়ান মরদ—একা একা থাকে— ক্যা কিয়া যায়? মৌসি তেলেভাজা নামিয়ে দিয়ে যেত ওর সামনে আর বক্‌বক্ করত: এ কি এই বুড়ির কাজ? হাজারো দফে বোলতি বহ্ শুন্‌তেহি নেহী.....

—মৌসি! ফিন সাদিকা বাৎ বোলোগি তো.....

—হাঁ-হাঁ! জানতি! ঘর ছোড়কে চলা যায়ে গা! না? যা, না! কাঁহা যানে

চাহতে হো! তেরা লিয়ে দোজখ্‌কে দরওয়াজা তো হামেশাই খুলা পড়া হায়!

এমন সময় একদিন অচানক! লাল সিং সাম-ওয়াক্তের আধা-আঁধারে উঠানে আধাশোয়া পড়েছিল তার খাটিয়ায়। সামনে টুলের উপর দেশী দারুর বোতল, গ্লাস আর ভাজির থালি। হঠাৎ ছেঁচা-বেড়ার ধারে গেটের কাছে একটা সাইকেল এসে থামল। নেমে এল লোকটা। খালসা শিখ, সন্দেহ নেই, কিন্তু আঁধার ঘনিয়েছে—দূর থেকে লাল সিং ঠিক পহচান্তে পারল না। পুকার দিল, কৌন?

দশাসই লোকটা গেট খুলে এগিয়ে এল ভিতরে। ওর কাছাকাছি এসে মাজায় হাত দিয়ে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ালো। বললে, ওয়া গুরুজীকি ফতে! পহ্‌চান্তে হো নেহী?

বিস্ময়ে খাটিয়ায় উঠে বসল লাল, তু? কৈসে?

—কেঁও সাংরুর জিলা মেরা পতা নেহি ক্যা? রাজু মাজারায়া মেরা ঘর নেহি হ্যয়, ক্যা?

—ও তো সহি বাৎ, লেকিন.....

লোকটি বললে, তুই যা আশঙ্কা করছিস সে ভয় নেই! আমার উপর কোনো গ্রেপ্তারী পর্‌ওয়ানা আর নেই পাতিয়ালা রাজস্টেটে।

বুড়ি মাসি বার হয়ে এসেছিল ছাপড়া থেকে। হাতটা ভ্রূর উপরে তুলে আগন্তুক মানুষটাকে চিনবার চেষ্টা করে। পারে না। জানতে চায়, ই কৌন্ রে,লাল?

লাল সিং ততক্ষণে ওকে বাহুপাশে বদ্ধ করে ফেলেছে। সেখান থেকেই বলছে, তু পহ্‌চান্তি নহি,সহি? ইয়ে তো এক জবরদস্ত ডাকু হ্যায়!

বুড়ি এতক্ষণে চিনেছে: ইয়া গুরুজী! তু তো গন্ধার! বহুৎ রোজ বাদ! বৈঠ্ যা খাটিয়াপ্যে, ম্যয় ঔর ভি ভাজি লাতি হুঁ!

গন্ধার সিং-এর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে অবাক হয়ে গেল লাল সিং। শহর থেকে বহোৎ দূরে এই গ্রামপ্রান্তে বসে সে কিছুই খবর জানে না। ইতিমধ্যে এস. পি. সাহেবের আদেশে গন্ধার সিং আর তার শ্যালক হরনাম সিং-এর উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহৃত হয়েছে। বস্তুত ঐ ডাকাতির কেসটাই পুলিস তুলে নিয়েছে। গন্ধারের যে সম্পত্তি সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গন্ধার পাতিয়ালা শহরে তার সাবেক বাড়িতেই বাস করে আজকাল। তার দু-দুটি হেতু। এক নম্বর: যে শেঠজীর গদি লুট করার অপরাধে গন্ধার রাজরোষে পড়েছিল সেই শেঠ হরিচাঁদ সিং নিজেই এখন রাজরোষে পড়েছেন। তাঁর জমি-জেরাৎ-হাবেলি-মোটোর গাড়ি এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রাজ-সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হরিচাঁদ সিং বিনা-বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত; তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পাতিয়ালা ত্যাগ করে দিল্লীতে চলে গেছেন। হরিচাঁদ সিং শেঠের যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার মূল্যমান,উনিশশ' আঠারো সালের হিসাবে, বিশ লক্ষ তঙ্কা।

দ্বিতীয়ত, লাহোরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার-সাহেব জয়সওয়াল কাপুরসাহেবকে গন্ধার

সিং 'খুশি' করে দিয়েছে। কাপুরসাহেব বিলাইতের উকিল, যাকে বলে 'বারিস্টার'। উনি যখন বিলাইতে পড়িলিখি করতেন তখন একই কালেজের ছাত্র ছিলেন এই জনসন সাহেব....

—কোন সি জনসন-সাব?

—ক্যা বুড়বক হ্যয় তু! পাতিয়ালা রাজস্টেট মে রহ্‌তে ঔর জনসন সাবকো ভি নহি পহ্‌ছন্তে?

ব্রিগেডিয়ার ডি. এল. জনসন হচ্ছেন পাতিয়ালায় ইংরেজ সরকারের এজেন্ট। ফৌজী মানুষ— যুদ্ধে একটা ঠ্যাঙ খোয়া যায়; তাই এখন ভারত শাসনের অন্যতম স্তম্ভ। বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি; পাতিয়ালা রাজস্টেটে: ব্রিটিশ এজেন্ট।

গন্ধার কাপুরসাহেবের মাধ্যমে জনসন সাহেবকে পাকড়াও করে। হরিচাঁদ সিংকে বিনাবিচারে আটক রাখা এবং তাঁর সম্পত্তি বিনা বিচারে দখল করা নিতান্ত বে-আইনী। কিন্তু এ নিয়ে রাজাসাহেবকে কোনো চাপ দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে জনসন সাহেবকে মুখপাত্র করে কাপুরসাহেবের প্রস্তাবটাও মহারাজ মেনে নিয়েছেন। গন্ধার সিং সপরিবারে পাতিয়ালায় ফিরে এসেছে। তবে ডাকাতি আর সে করবে না স্থির করেছে। বহু অর্থ ইতিমধ্যেই জমিয়েছে। সে এখন এক্কা-টাঙা ইজারা নিয়ে বেওসা করবে বলে স্থির করেছে।

মৌসি একটা বড় থালায় আরও কিছু ভাজি রেখে গেল।

গন্ধার তার কাঁধের ঝোলা থেকে 'বিলাইতি' বার করল। এক চুমুক পান করে লাল সিং জানতে চায়, অব বোল্, মেরে তালাসমে ক্যেও? কুছ্ কহ্‌না হ্যয় ক্যা?

গন্ধার জানায়, হ্যাঁ, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে লালের কাছে এসেছে। অনেক খুঁজে খুঁজে। ব্যাপারটা এই রকম: গন্ধার আত্ম-অনুশোচনায় ভুগছে। যদিচ তার কোনও অপরাধ ছিল না, তবু তারই হেপাজত থেকে তো দলীপ খোয়া যায়। এই বেদনাদায়ক ঘটনাটা তাকে নিরন্তর খোঁচাচ্ছে। তাই ও সাইকেলে এই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে বন্ধুর সন্ধানে। লাল সিং যদি সম্মত হয় তাহলে ওরা দুজনে মিলে দলীপকে উদ্ধার করতে পারে।

—কৈসে?

—একই দাওয়াই! শুন্!

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ অস্ট্রিয়া-জার্মানির সঙ্গে বার্তানিয়ার লড়াই খতম হয়েছে। এই লড়াইয়ে বার্তানিয়াকে পাতিয়ালার মহারাজ যে মদৎ দিয়েছেন তার স্বীকৃতি দিতে লড়াই ফতে হবার পর এখন মহারাজকে 'নাইটহুড' দেওয়া হবে। আর কিছু নয় একটা উপাধি: G. C. V. O..... গন্ধার জানে না তার অর্থ কী!

প্রাক্তন ক্যাপ্টেন লাল সিং বলে, ওর মানে গ্র্যান্ড ক্রস্ (অব দা রয়্যাল) ভিক্টোরিয়ান অর্ডার! খুব উঁচু মেক্‌দারের সম্মান!

গন্ধার বুঝিয়ে বলে, কিন্তু একটা গোল বেধেছে! ঠিক বাধেনি, বাধিয়ে দেওয়া যায়। বাতানিয়া-হুকুমতের কোনও 'নাইট'-এর হারেমে একজন অপরের বিবাহিতা রমণী থাকতে পারে না। ব্যাপারটা গন্ধার বুঝিয়ে দিয়েছিল লাহোরের ব্যারিস্টার সাবকে। তিনি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন এজেন্ট জনসন-সাহেবের দরবারে। জনসন বলেছেন, ঘটনাটা তাঁর অজ্ঞাত নয়; ঐ বন্দিনী নারীর মরদ যদি লাট-বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করে এজেন্ট-সাহেবের বরাবর দাখিল করে, তাহলে মহারাজ বাধ্য হবেন দলীপকে মুক্তি দিতে।

—কিন্তু ব্যারিস্টারের 'ফি' আমি দেব কেমন করে?

—'ফি' উনি নেবেন না। ওঁকে দিতে হবে এক বোতল ফরাসী শ্যাম্পেন। সেটা আমি দেব দোস্ত্! আমার প্রায়শ্চিত্ত, অথবা বন্ধুত্বের মূল্য—যাই বলিস্!

—তাহলে আমাকে কী করতে হবে?

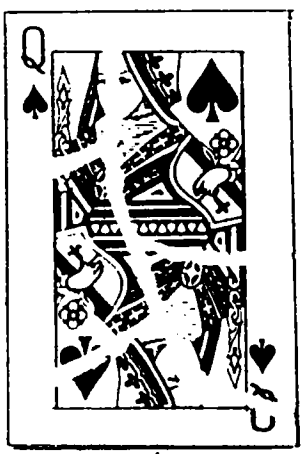
—তুই গোপনে পাতিয়ালায় চলে আয়। ব্যারিস্টার-সাহেব আঠাইশ তারিখ রাত্রে জনসন-সাহেবের বাড়িতে ডিনার খাবেন। আমি তোকে নিয়ে যাব। লাট-বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত বানানোই থাকবে, তুই শুধু তাতে স্বাক্ষর করবি, আর এজেন্ট-সাহেব যা-যা জানতে চাইবেন সচ্-সচ্ জবাব দিবি।

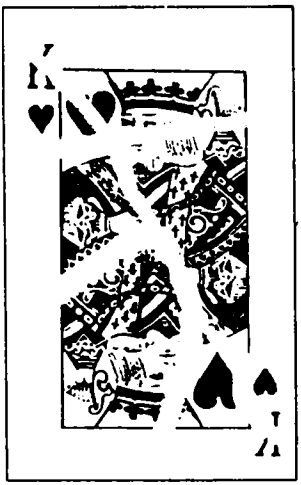
—কী জানতে চাইবেন তিনি?

—তা আমি কেমন করে জানব? সম্ভবত তিনি জানতে চাইবেন কী করে তোর ঔরৎ খোয়া গেল, তুই কখনো তাকে মারধর করেছিস কিনা—মানে, তোর কাছ থেকে জান বাঁচাতে সে মহারাজের কাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা; অথবা তুই দলীপকে বেচে দিয়ে কোনো টাকা-কড়ি রাজস্টেট থেকে নিয়েছিস কি না.....

বোতলের শেষ তলানিটুকু কণ্ঠনালিতে ঢেলে দিয়ে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন লাল সিং বলেছিল, সমঝ্ গয়্যা, তু বে-ফিকর রহ্ গন্ধার। ম্যয় আঠাইশ তারিখ শামকো তেরা ডেরাপ্যে পৌঁছ যাউঙ্গা!

—নেহি! মেরা ডেরাপ্যে নেহী। গুরুদ্বারাপ্যে!





আমি একটা ভুল করেছি।

না, ঠিক ভুল নয়। কথাসাহিত্যের খাতিরে কিছু উল্টোপাল্টা লিখে ফেলেছি। আজ্ঞে না, বানানো মিথ্যা কথা কিছু লিখিনি তা বলে। পরের কথা আগে লেখা—এই যা! অর্থাৎ ঐ ২৮ মার্চ, ১৯১৯-এর মারাত্মক ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে, কালানুক্রমিকভাবে আমাকে সত্য ঘটনা পেশ করতে হবে। 'সত্য' মানে আদালতের এভিডেন্স মোতাবেক।

একথা সত্য যে, মহারাজ আশা করেছিলেন পয়লা জানুয়ারির লিস্টে তিনি 'নাইটহুড' পাবেন। দেখা গেল, লিস্টে তাঁর নাম নেই। দেওয়ানজী এজেন্টের সঙ্গে কিছু দহরম-মহরম করলেন এবং ভিতরকার তথ্যটা জেনে এলেন। লাট-বাহাদুরের কাছে ফাইনাল লিস্টেও পাতিয়ালা মহারাজকে 'G. C. V. O.' খেতাব দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। স্বয়ং ভাইসরয় নাকি স্বহস্তে ঐ নামটি কেটে দেন। তাঁর এ. ডি. কংকে বলেন, একটি বিবাহিতা রমণীকে যে রাজা ডিভোর্স না করিয়ে বিবাহ করে তাকে হিজ-ম্যাজেস্টিস্ গভর্নমেন্টের 'নাইট' বলে ঘোষণা করা যায় না। নো! নেভার! মর্মান্তিক চটলেন পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজ। ডেকে পাঠালেন দেওয়ানজীকে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ঐ দেওয়ানজীর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অব বাতাইয়ে ক্যা কিয়া যায়?

দেওয়ানজী বললেন, সে-কথা আমি আগেও আপনাকে জানিয়েছি, মহারাজ। তিন-তিনটি সমাধান আছে। কোনটি আপনার মনপসন্দ্ তা আপনিই বিচার করে দেখুন। এক নম্বর: দলীপ কৌরকে দিয়ে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে আনুন যে, লাল সিং তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করত—সে জন্যে সে স্বেচ্ছায় রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছে। এই দরখাস্তটা হাতে পেলে আমি বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে আনতে পারব।

মহারাজ বাধা দিয়ে বলেন, ওটা হবে না। কেন হবে না সে-কথা ছেড়ে দিন। বাকি দুটো পথ কী?

—দু-নম্বর, দুই কাঁকালে দুই মেয়েকে দিয়ে ঐ মাগীটাকে লাথ্ মেরে দূর করে তাড়িয়ে দিন।

মহারাজ অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠেন, সেটা যে অবাস্তব প্রস্তাব তা আপনিও জানেন। তৃতীয় বিকল্পটা কী?

—'নাইটহুড'-এর খোয়াব দেখা বন্ধ করুন।

মহারাজা উঠে দাঁড়ান। বলেন, আপনি এবার বিশ্রাম নিতে যেতে পারেন। আমি ভেবে দেখছি।

বাস্তবে মহারাজ একটি চতুর্থ সমাধান খুঁজে বার করলেন। মূল আপত্তিটা কোথায়?

দলীপ কৌর বিবাহিতা, সধবা, তার স্বামী জীবিত! এটাই না একমাত্র আপত্তি? বিধবা হলে তো মহারাজ তাকে বিবাহ করতে পারেন। তাই নয়?

মহারাজের খাশ্‌কামরায় এসে সসম্ভ্রম অভিবাদন করল সর্দার নানক সিং—পাতিয়ালার রাজস্টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস। মহারাজ বললেন, বস, নানক সিং! অনেক কথা আছে।

ইতিপূর্বে রাজসমীপে চিরকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেছে। নানক একটু সচকিত হলো। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান সে। বুঝল, আলোচনার বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রুদ্ধদ্বার-কক্ষে পুরো দু-ঘণ্টা ওঁরা আলোচনা করেছিলেন। বিচারালয়ে নানক সিং-এর দাখিল করা ডায়েরিটাই তার তথ্যসূত্র: "After two hours conversation the Maharaja disclosed his real object of this interview and said that so long as Lall Singh was living there could be no peace for him". [দু-ঘণ্টা কথাবার্তার পর আজকের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা মহারাজ উত্থাপন করলেন: যতদিন লাল সিং জীবিত থাকবে ততদিন তাঁর আর কোনো শান্তি নেই।]

লাল সিং হত্যার বহুপূর্বেই দিনপঞ্জিকার পাতায় নানক সিং সব কিছু স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছিল। কেন? সে কিন্তু নিজের অপরাধের কথা, যেটুকু ষড়যন্ত্রে সে সজ্ঞানে অংশগ্রহণ করেছে সেটুকুর কথা লিখতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেনি। তার দিনপঞ্জিকা অনুসারে মূল পরিকল্পনাকার মহারাজ স্বয়ং; কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল ওরা পাঁচজনে মিলে।

মহারাজা মতামত প্রকাশ করলেন: লাল সিংকে তার গ্রামে হত্যা করাটা সুবিবেচনার কাজ হবে না। ছোট গ্রাম— সবাই সবাইকে চেনে—বহিরাগত কেউ এলেই সবার নজরে পড়ে যাবে। সেই সূত্র থেকে খুঁজতে খুঁজতে গোয়েন্দা আসল অপরাধীর সন্ধান পেতে পারে। ফলে সবার আগে লোকটাকে লোভ দেখিয়ে গাঁয়ের বাইরে আনতে হবে। জনবহুল পাতিয়ালা নগরীতে। অবশ্য হত্যাটা সংঘটিত হবে শহর প্রান্তের কোনও বিজন বনে। সেখানেও ওকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিসের লোভ? কে দেখাবে? মহারাজ চিন্তা করে রেখেছেন। লোকটাকে টাকা দিয়ে বশ করা যায়নি। ফলে বঁড়শিতে টোপটা বড় জাতের হওয়া চাই: দলীপ কৌর। আর লোভটা দেখাবে গদ্দার সিং নিজে— যে ওর বচপনের দোস্ত, যাকে ও বিশ্বাস করে। গদ্দারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। লাল সিং হত্যা—ষড়যন্ত্রে অংশ নিতে রাজি হলে তার সব পূর্ব-পাপ মাফ।

সর্দার নানক সিং এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিতে রাজি হওয়ামাত্র মহারাজ ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি চেক: সাত হাজার টাকার। বললেন, এটা প্রথম কিস্তি।

কাজ হাসিল হলে আরও পাবে। আর এই দুটোও ধর— তোমার কাছে থাক। আনলাইসেন্সড। কাকে দিতে হবে তা আমি তোমাকে নিজে জানাব। যাও.....আর ও হ্যাঁ, একটা কথা খেয়াল রেখ: আমি এই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিলেত যাচ্ছি। সাতই মার্চ বম্বে থেকে জাহাজটা ছাড়বে। আমি ফিরে আসব এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে। লাল সিং-এর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুটা যেন এমন সময়ে ঘটে যখন আমি বিলাতে অথবা স্টিমারে। বুঝলে?

আভূমি নত হয়ে একটি কুর্নিশ করে সর্দার নানক সিং ফিরে এসেছিল। সেদিন রাত্রেই সে সব কিছু তার দিনপঞ্জিকায় লিখে রাখে— মায় আনলাইসেন্সড পিস্তল দুটির নম্বরও।

সাতাশে মার্চ একটানা সাইকেল চালিয়ে লাল সিং এসে পৌঁছাল পাতিয়ালায়, গন্ধার সিং-এর ডেরায় গেল না। নির্দেশ মতো গিয়ে আশ্রয় নিল গুরুদ্বার-সংলগ্ন অতিথি-আবাসে। সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এল গন্ধারের শ্যালক হরনাম সিং। জানালো যে, গন্ধার ইতিমধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সৌভাগ্য ওদের, মহারাজা স্বয়ং বিলেত গেছেন। তাই প্রহরা ব্যবস্থা কিছু ঢিলেঢালা। ব্যারিস্টার কাপুর পূর্বঘোষিত প্রোগ্রাম মোতাবেক লাহোর থেকে পাতিয়ালায় এসেছেন। আঠাশ তারিখ রাত্রে তিনি এজেন্ট-সাহেবের বাঙলোয় ডিনারের নিমন্ত্রণ খেতে আসবেন। কিন্তু তার পূর্বে গন্ধার সিং লালের সঙ্গে কয়েকটি কথা আলোচনা করতে চায়। শহরের জনবহুল এলাকায় সেটা করা ঠিক হয় না। কোথায় হতে পারে?

লাল সিং বলল, আমি পথেঘাটে বেশি ঘোরাফেরা করতে চাই না। কাল বিকালে সাইকেল চালিয়ে আমি বরং লাহোর গেট পার হয়ে চক্‌বাবা-মহল্লার লেভেল ক্রসিং-এর কাছে চলে যাব। গন্ধার যেন ওখানেই আসে। তারপর দুজনে মনোহর তালাও-এর দিকে সাইকেল চালিয়ে চলে যাব। ওদিকটা খুবই নির্জন।

হরনাম বললে, বিকেল নয় লাল সিংজী। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাবার পর ওখানে এস। আমিও আসব। টর্চ নিয়ে আসব আমরা। তাছাড়া সাইকেলে তো কেরোসিন ল্যাম্প আছেই। আমরা চাই না, কেউ তোমাকে আর গন্ধারকে একসঙ্গে দেখে ফেলে।

লাল বললে, ঠিক হ্যায় দোস্ত। আঁধার ঘনালেই যাব আমি!

লাল সিং জেনে যেতে পারেনি লাহোরে ব্যারিস্টার কাপুর নামে আদৌ কেউ নেই। সবটাই গন্ধারের পৈশাচিক পরিকল্পনা।

লাল সিং হত্যা মামলার বিবরণ অনুযায়ী আঠাশে মার্চ ১৯১৯ তারিখে লাল সিং সাইকেলে চেপে লাহোর গেট পার হয়ে শহরের এক নির্জন অংশ চলে আসে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সেখানে রেল লাইনের ধারে গন্ধার সিং আর হরনাম

সিং প্রতীক্ষা করছিল। ওরা তিনজনে তিনটে সাইকেলে মনোহর তালাও-এর ধারে চলে আসে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পরেই হরনাম হঠাৎ তার সাইকেলের 'বেল' বাজিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে গন্ধারের দুই ডাকাত-অনুচর—কর্তার সিং আর দুলা সিং ছুটে বেরিয়ে আসে। তাদের হাতে ছিল লাঠি। তারা বেমক্কা লাল সিংকে লাঠিপেটা করতে থাকে। লাল মাটিতে পড়ে যায়। চিৎকার করে গন্ধারকে ডাকে, তাকে সাহায্য করতে। তখন গন্ধার ওর মাজায় বাঁধা রিভলভারটা বার করে। ইতিমধ্যে লাল সিং একজনের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাকেই এক বাড়ি বসিয়ে দিয়েছে। লোকটা এবার মাটিতে পড়ে যায়। ঠিক তখনই গর্জে ওঠে গন্ধার সিং-এর পিস্তল। লাল সিং দুরন্ত বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়ায়। গুলিটা লেগেছিল তার কোমরে। কাটা কলা-গাছের মতো এবার সে পড়ে যায়। গন্ধারের হাতে উদ্যত মারণাস্ত্রটা দেখে সে বজ্রাহত হয়ে যায়। বলে — হ্যাঁ, জুলিয়াস সীজারের সেই অনবদ্য শেষ আর্তনাদটাই: তু ভি,গন্ধার!

গন্ধার সিং পর পর তিনটে ফায়ার করে। দুটি লাল সিং-এর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে, তৃতীয়টি মস্তিষ্ক।

সেই রাত্রেই ওরা চারজনে মৃতদেহটি নিয়ে কাদেরছাঁও গ্রামের দিকে চলে যায়। সেখানে একটি শ্মশান আছে। শ্মশান-রক্ষককে ঘুম থেকে ডেকে তোলে এবং রাত্রি প্রভাত হবার আগেই মৃতদেহ দাহ করে ফেলে।

সর্দার নানক সিং বেনামে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে দেয় বিলাতে। পূর্ব নির্ধারিত সাঙ্কেতিক ভাষায়। অ্যাডভোকেট গাওবা লিখেছেন, "The Maharaja, it was alleged later, celebrated the occasion by distributing an ample sum among his A. D. C.'s. Dalip Kaur was now a Maharani de jure.

সর্দার গুর্নাম সিং-এর এক ভৃত্য ত্রিশ তারিখ সকালে সর্দার নানক সিং-এর দফতরে হাজির হয়ে একটি দরখাস্ত করে। লাল সিং আজ দুদিন নিরুদ্দেশ। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কোতোয়ালিতে একটি এফ. আই. আর. দাখিল করতে।

লোকটা তাই করে। এমন তো কত লোকেই নিরুদ্দেশ হয়। কেউ বিবাগী হয়ে যায়, কেউ সন্ন্যাস নেয়, কেউ বা যায় বাঘের পেটে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এস. পি. সর্দার নানক সিং-এর তলব এল দেওয়ানজীর কাছ থেকে। না, দেওয়ানজীর দফতরে নয়, বাড়িতে। নির্জন কক্ষে দেওয়ান রাজা দয়াকিষেণ কৌল নানক সিংকে জেরা শুরু করলেন। নানক প্রথমটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। দেওয়ানজীর প্রশ্নগুলি ছিল মারাত্মক। এক নম্বর: সর্দার গন্ধার সিং-এর উপর যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা ছিল সেটা কার আদেশে প্রত্যাহৃত হলো? দু-নম্বর: লাহোরের পথে সাতমাইল দূরের কাদেরছাঁও গ্রামের শ্মশান-রক্ষক (লোকটাকে দেওয়ানজীর নিজস্ব রক্ষীবাহিনী গ্রেপ্তার করে সরিয়ে ফেলেছে) এজাহার দিয়েছে যে,ডাকু সর্দার গন্ধার সিং আর তার তিনজন সঙ্গী আঠাশে মার্চ রাত্রে একটি বেওয়ারিশ লাশ পুড়িয়ে ফেলে। লাশটা একজন জওয়ান

খাল্‌সা শিখ-এর, তার বুকে ও মাথায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন ছিল। লাশটা কার তা সে জানে না, কিন্তু দেওয়ানজীর সরবরাহ করা একটি ফটোগ্রাফ দেখে সে মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করেছে। তৃতীয়ত: সিমলার অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জানাচ্ছেন যে, মহারাজার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের একটি সাতহাজার টাকার চেক পাতিয়ালা স্টেট পুলিসের এস. পি. নিজে সই করে ভাঙিয়েছেন। এ তিনটি ঘটনার যোগসূত্র কী?

নানক সিং আদ্যন্ত সব কথা স্বীকার করে। রাজা দয়াকিষেণ তখন নানক সিংকে হুকুম করেন সব কথা নিখুঁতভাবে লিখে একটা ফাইল তৈরি করতে। ফাইলটি নানক সিং হস্তান্তরিত করলে তাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ঐ সঙ্গে ছদ্মনামে ভারতের বাইরে পালিয়ে যাবার পাসপোর্ট।

দেওয়ানজী চাইছিলেন রাজাকে সরিয়ে যুবরাজকে গদিতে বসাতে।

নানক সিং স্বীকৃত হয়নি। ফলে দুজনের সম্পর্কে চিড় খায়।

দেওয়ানজীর গোপন ব্যবস্থাপনায় পাঞ্জাব সি. আই. ডি. এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করে। ভারতীয় পুলিসের একজন সিনিয়ার অফিসার নিউম্যানকে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়।

ইতিমধ্যে মহারাজা বিলেত থেকে ফিরে এলেন। বম্বে জাহাজঘাটায় দেওয়ান দয়াকিষেণ কৌল স্বয়ং মহারাজাকে রিসিভ করলেন। লাল কার্পেটের উপর দিয়ে মহারাজা রক্ষীবেষ্টিত হয়ে তাঁর নিজস্ব রোলস্ রয়েস্-এ উঠলেন। দেওয়ানজীও উঠলেন একই গাড়িতে। প্রথম সুযোগেই মহারাজার কর্ণমূলে বললেন: হোটেলে আপনার সঙ্গে কয়েকজন সাক্ষাৎ করতে চাইবে। আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করবেন না।

মহারাজা জানতে চান, কে তারা?

—নানক সিং, গন্ধার সিং আর উজাগর সিং!

মহারাজ বলেন, আবার প্রশ্ন করছি: কে তারা?

রাজা দয়াকিষেণ কৌল তাঁর আংরাখার ভিতর থেকে একটি টাইপ করা কাগজের কপি বার করে মহারাজাকে দিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট-এর এজেন্ট পাতিয়ালা রাজস্টেটের দেওয়ানকে জানাচ্ছেন যে, লাল সিং-এর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকার খুবই উদ্বিগ্ন, কারণ একটা বিশ্রী গুজব ছড়িয়েছে ঐ লোকটার স্ত্রী রাজপ্রাসাদের ভিতর মহারানীর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল তিন বছর আগে, তারপর নাকি আর ফিরে আসেনি। সে যাই হোক, লাল সিং নিরুদ্দেশ কেস-এর তদন্ত করতে একজন স্পেশাল গোয়েন্দাকে পাতিয়ালায় পাঠানো হচ্ছে—পত্রবাহক ডাবলু. জি. নিউম্যান। পাতিয়ালা রাজস্টেট থেকে যেন ঐ গোয়েন্দাকে সর্বভাবে সাহায্য করা হয়।

মহারাজা অবাক হবার অভিনয় করেন: লাল সিং কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে? কবে থেকে?

জবাবে দেওয়ানজী একেবারে অবান্তর একটা কথা বলে বসেন, মহারাজ, আপনার

আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ব্রাঞ্চের অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করে ব্যালেন্স টাকা পাতিয়ালার লয়েডস্ ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

—মানে?

—সর্দার নানক সিংকে বিলেত যাবার এগারো দিন আগে আপনি যে সাত হাজার টাকার চেকটা দিয়ে যান তার কাউন্টার-ফয়েল অথবা পাসবইয়ে তার হদিস নিউম্যানের হাতে পড়ে এটা আমি চাই না। বাই দ্য ওয়ে— ঐ যাদের এখন ঠিক চিনতে পারছে না, ওদের আর কাউকে কি চেক-এ কোনো পেমেন্ট করেছেন?—ঐ গন্ধার, নানক, উজাগর বা হরনাম?

হিজ হাইনেস্ মহারাজা অব পাতিয়ালা একটা ঢোক গিলে বললেন, না না। আর কাউকে কিছু দিইনি। মানে চেক-এ।

হোটেল লাউঞ্জে বৃথাই ঘুরঘুর করে ত্রিমূর্তি বোম্বাই থেকে পাতিয়ালা ফিরে এল। মহারাজের সঙ্গে ওদের আদৌ সাক্ষাৎ হলো না। পিছন থেকে কলকাঠি কে নাড়ছিলেন বলা শক্ত— গুর্নাম সিং অথবা দেওয়ান দয়াকিষেণ কৌল— এজেন্ট-এর নির্দেশে পাতিয়ালা স্টেটের আই. জি. সর্দার তারাচাঁদ জোরদার তল্লাসী শুরু করলেন। নানক সিং দু-তিনবার চেষ্টা করল মহারাজের সাক্ষাৎলাভের। সফল হলো না। তৎক্ষণাৎ ছুটি নিয়ে সে সপরিবারে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার গুজরখানে চলে যায়। পরিবারের সবাইকে সেখানে রেখে পরের সপ্তাহে একাই পাতিয়ালা ফিরে আসে। ঘরওয়ালীর কাছে সে রেখে আসে তার সেই ঐতিহাসিক মারাত্মক দিনপঞ্জিকা। সব কাগজপত্র একটা বাক্সে বন্ধ করে তা সীলমোহর করে। দিনপঞ্জিকার শেষ পৃষ্ঠায় যা লেখা ছিল তার আক্ষরিক অনুবাদ: "আমার আশঙ্কা হচ্ছে ক্ষমতাবান লোকের প্ররোচনায় আমার অকস্মাৎ মৃত্যু হতে পারে। তাই আমার স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে গেলাম যে, তাই যদি ঘটে তাহলে এই সীলবন্ধ বাক্সটা সে যেন পাতিয়ালার এজেন্ট ব্রিগেডিয়ার জনসন-সাহেবের হাতে দিয়ে আসে। কারণ আমার আশঙ্কা, না হলে কিছু নিরপরাধ মানুষকে অহেতুক শাস্তি পেতে হবে।

"যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলেও যেন আমার স্ত্রী এই কাগজগুলি আদালতে দাখিল করে। এতে আমার স্বীকারোক্তি আছে। যে পাপ করেছি তার শাস্তি পেতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু যে পাপ আমি করিনি তার জন্য যেন আমার শাস্তি না হয়। দুনিয়া জানে না, কিন্তু আমি জানি, আমার মতো আরও পাঁচ-সাতজন জানে যে, লাল সিং নিরুদ্দেশ হয়নি। তাকে হত্যা করা হয়েছে!

"লাল সিং হত্যার হেতু: মহারাজা দলীপ কৌরকে মহারানী করেছেন।

"হত্যাকারী: প্রত্যক্ষ: সর্দার গন্ধার সিং, সর্দার হরনাম সিং।

"হত্যার ষড়যন্ত্রকারী: মহারাজা অব পাতিয়ালা এবং আমি। সব শেষে লিপিবদ্ধ করি এই দলিলখানি রাজা দয়াকিষেণ কৌল, দেওয়ানজী, আমার কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে তা বেচিনি। কারণ অর্থলাভের আশায় এ দিনপঞ্জিকা আমি রাখিনি। আমার এ স্বীকারোক্তিতে আমি

আইনের কাছে মার্জনা পাব তা আমার প্রত্যাশা নয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন এই প্রার্থনা জানাই।''

দীর্ঘদিন ধরে লাল সিং হত্যা মামলা চলে। আসামী তিনজন: গন্ধার সিং, নানক সিং এবং হরনাম সিং। যে কোন কারণেই হোক উজাগর সিং প্রথম থেকেই ছাড়া পেয়ে যায়। নানক সিং-এর ঘরওয়ালী তার স্বামীর নির্দেশ মতো আদালতে সীলমোহর করা দিনপঞ্জিকাটি দাখিল করে। পাতিয়ালা হাইকোর্ট-এর ডিভিশন-বেঞ্চ চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় পড়ে যান। মহারাজার নাম যে নানান সাক্ষীর এজাহারে বারে বারে উঠে পড়ছে। নানান তথ্য, নানান সাক্ষ্য এবং ঐ মারাত্মক ডায়েরি! অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের সেই সাত হাজার টাকার চেকটির প্রসঙ্গও। বিলেত যাবার এগারো দিন আগে মহারাজ কেন এস. পি.-কে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে সাত হাজার টাকা দিয়ে গেলেন? বিনা রসিদে, বিনা হিসাবে, বিনা কারণে? প্রাপক তার যে হেতু দেখাচ্ছে হলপনামা নিয়ে, তা যদি সত্য না হয় তাহলে সত্যটা কী? কে বলবে? মহারাজা অব পাতিয়ালা ছাড়া?

মহামান্য আদালত অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন: দু'জন অভিযুক্ত দোষী। হরনাম নির্দোষ। দুজনকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হলো। জাজ্‌মেন্টে মহামান্য আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন:

১. মৃত ব্যক্তির স্ত্রী দলীপ কৌর এখনো রাজাবরোধে আছে।

২. উভয় অপরাধীই মৃত লাল সিংকে প্ররোচিত করেছিল তার বিবাহবিচ্ছেদ আবেদনে স্বাক্ষর দেওয়াতে। তারা সফলকাম হয়নি।

৩. আসামী গন্ধার সিং—যাকে ডাকাতির অপরাধে বস্তুত পাতিয়ালা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল—তাকে আসামী নানক সিং রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে এবং মহারাজা যেদিন বিলাত যাত্রার পূর্বপর্বে বোম্বাই রওনা হন সেই দিন দুই আসামী — নানক ও গন্ধার গোপনে রাজদর্শনে আসে।

৪. হিজ হাইনেসের বিশেষ আদেশনামায় গন্ধার সিংকে ভূসম্পত্তি দান করা হয় — মহারাজা বিলেত থেকে ফিরে এলে।

৫. গন্ধার সিং-এর নিক্ষিপ্ত গুলিতে অনেকের উপস্থিতিতে লাল সিং নিহত হয়।

৬. হত্যার উদ্দেশ্য কিছু ব্যক্তির 'ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি'।

৭. The Court deprecated the attempt of the accused to involve "highly placed persons." [অভিযুক্তরা যেভাবে 'কিছু মহামান্যবর'কে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে সেটাকে আদালত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দেখেছেন।]

ব্যস্! খতম! ঐসিন তো হোতাই হ্যয়! এন্তাই তো হোন্দাই রহতা! এমনটা

তো হয়েই থাকে!

স্থানীয় কিছু পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখালেখি যে না হয়েছে তা নয়, তবে অচিরেই সবাই সেসব কথা ভুলে গেল।

ভাবছেন আমার গল্পটা তাহলে শেষ হলো? আজ্ঞে না!



দশবছর পরের কথা : ১৯২৯—



বছর তিনেক আগে হিজ হাইনেস্ মহারাজা অব পাতিয়ালা নমিনেটেড হয়েছেন 'চান্সেলার অব দ্য চেম্বার অব প্রিন্সেস'-পদে। যেসব প্রতিবেশী ভারতীয় রাজন্যবর্গ পাতিয়ালার হেনস্থায় দশ বছর আগে সফরির-নৃত্যে ফর্‌ফর্ করছিল তাদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া হয়েছে। পাতিয়ালায় একটি পরিষদ গড়ে উঠছিল — প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, গান্ধীবাদীদের নিয়ে — সেই 'পাতিয়ালা-সভা'-কে নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। রাজা দয়াকিষেণ কৌল ছুটি নিয়ে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন সপরিবারে। সেখান থেকেই ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন হিসাব নিয়ে দেখা গেল — ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে বুদ্ধিমান দেওয়ানজী তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সব কিছুই পাতিয়ালা রাজস্টেট থেকে অপসারিত করেছেন।

বিশ্বযুদ্ধান্তে বড়লাট বদল হওয়ার পরেই হিজ হাইনেস্ 'নাইটহুড' লাভ করেছেন —যেন রবীন্দ্রনাথের ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া 'ছার' উপাধিটাই: G.C.V.O.!

লাল সিং-এর চিতাভস্ম দীর্ঘদিন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। মায় সেই কাদেরছাঁও গ্রামের শ্মশানরক্ষকও না-পাত্তা। আদালতে সে সাক্ষী দিয়েছিল পুলিসের তরফে — ফটো দেখে সনাক্ত করেছিল লাল সিংকে এবং আইডেন্টিফিকেশন্ প্যারেডে গন্ধার সিংকে। তারপর — দেওয়ানজীর সুব্যবস্থায় — লোকটা সপরিবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

যদিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তবু মাত্র চার বছর মেয়াদ খাটার পর গন্ধার সিংকে লাট বাহাদুরের বিশেষ আদেশ বলে মুক্তি দেওয়া হয়। বড়লাট বাহাদুর কার সুপারিশে তাকে ক্ষমা করলেন এ বিষয়ে ইতিহাস অবশ্য নীরব, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত গন্ধার সপরিবারে পাতিয়ালায় ফিরে আসে। তার যাবতীয় বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত পায়। তবে এক্কা-টাঙার ইজারা তাকে নিতে হয়নি। মহারাজের আদেশে তাকে উচ্চপদে বসে বসে মাস-মাহিনা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

দশবছর অতিক্রান্ত। উনিশ শ' উনিশ থেকে উনত্রিশ। একটি লোক তখনো আন্দামানে মেয়াদ খাটছে।

এমন তো হতেই পারে! এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা!

নিজে হাতে যে গুলি করে হত্যা করেছে তাকে তবু ক্ষমা করা যায়— সে যদি পার্টি-মস্তান হয়, জেল থেকে ফিরে এসে আবার পার্টিতে নাম লেখায়। আবার পার্টির নেতার আদেশে হত্যা করতে রাজি থাকে। কিন্তু পার্টির অগোচরে ঘরে

বসে ডায়েরি লেখা— আর তাও আদ্যন্ত সত্য কথা লেখা, মায় পার্টি-নির্দেশে-কৃত নিজের অপরাধ পর্যন্ত মূর্খের মতো স্বীকার করা — নাঃ! এ অপরাধের ক্ষমা নেই!

নানক সিং — এক্স-সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস, পাতিয়ালা রাজস্টেট — আন্দামানের সেলুলার জেলে বসে ঘানি টেনে চলে।

আর টেনে চলে জীবনের গ্লানি, রাজাবরোধে এক বিধবা—স্বামীর মৃত্যুর পর যে হয়েছে বৈধ মহারানী!

রাজা দয়াকিষেণ কৌল — প্রাক্তন দেওয়ানজী—এখন ষাটের উপর; কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি অবসর নেননি। পাতিয়ালায় পদার্পণ করেন না আদৌ। তবু ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে বিভিন্ন রাজন্যবর্গ, নবাব, খান্‌খানান্‌দের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম। তাঁরই প্রচেষ্টায় কিনা সে বিষয়েও ইতিহাস নীরব — দশ বছর পরে ক্যাপ্টেন লাল সিং-এর প্রেতাত্মা এসে হিজ হাইনেসের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালো:

মে, ১৯২৯ —

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ইন্ডিয়ান স্টেটস পিপল্‌স' কনফারেন্স। হায়দ্রাবাদের নিজাম, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা ইত্যাদি প্রভৃতি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে উপস্থিত হয়েছেন; কনফারেন্সে বড়লাট-বাহাদুরের প্রতিনিধি স্যার স্টুয়ার্ট জেনকিন্সও উপস্থিত। ভারত-ভাগ্য নিয়ে নানান আলোচনা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াল স্ট্রীট ক্র্যাশ তখনো হয়নি — কিন্তু প্রত্যাসন্ন। সমগ্র পৃথিবী তাই নিয়ে চঞ্চল। এমন পরিবেশে — কোথাও কিছু নেই — পাঞ্জাব এলাকার দশ-দশজন অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি মুদ্রিত মেমোরান্ডাম সভ্যদের মধ্যে বিলি করা হলো। এক কপি দেওয়া হলো সভাপতি স্যার সি. ভি. চিন্তামণিকেও।

সভাপতি সেটিকে অ্যাজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করলেন।

আলোচনা হলো। পাতিয়ালার মহারাজা স্বয়ং আসেননি। তাঁর প্রতিনিধির ক্ষীণকণ্ঠের আপত্তি ডুবে গেল যৌথ প্রতিবাদে। মেমোরান্ডামে বর্ণিত হয়েছে পাতিয়ালা রাজস্টেটে মহারাজের যথেচ্ছাচারের একটি দীর্ঘ বিবরণ। বারোটি অভিযোগের মধ্যে মাত্র চারটি প্রধান অভিযোগ এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল:

১. লাল সিং হত্যা মামলার পশ্চাদপটে ছিলেন একজন মাত্র ব্যক্তি: মহারাজা অব পাতিয়ালা। তাঁরই নির্দেশে হত্যা সংঘটিত হয়।

২. পাতিয়ালা শহরের সর্দার বিচাতার কৌর, তাঁর পুত্র ও কন্যার অন্তর্ধানের পিছনে আছে মহারাজা অব পাতিয়ালার হাত।

৩. লাল সিং-এর ধর্মপত্নী—তিন সন্তানের জননী দলীপ কৌরকে কস্‌বি মহলে স্থানান্তরকরণের পরে মহারাজ সর্দার অমর সিং-এর পত্নীকে রাজপ্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেছেন এবং ছয়মাস অতিক্রম হওয়ার পরেও তাঁর স্বামীর কাছে ফেরত দেননি।

৪. দীর্ঘ দশ বছর পূর্বে পাতিয়ালা স্টেটের বিশিষ্ট ধনকুবের সর্দার হরিচাঁদ সিংকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি — যার মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা — তা বিনা-বিচারে রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, এই সর্দার হরিচাঁদ সিং-এর গদিতে ডাকাতি করা এবং তাঁর পুত্রকে হত্যা করার অপরাধেই দীর্ঘদিন পূর্বে লাল সিং হত্যা-মামলার আসামী— বর্তমানে-মুক্ত গন্ধার সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সভাপতি স্যার সি. ভি. চিন্তামণি মেমোরান্ডামটি পাঠান্তে উপসংহারে বলেছিলেন — 'Even if five per cent of what is written here is true, the man deserves the sack from his gaddi." [অভিযোগের শতকরা পাঁচভাগও যদি সত্য হয় তাহলে লোকটাকে গদি থেকে টেনে নামিয়ে দেওয়া দরকার।]

সভার কার্যবিবরণী যথারীতি বড়লাট বাহাদুরের দপ্তরে পাঠানো হলো। তাতে নানান ছাপ, নম্বর, সীলমোহর লাগানো হলো। তারপর কোনো সেক্রেটারির মৌখিক আদেশ মোতাবেক এক আন্ডার-সেক্রেটারি দরখাস্তের মাথায় লিখে দিলেন: ফাইল।

জনৈক এল. ডি. ক্লার্ক সেটি ফাইলজাত করে দিলেন।

তবু সেরাত্রে লাল সিং-এর প্রেতাত্মা মহারাজের দুঃস্বপ্নে আবির্ভূত হলো। মহারাজের শয্যাসঙ্গিনী — সর্দার অমর সিং-এর ধর্মপত্নী বলল: কী হয়েছে? আপনি অমন করছেন কেন?

—জল! এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও তো আমাকে।



ইন্ডিয়ান স্টেটস্ পিপলস্ কনফারেন্স নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করলেন: 'পাতিয়ালা এনকোয়ারি কমিটি', কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত চীফ জ্যস্টিস অব হাইকোর্ট সে অনুসন্ধান কমিটির সভ্য হলেন। যথাকালে, বস্তুত পাঁচই এপ্রিল ১৯৩০, তাঁদের 'ফাইন্ডিংস্' ছাপার হরফে বেরিয়ে এল প্রেস থেকে: ''অ্যান ইনডিক্টমেন্ট অব পাতিয়ালা।''

কমিটি সুন্দর বাঁধাই ডোসিয়ারের কপি পাঠিয়ে দিলেন প্রতিটি সভ্য স্টেটের রাজা বা নবাবকে। এক কপি গেল পাতিয়ালায়। এবং যথাবিহিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া হলো ইন্ডিয়ান স্টেটস পিপলস্ কনফারেন্সের ওয়ার্কিং কমিটিকে। বলাবাহুল্য পুনরায় এক কপি মহামান্য বড়লাট-বাহাদুরকে উপহার দেওয়া হলো। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তা বড়লাট-বাহাদুরের হস্তগত হয়।

বড়লাট-বাহাদুর সেটা পেয়ে কী করলেন তা আলোচনার আগে আমাদের বোধহয় উচিত হবে তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির বাতাবরণটা সামান্য আলোচনা করে নেওয়া। এটা করি না বলেই — স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি না

বলেই — পাত্রের আচরণে আমরা প্রায়ই ভুল করি। ইতিহাসের ছাত্র তা জানেন — আপনি-আমি জানি না।

ঐ ঘটনার দেড় বছর আগে ১৯২৮ সালে সতেরই সেপ্টেম্বর লাহোরের পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সন্ডার্স নিহত হন। তাঁর হত্যাকারী হিসাবে যাঁদের ধরা হয় তাঁরা সবাই ইতিহাস-বিখ্যাত— *ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব এবং যতীন্দ্রনাথ দাস।* হাজতে ও বিচারালয়ে অভিযুক্তদের উপর দুর্ব্যবহার করা হয়েছে— এই অভিযোগে আসামীরা অনশন করেন। একাদিক্রমে চৌষট্টি দিন অনশনের পর তেরই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ শহীদ হলেন।

ঐ ত্রিশ সালেই ছব্বিশে জানুয়ারি 'পূর্ণ স্বরাজ' দাবি করে কংগ্রেস শপথ নেয়। দোসরা মার্চ বড়লাট লর্ড আরউইনকে 'আইন অমান্য' ও ডান্ডিমার্চের সঙ্কল্প জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী একটি চিঠি লেখেন। বারোই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে মাত্র উনআশি জন আশ্রমিকসহ মহাত্মাজী দুশ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পাঁচই এপ্রিল মহাত্মাজী সমুদ্রতীরে পৌঁছান। তখন তাঁর সঙ্গী কয়েক হাজার। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গ করেন। লাঠি চার্জ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী/সেবিকার দল একের পর এক এগিয়ে আসেন যষ্টিপ্রহার উপেক্ষা করে। এ দৃশ্য আপনারা সিনেমার পর্দায় বা টি.ভি.তে দেখেছেন। বড়লাট আরউইন তাতে খুব যে বিচলিত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। কিন্তু আর একটি সংবাদে তিনি রীতিমতো অসহায় বোধ করেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' থেকে কিছু উদ্ধৃতি শোনাই:

"এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতবর্ষের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিস গুলিবর্ষণ করে।..... বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেইশ বার গোলাগুলি বর্ষিত হয় এবং এর ফলে ১০৩ জন হত ও ৪০০ জন আহত হয়। পেশোয়ারে দুর্ধর্ষ পাঠানগণ মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে এরূপ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে, তারা তেইশে এপ্রিল গুলিবর্ষণের সময় সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। তার ভিতরে পলায়নে অস্বীকৃত ত্রিশজন নির্ভীকভাবে আত্মাহুতি দেয়। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে শান্ত জনতার উপর গুলিবর্ষণে অস্বীকার করায় একদল গাড়োয়ালী সেনার 'কোর্ট মার্শাল' হয়।"

আবার ঐ একই কথা বলব, অনারেব্‌ল্ জাস্টিস্ পাঠক/পাঠিকা! আমার এ উদ্ধৃতিটিও আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়। শুধু উনিশশ ত্রিশ সালের যে বাতাবরণে লর্ড আরউইন ঐ মেমোরান্ডামটিকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে চেয়েছিলেন, সেই রাজনৈতিক বাতাবরণটি বিজ্ঞাপিত করতেই এ উদ্ধৃতি শোনাচ্ছি না। ঐ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমাদের পূর্বসূরীরা কী মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন— যে স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের আজকের দিনের গদিয়াল শাসক আমাদের আর্তনাদের জবাবে শোনাচ্ছেন: এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা।— এমনটা তো হয়েই থাকে!

এমন অভিযোগ বা চ্যালেঞ্জের পরে নীরব থাকা সম্ভবপর নয়। হিজ হাইনেস্ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে মুরুব্বি পাকড়ালেন। স্যার সাপ্রু খলিফা ব্যক্তি। ১৯২৩

সালে তাঁকে সাম্রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে ভারত সরকার বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন, দু'বছর পরে মিসেস্ এনি বেসান্তের সহযোগিতায় তিনি ভারত সরকারের কাছে 'স্বরাজ স্কীম' দাখিল করেন। 'সাইমন গো-ব্যাক' আন্দোলনের পর যে রিপোর্ট প্রণীত হয় তাতে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, স্যার আলী ইমাম প্রভৃতির সঙ্গে স্যার তেজ বাহাদুরও স্বাক্ষর করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি সুপরিচিত এবং আইন-আদালত পাড়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধুরন্ধর!

পাঁচই মে ১৯৩০, হিজ হাইনেস মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং বাহাদুর জি. সি. ভি. ও. ঐ সাপ্রুর বয়ানে লেখা একটি পত্র দিলেন ভাইসরয় লর্ড আরউনকে:

য়োর এক্সেলেন্সি নিশ্চয় অবগত আছেন যে স্বার্থসন্ধানী কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রেসের একাংশ আমার শাসনব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আমি এত দিন সেগুলো উপেক্ষা করে এসেছি, কারণ অভিযোগগুলি এমনই অসম্ভব, অবাস্তব, এমনই অশ্লীল ভাষায় রচিত যে, প্রতিবাদ করতে গেলেই যেন নিজেকে অশুচি মনে হয়।

অবস্থাটা পরিবর্তিত হয়েছে সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'অ্যান ইনডিক্টমেন্ট অব পাতিয়ালা' প্রচার-পত্রিকায়। তাতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। শুনছি তাঁরা নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে, কিছু অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করেছেন। পাতিয়ালা রাজ্যের বাহিরে — লাহোরে এবং অন্যত্র। তার কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

আপনি অবশ্য এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি। তবু আমার মনে হচ্ছে নীরবে ঐ একতরফা গালাগাল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ওঁরা নাকি বারো দফা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে, ঐ প্যামফ্লেটটি আসামাত্র আমি আমার আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতাকে যথাকর্তব্য করতে বলি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথীপত্র আমরা একত্র করে রেখেছি। আপনি অনুগ্রহ করে আবেদনকারীদের প্রার্থনামতো একটি এনকোয়ারির আয়োজন করুন।

এরপরেই হিজ হাইনেস একটি চমকপ্রদ প্রস্তাব করেন:

Should your Excellency, in view of all the circumstances of the case and the urgency of the matter, decide to entrust the enquiry to the Hon'ble Agent to the Governor-General, Punjab States, I shall agree to such a course.

শাদা বাঙলায় "হে ধর্মাবতার! আপনি যদি পাঞ্জাব রাজ্যসমূহের এজেন্টের উপর তদন্তের ভার দেন তাহলে আমি এই এনকোয়ারির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।"

আপনারা শুধু তারিখগুলো লক্ষ্য করুন: মহারাজা পত্রটি লেখেন পাঁচই মে।

বড়লাট বাহাদুরের টেবিলে সেটি উপস্থিত হয় ছয় তারিখে। সাত তারিখে লর্ড আরউইন এনকোয়ারি করতে স্বীকৃত হন এবং মে মাসের নয় তারিখে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। তার একদিকে মহারাজের চিঠি, অপর দিকে সরকারী নির্দেশ :

His Excellency has, accordingly, entrusted the Hon'ble Mr. J. A. O. Fitzpatrick, Agent, Punjab States.....

[. মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তদনুসারে পাঞ্জাব-রাজ্যসমূহের ব্রিটিশ এজেন্ট অনারেব্‌ল মিস্টার জে. এ. ও. ফিট্‌জপ্যাট্রিককে এককভাবে এই অনুসন্ধান কার্য সমাধা করবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অনুসন্ধান হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে, পাতিয়ালায় এবং কীভাবে তা করা হবে তা তদন্তকারী অফিসার স্থির করবেন।]

এত তাড়াহুড়া করে ব্যাপারটা ঘটানো হলো যেন বড়লাট বাহাদুরের সে সময় আর কোনও কাজ ছিল না। একই সময়ে ডান্ডিমার্চ হচ্ছিল না, সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল না।

ইন্ডিয়ান স্টেটস্ পিপল্‌স্ কনফারেন্সের ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন — একটিমাত্র যুক্তিপূর্ণ হেতুতে। অভিযুক্ত নিজেই নিজের বিচারক নিযুক্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অভিযোগের অনেক কিছুর সঙ্গেই এজেন্ট ফিট্‌জপ্যাট্রিক স্বয়ং জড়িত।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্ণপাত করলেন না। ফিট্‌জপ্যাট্রিক যথারীতি ভারতবাসীর অর্থে তাঁর অনুসন্ধান করে গেলেন। কিছুটা ডালহৌসী সরকারী আবাসে, কিছুটা পাতিয়ালায়। প্রতিবাদীর তরফে হাজির হলেন দু-দুজন জাঁদরেল আইনজীবী : স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, এবং সার সি. পি. রামস্বামী আইয়ার। নবনিযুক্ত দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী স্যার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ যাবতীয় তদ্‌বির-তদারক করলেন। বাদীপক্ষ আদৌ উপস্থিত হলো না অনুসন্ধানে।

চৌঠা আগস্ট পর্বত একটি মূষিক প্রসব করলেন।

অনারেব্‌ল মিস্টার ফিট্‌জপ্যাট্রিক বাদীপক্ষের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রতিবাদীর দাখিল করা ৬৩০টি ডকুমেন্ট এবং ১৪৫ জন সাক্ষীর এজাহার নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ দ্বাদশটি অভিযোগ বিষয়েই অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ।

সুতরাং সরকার বাহাদুর সিদ্ধান্তে এলেন : মহারাজ নিরপরাধ। কিন্তু এই অনুসন্ধান রিপোর্টটি এমন হাস্যকররূপে প্রতিভাত যে, সরকার বাহাদুর তা প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। সমসাময়িক দেশীয় পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলো। তার মধ্যে একটি চিঠির ফটোস্ট্যাট কপি। পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৯, তাং ১০. ১২. ২৭ ; পত্রের লেখক এজেন্ট পাতিয়ালা স্টেট, প্রাপক সর্দার অমর সিং, যাঁর স্ত্রীকে পাতিয়ালা মহারাজ আটক করে রেখেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং ঐ অনারেব্‌ল এজেন্ট অনুসন্ধান করে জানাচ্ছেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন। মূল পত্রটা দাখিল করি :

সালে তাঁকে সাম্রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে ভারত সরকার বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন, দু'বছর পরে মিসেস্ এনি বেসান্তের সহযোগিতায় তিনি ভারত সরকারের কাছে 'স্বরাজ স্কীম' দাখিল করেন। 'সাইমন গো-ব্যাক' আন্দোলনের পর যে রিপোর্ট প্রণীত হয় তাতে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, স্যার আলী ইমাম প্রভৃতির সঙ্গে স্যার তেজ বাহাদুরও স্বাক্ষর করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি সুপরিচিত এবং আইন-আদালত পাড়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধুরন্ধর!

পাঁচই মে ১৯৩০, হিজ হাইনেস মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং বাহাদুর জি. সি. ভি. ও. ঐ সাপ্রুর বয়ানে লেখা একটি পত্র দিলেন ভাইসরয় লর্ড আরউনকে:

য়োর এক্সেলেন্সি নিশ্চয় অবগত আছেন যে স্বার্থসন্ধানী কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রেসের একাংশ আমার শাসনব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আমি এত দিন সেগুলো উপেক্ষা করে এসেছি, কারণ অভিযোগগুলি এমনই অসম্ভব, অবাস্তব, এমনই অশ্লীল ভাষায় রচিত যে, প্রতিবাদ করতে গেলেই যেন নিজেকে অশুচি মনে হয়।

অবস্থাটা পরিবর্তিত হয়েছে সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'অ্যান ইনডিক্টমেন্ট অব পাতিয়ালা' প্রচার-পত্রিকায়। তাতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। শুনছি তাঁরা নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে, কিছু অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করেছেন। পাতিয়ালা রাজ্যের বাহিরে — লাহোরে এবং অন্যত্র। তার কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

আপনি অবশ্য এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি। তবু আমার মনে হচ্ছে নীরবে ঐ একতরফা গালাগাল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ওঁরা নাকি বারো দফা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে, ঐ প্যামফ্লেটটি আসামাত্র আমি আমার আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতাকে যথাকর্তব্য করতে বলি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথীপত্র আমরা একত্র করে রেখেছি। আপনি অনুগ্রহ করে আবেদনকারীদের প্রার্থনামতো একটি এনকোয়ারির আয়োজন করুন।

এরপরেই হিজ হাইনেস একটি চমকপ্রদ প্রস্তাব করেন:

Should your Excellency, in view of all the circumstances of the case and the urgency of the matter, decide to entrust the enquiry to the Hon'ble Agent to the Governor-General, Punjab States, I shall agree to such a course.

শাদা বাঙলায় "হে ধর্মাবতার! আপনি যদি পাঞ্জাব রাজ্যসমূহের এজেন্টের উপর তদন্তের ভার দেন তাহলে আমি এই এনকোয়ারির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।"

আপনারা শুধু তারিখগুলো লক্ষ্য করুন: মহারাজা পত্রটি লেখেন পাঁচই মে।

বড়লাট বাহাদুরের টেবিলে সেটি উপস্থিত হয় ছয় তারিখে। সাত তারিখে লর্ড আরউইন এনকোয়ারি করতে স্বীকৃত হন এবং মে মাসের নয় তারিখে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। তার একদিকে মহারাজের চিঠি, অপর দিকে সরকারী নির্দেশ :

His Excellency has, accordingly, entrusted the Hon'ble Mr. J. A. O. Fitzpatrick, Agent, Punjab States.....

[. মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তদনুসারে পাঞ্জাব-রাজ্যসমূহের ব্রিটিশ এজেন্ট অনারেব্‌ল মিস্টার জে. এ. ও. ফিট্‌জপ্যাট্রিককে এককভাবে এই অনুসন্ধান কার্য সমাধা করবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অনুসন্ধান হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে, পাতিয়ালায় এবং কীভাবে তা করা হবে তা তদন্তকারী অফিসার স্থির করবেন।]

এত তাড়াহুড়া করে ব্যাপারটা ঘটানো হলো যেন বড়লাট বাহাদুরের সে সময় আর কোনও কাজ ছিল না। একই সময়ে ডান্ডিমার্চ হচ্ছিল না, সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল না।

ইন্ডিয়ান স্টেটস্ পিপল্‌স্ কনফারেন্সের ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন — একটিমাত্র যুক্তিপূর্ণ হেতুতে। অভিযুক্ত নিজেই নিজের বিচারক নিযুক্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অভিযোগের অনেক কিছুর সঙ্গেই এজেন্ট ফিট্‌জপ্যাট্রিক স্বয়ং জড়িত।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্ণপাত করলেন না। ফিট্‌জপ্যাট্রিক যথারীতি ভারতবাসীর অর্থে তাঁর অনুসন্ধান করে গেলেন। কিছুটা ডালহৌসী সরকারী আবাসে, কিছুটা পাতিয়ালায়। প্রতিবাদীর তরফে হাজির হলেন দু-দুজন জাঁদরেল আইনজীবী : স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, এবং সার সি. পি. রামস্বামী আইয়ার। নবনিযুক্ত দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী স্যার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ যাবতীয় তদ্‌বির-তদারক করলেন। বাদীপক্ষ আদৌ উপস্থিত হলো না অনুসন্ধানে।

চৌঠা আগস্ট পর্বত একটি মূষিক প্রসব করলেন।

অনারেব্‌ল মিস্টার ফিট্‌জপ্যাট্রিক বাদীপক্ষের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রতিবাদীর দাখিল করা ৬৩০টি ডকুমেন্ট এবং ১৪৫ জন সাক্ষীর এজাহার নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ দ্বাদশটি অভিযোগ বিষয়েই অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ।

সুতরাং সরকার বাহাদুর সিদ্ধান্তে এলেন : মহারাজ নিরপরাধ। কিন্তু এই অনুসন্ধান রিপোর্টটি এমন হাস্যকররূপে প্রতিভাত যে, সরকার বাহাদুর তা প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। সমসাময়িক দেশীয় পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলো। তার মধ্যে একটি চিঠির ফটোস্ট্যাট কপি। পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৯, তাং ১০. ১২. ২৭ ; পত্রের লেখক এজেন্ট পাতিয়ালা স্টেট, প্রাপক সর্দার অমর সিং, যাঁর স্ত্রীকে পাতিয়ালা মহারাজ আটক করে রেখেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং ঐ অনারেব্‌ল এজেন্ট অনুসন্ধান করে জানাচ্ছেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন। মূল পত্রটা দাখিল করি :

"If Sardar Amar Singh is not prepared to accept His Highness the Maharaja of Patiala's offer of Rs. 20,000/ and to withdraw all claims over his wife, no further action will be taken on any petition that he may in future submit on the subject."

অর্থাৎ "হিজ হাইনেস মহারাজা অব পাতিয়ালা ইতিপূর্বে সর্দার অমর সিংকে যে বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছেন তিনি যদি তা গ্রহণ না করেন এবং তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে যাবতীয় দাবীদাওয়া প্রত্যাহার করে নিতে না রাজি থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে উক্ত অমর সিং-এর কোনো অভিযোগ নিয়ে কোনো আলোচনাই করা হবে না।"

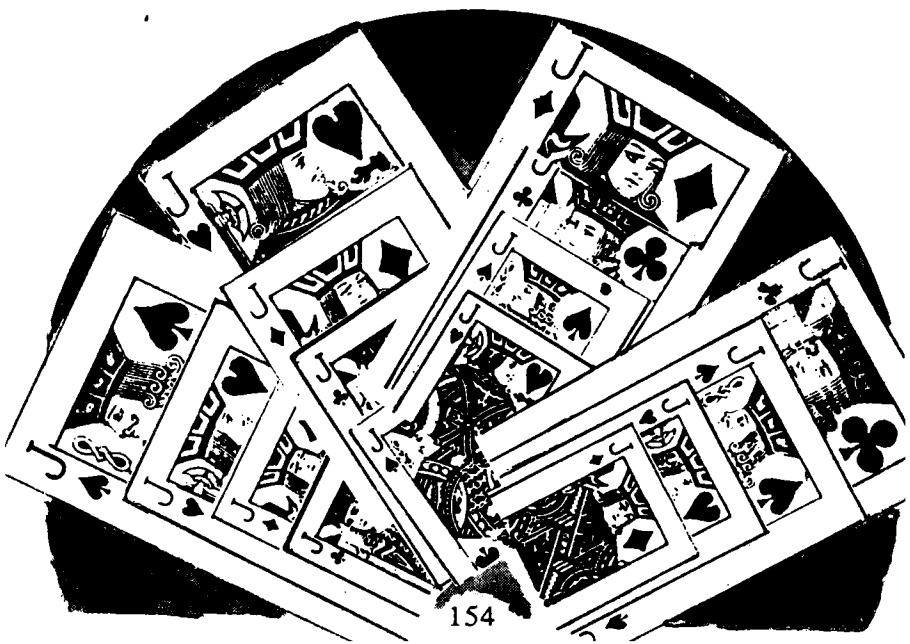
এই চিঠিখানা ইতিপূর্বে যিনি লিখেছেন তিনিই হলেন বর্তমানে বিচারক!

আশা করি আপনারা এতক্ষণে মেনে নিতে রাজি হয়েছেন যে, এমনটা হয়েই থাকে।

কাহিনী আমার সমাপ্ত। নায়কের চরম নিগ্রহ ও অপমৃত্যু এবং খলনায়কের মদগর্বিত অট্টহাস্য সুসমাপ্ত। তবু বাকি আছে কিছু উপসংহার। দু একটি পার্শ্বচরিত্রের পরিণতি না জানিয়ে থামতে পারছি না।

কারণ কাহিনী যদিচ শেষ হয়েছে তবু নটে গাছটি মুড়িয়ে যায়নি।

তা যায় না— বিশ্বাস করুন!



হিজ হাইনেস অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড।



মহারাজ একটা বড়জাতের ডিনার থ্রো করতে চাইলেন। কিন্তু তার আগে একটা অপ্রিয় কাজ বাকি আছে। ঐ দুজন আইনজীবীকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে পাতিয়ালা থেকে বিদায় দেওয়া। দুজনেই কেমন যেন গোমড়ামুখো — কী ভাবেন, কী বলতে চান বোঝাই যায় না। ওঁদের দুজনের উপস্থিতিতে আলো দিয়ে রাজবাড়ি সাজাতে বা পার্টিতে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা বইয়ে দিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে মহারাজের। একটা চক্ষুলজ্জা! ওঁরা দুজন তো সব কিছুই বুঝেছেন। জানেন! ওঁরা দুজনে এখনো পাতিয়ালার গেস্ট-হাউসে বর্তমান। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী: স্যার সি. পি. রামস্বামী আইয়ার এবং স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু।

দুজনের কাউকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা শোভন হবে না; যদিও আইনজীবী হিসাবে আকাশচুম্বী অর্থোপার্জনের অবকাশে দুজনেই ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে গেছেন 'মডারেটপন্থী' হিসাবে।

মহারাজের হয়ে এই কেস লড়তে এসে ওঁরা দুজনেই কেউই এখনো তাঁদের 'ফিজ' নেননি! মহারাজা এবং তাঁর দেওয়ান বারে বারে জানতে চেয়েছেন 'ফিজ'-এর অঙ্কটা — কিন্তু দুজনেই বলেছেন মহারাজের এই বিপদে কি সেসব প্রশ্ন নিয়ে দরদাম করার সময়? আগে কেসটা তো জিতি তারপর ওসব কথা হবে।

মহারাজের প্রাসাদে তাঁর খাশকামরায় দুই মহামান্য অতিথি দেখা করতে এলেন। স্যার আইয়ার এবং স্যার সাপ্রু। যুবরাজ ওঁদের দুজনকে গেস্ট-হাউস থেকে নিয়ে এসে বিদায় হলেন। স্যার তেজ বাহাদুরের নজর হলো মহারাজের খাশকামরায় আরও দুজন ব্যক্তি উপস্থিত। মহারাজের একান্ত সচিব এবং দেওয়ান সার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে পাঁচজন বসলেন আলোচনা করতে। মহারাজ ইতিপূর্বে একাধিকবার বলেছেন, আবার বললেন, আপনারা দুজন অসাধ্যসাধন করেছেন। আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। চরম অসম্মানের হাত থেকে আপনারা দুজন আমাকে যেভাবে রক্ষা করেছেন তার দাম হয় না। তবু বলুন, আপনাদের দুজনকে কী সম্মানদক্ষিণা দিতে পারি?

স্যার তেজ বাহাদুর তাঁর বন্ধু স্যার রামস্বামীর দিকে ফিরে বললেন, সওয়ালটা কে করবে? তুমি না আমি?

—তুমি সিনিয়ার। তুমিই বল। কিন্তু একটা শর্তে। ঘরে শুধু আমরা তিনজন থাকব!

স্যার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ এবং মহারাজার একান্ত সচিব সচকিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকান, তারপর মহারাজের দিকে। তিনি বললেন, উপায় নেই। ওঁরা যা চাইছেন তাই হোক। ঘরে শুধু আমরা তিনজনই থাকব।

ওঁরা দুজন নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন।

—এবার বলুন? —জানতে চাইলেন হিজ হাইনেস।

স্যার তেজ বাহাদুর স্পষ্টভাষে বললেন, য়োর হাইনেস! আমরা দুজন — আপনি নিজেই এখনি বললেন — আপনাকে চরম অবমাননার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। মামলা জিতিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের 'ফিজ'-এর অঙ্কটা পেশ করার পূর্বে আমরা দুজন আপনাকে জানাতে চাই যে, আমাদের বিবেকের ডিভিশন-বেঞ্চে বারোটা চার্জের ভিতর এগারোটায় আপনি গিল্‌টি।

মহারাজ আকাশ থেকে পড়লেন: আপনাদের বিবেকের ডিভিশন-বেঞ্চ! মানে?

—ইয়েস, য়োর হাইনেস! আমি এবং আইয়ার, আমরা আপনাকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করেছি এবং শাস্তি দিতে মনস্থ করেছি। আপনি আমাদের প্রস্তাব মানতে পারেন। আবার নাও পারেন। যদি আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে আমাদের দেওয়া শাস্তিটাও আপনাকে মানতে হবে। আমরা দুজন 'ফিজ' নিয়ে ফিরে যাব। আপনি অবশ্য প্রস্তাবটা নাও মানতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমরা 'ফিজ' নেব না। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে ভাইসরয়ের কাছে অ্যাপীল করব যে, যে-আদালতে বাদী অনুপস্থিত অন প্রটেস্ট — সে আদালতের রায় ভ্যালিড নয়! বিচারের নামে এখানে একটা বিরাট প্রহসন হয়েছে। যার ফলে বিশ্বের দরবারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অচিরেই হাস্যাস্পদ হবে। যাতে হয়, সে ব্যবস্থা আমরা দুজন করব। ভাইসরয় যদি অ্যাপীল না-মঞ্জুর করেন তাহলে রাজন্যবর্গের ওকালতনামা নিয়ে আমরা দুজন লন্ডন যাব। ইন্ডিয়া হৌসে দরবার করব। সেখানে ব্যর্থ হলে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে.....

চরম উত্তেজনায় মহারাজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এসব কী বলছেন স্যার? কিসের অ্যাপীল! আপনারা আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব। বলুন? কী দণ্ড বিধান করছেন আপনারা? আই প্লীড: গিল্‌টি!



দুই আইনজীবী কী পরিমাণ ফীজ পেয়েছিলেন তা জানি না, কিন্তু অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছিল:

১। সর্দার হরিচাঁদ সিং দীর্ঘদিন পরে কারামুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল।

২। সর্দার নানক সিং আন্দামান কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে নগদ

পঞ্চাশ হাজার টাকার খেসারতও দেওয়া হয়েছিল।

৩। ভাই রাম সিংকে সাড়ে বারো হাজার টাকা 'পুরস্কার' দেওয়া হলো। ভাই রামের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল বলে মহারাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

৪। রাম সিং এবং সাত জন আকালী শিখ সেনা — যাদের ইতিপূর্বে বিনা কারণে বরখাস্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয় — এবং এজেন্টসাহেব যে অভিযোগ 'অপ্রমাণিত' বলেছিলেন, সেই আট জনকে মোট এগারো হাজার চারশ ষাট টাকা বকেয়া মাহিনা হিসাবে প্রদান করা হয়।

৫। অমর সিং-এর স্ত্রীকে খেসারৎ সমেত মুক্তি দেওয়া হয়।



শুধু একটি — একটিমাত্র ক্ষেত্রে—মহারাজ ওঁদের দুজনের আরোপিত শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেননি। দোষ মহারাজার নয় — দলীপ কৌরের। সে তিনটি সন্তানকে নিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা খেসারতসহ প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যেতে স্বীকৃতা হলো না।

অগত্যা তাকে ডেকে পাঠানো হলো তিন নাইট-এর কাছে। স্যার সাপ্র, স্যার আইয়ার এবং হিজ হাইনেস ভূপেন্দ্র সিং G. C. V. O.!

উনিশ শ' উনিশে ওর বয়স ছিল উনিশ, এই ছত্রিশে সে ছত্রিশ। শতাব্দীর সমবয়সী সে। তিন-তিনটি সন্তানের জননী। তবু আজও সে মধ্যক্ষামা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা! আজও তাকে বিদ্যুল্লতার উপমান বলে মনে হয়। দোপাট্টায় মুখ ঢাকেনি। নির্ভীক বিদ্রোহিণীর মতো এসে সে দাঁড়ালো তিন নাইটের সমুখে। অভিবাদন করে বললে, মুঝে মাফ কর দিজিয়ে ব্যারিস্টারসাব! রূপেয়া ম্যায় নেহী লেউঙ্গী।

আইয়ার ওকে প্রত্যভিবাদন করে বললেন, লেকিন কেঁও বেটা?

—কেঁও কি খুন কা বদ্‌লা হ্যয় খুন!

হিজ হাইনেস্ মহারাজা অব পাতিয়ালা নতমস্তকে নীরব রইলেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু-পা এগিয়ে এলেন দলীপ কৌরের দিকে। যুক্তকরে তাকে নমস্কার করে বললেন, সওয়াল তো তেরি সহি হ্যয় আম্মা, লেকিন মেরি বাত তু মানলে.....

বললেন, মা-রে! তোর যুক্তি, তোর হিসাবে ঠিক! খুনের বদলা খুন! লেকিন আজ একটা আজীব লোক এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছে, যে বলছে একটা আজব কথা: খুনের বদলা খুন নয়! তুই তার নাম শুনেছিস? এই ক'দিন আগে সে আরব সাগরের ধারে ডান্ডিতে গেছিল লবণ বানাতে! তুই তার নাম শুনেছিস? 'ডান্ডি মার্চ' শব্দটার মানে জানিস, মা?

দলীপ দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, নেহী!

—শোন! তোর যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরই

নেই — আম্ কা করব? কিন্তু তোর এই ছেলেকে বল, তুই কি বাকি জীবন এই প্রাসাদের ভিতর কাটাতে চাস?

—হরগিজ. নেহী!

—তাহলে তুই কি তোর এই ছেলের সঙ্গে যাবি?

—কাঁহা?

—বলব সে কথা, তার আগে আমাকে বল তুই কি তোর সন্তান তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাস? তোর সঙ্গে?

—জী নহি সাঁব! ওরা আমার পেটে জন্মেছে, এই যা! আমার সন্তান ওরা নয়! তাই বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর ওদেরকে একে একে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে! ওরা কোথায় আছে — বেঁচে আছে কি না, ম্যয় নেহি জান্‌তি! ওরা আমাকে জানায়নি, জানায় না!

তেজ বাহাদুর সাপ্রু জ্বলন্ত একজোড়া চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন নাইটহুড-পাওয়া ঐ সদ্য-অ্যাকুইটেড আসামীকে। হিস্ হাইনেস্ তখন নতনেত্রে পার্শিয়ান গালিচায় কী একটা নকশা মনোযোগ দিয়ে দেখতে ব্যস্ত। তেজ বাহাদুর বললেন, তাহলে তুই তোর পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নে, মা। তোকে তোর এই বুড়ো ছেলের সঙ্গে যেতে হবে।

—লেকিন, কাঁহা?

—ঐ যে পাগল লোকটার কথা তোকে বলছিলাম একটু আগে— যে লোকটা বলে, 'খুনের বদলা খুন নয়' — সেই আজব মানুষটার কাছে। তুই তার নামটাও জানিস না? কভি নহী শুনি হায় উন্‌কা নাম: মহাৎমা গাঁধি?

—জী নহী!

—তুই সত্যিই হতভাগিনী! সেই পাগল মানুষটা এখন জেল খাটছে, লেকিন তার ঘরওয়ালী একাই দেখ্‌ভাল করছে সবরমতী আশ্রম। সেই মায়ের পায়ের তলায় এই মা-টিকে নামিয়ে দিতে পারলেই আমার ছুট্টি! তু যা! তৈয়ার হয়ে নে।

দলীপ মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখল।

হিজ হাইনেস মহারাজা অব পাতিয়ালা তখনো অধোবদন! কার্পেটের সেই বিচিত্র নকশাটা তখনো একদৃষ্টে দেখছেন। দলীপ সশব্দে 'থুক' ফেলল পারস্য গালিচার সেই বিশেষ নকশাটায়! তবু মহারাজ মাথাটা তুলতে পারলেন না।

দৃপ্তভঙ্গিতে দলীপ কক্ষ ত্যাগ করল। মহাৎমা গাঁধি না কী যেন নাম — সে লোকটাকে না চিনলেও দলীপ চিনতে পেরেছিল ঐ দুশমনটার হিম্মতের দৌড়! এখানে আখেরি হুকুম জারী করবার হকদার ঐ ব্যারিস্টার-সাহেব!

সেটাই কানুন!

আখেরি বাৎ বলার অধিকার নেই মদগর্বী খলনায়কের। হোক সে গদিতে অধিষ্ঠিত। আখেরি বাৎ বলবার হকদার হচ্ছে বঞ্চিত ভূলুণ্ঠিত নায়ক অথবা নায়িকা — হোক তা তার মৃত্যুকালীন আর্তি!

দিল্লী শহরে— এই তো সেদিন — পথে পথে নাটক করে বেড়াত একটি প্রাণবন্ত তরুণ। জন্মসূত্রে মুসলমান। আহাম্মকটা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। মার্কস, এংগেল্‌স্‌, লেনিন, মাও-এর ভক্ত। মানে, ওঁদের নাম নিয়ে ইলেকশন জিতে দু-পয়সা কামানোর মতলবে কম্যুনিস্ট হয়নি। সাচ্চা সাম্যবাদী। বোঝ বখেড়া! কী দরকার তোর এই চরম অসাম্যের দেশে সাম্যবাদ প্রচার করা? পড়িলিখি ইনসান! Rights to Perform নামে একখান্‌ কিতাব লিখেছে। অংরেজিতে। পড়ে দেখ — কী দারুণ বিদ্যে! লেকিন পোষ মানল না! পোষ মানলে পার্টি থেকে সব কিছুই দেওয়া যেত! তা শুনল না গোঁয়ারটা! তাই একদিন ওর পথনাটকের মাঝখানে ট্রাকে চেপে হামলা করল একদল পোষা গুণ্ডা। শাসকদলের গেস্টাপো বাহিনী। পথনটুয়ার তাজা খুনে ভেসে গেল দিল্লীর রাজপথ! কে যে গুলিটা চালিয়েছিল তা জানা গেল না — লেকিন সফদর হাশ্‌মিকে কেন জান দিতে হলো তা কি আমরা সবাই বুঝতে পারিনি? বুঝেছি — মুখ ফুটে বলবার সুযোগ পাইনি, এই যা! সবাই কি সে সুযোগ পায়, শাবানা আজমী-র মতো? তাই মুখ বুজে সয়ে গেছি!

ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।



ধরুন, মাতঙ্গিনী হাজরা। শুধু ঝাণ্ডাই ছিল তাঁর হাতে, ডাণ্ডা নয়। তাঁকে কে গুলিটা করেছিল সেই বেয়াল্লিশের আন্দোলনে? তার নামটা আমরা জানি না; কিন্তু কোন্‌ নেপথ্য খলনায়ক গদি হারানোর ভয়ে কুত্তাটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল তা কি আমাদের জানতে বাকি?

আবার, এই তো সেদিন হাজরা পার্কে। অহিংস অসহযোগীর ভূমিকায় এগিয়ে আসছিল একটি মেয়ে — তার হাতেও ছিল সেই তে-রঙা ঝাণ্ডাটাই। সহস্র দর্শকের চোখের সামনে কে যেন চিৎকার করে উঠল। এই তো পেয়েছি! এবার? পালাবি কোথায়?

নিরস্ত্র মেয়েটি হুবহু মাতঙ্গিনী হাজরার মতো হাজরা পার্কে পুকার দিয়ে উঠল: বন্দেমাতরম্‌!

ভাড়াটে গুণ্ডার ডাণ্ডা নেমে এল ওর মাথায়। লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি — না, মাতঙ্গিনী নয়, মমতা — রক্তের ধারায় ভেসে গেল রাজপথ! 'গব্বার সিং' সুযোগ বুঝে মাজা থেকে বার করল তার আনলাইসেন্সড রিভলভারটা — যেটা 'হিজ হাইনেসের' অনুমতিসাপেক্ষে তাকে আগেই সরবরাহ করা হয়েছিল। কিন্তু ভবানীপুর থানার সেই পুলিস ইন্সপেক্টরটি (কী দুঃখের কথা! তার নামটাও কিন্তু ইতিহাসে লেখা থাকবে না) ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা না দিলে পাতিয়ালার নাটকটার — অথবা হাজরা পার্কে মাতঙ্গিনী হাজরার নাটকের 'রিপীট শো' এভাবে মাঝপথে থেমে যেত না! সফদর হাশমির মতো মমতাও ক্ষমতার শিকার হত।

অনারেব্‌ল ফিট্‌জপ্যাট্রিক বিলাতে ফিরে গেছেন। তা যান, এবারেও জোর তদন্ত হলো। কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থা নয়। এ রাজ্যে তা হয় না — রাজ্য পুলিশ জোর তদন্ত চালালো। দীর্ঘদিন বিচারও চলল, বোধ করি এখনো তার মামলার দিন পড়ছে; কিন্তু অপরাধীরূপে কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি! তা না যাক, এবারেও কোন্ নেপথ্যচারী কী খোয়াবার ভয়ে গন্ধার সিংকে লেলিয়ে দিয়েছে তা কি আমাদের জানতে বাকি?

☆ ☆ ☆

'তামাম ন-শুদ'

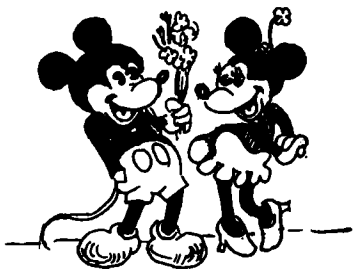


নারায়ণ সান্যালের প্রকাশিত গ্রন্থ (ডিসেম্বর 1992)

[বিষয়ভিত্তিক]

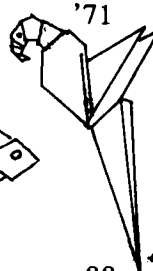
[প্রথম সংখ্যাটি ক্রমিক, শেষ সংখ্যা দুটি প্রথম প্রকাশকালের নির্দেশক।
প্রথম-সংখ্যার পূর্বে তারকাচিহ্নের সঙ্কেত: আমাদের প্রকাশনা।
[† চিহ্নের সঙ্কেত : পাওয়া যায় না]

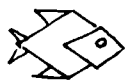
(1) শিশু ও কিশোর সাহিত্য



86 গাছ-মা '91
79 হাতি আর হাতি '89
*66 নাক উঁচু '85
*25 কালোকালো '71
*67 ডিজনেল্যান্ড '85
55 অরিগামি '82
51 কিশোর অমনিবাস '80
26 শার্লক হেবো '71







(2) সদ্যসাক্ষর সাহিত্য

† 4 গ্রাম্যবাস্তু '56
† 5 পরিকল্পিত পরিবার '57
† 8 দশেমিলি '59

(3) না-মানুষ আশ্রয়ী





*76 না-মানুষের কাহিনী 88
*57 না-মানুষের পাঁচালী '83
*60 রাস্কেল '84
*50 তিমি-তিমিঙ্গিল' 79
*30 গজমুক্তা '73
*74 না-মানুষী বিশ্বকোষ (এক) '88
*83 না-মানুষী বিশ্বকোষ (দুই) '90



(4) বিজ্ঞান-আশ্রয়ী

*32 বিশ্বাসঘাতক '74
33 হে হংসবলাকা '74
39 অবাক পৃথিবী '76
*38 আজি হতে শতবর্ষ পরে '76

(5) চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

19 অজন্তা অপরূপা '68
29 কারুতীর্থ কলিঙ্গ '72
52 ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন '80
56 লা-জবাব দেহ্‌লী অপরূপা আগ্রা '82
*63 রোদ্যাঁ '84
*71 প্রবঞ্চক '87
61 Immortal Ajanta '84
'82 Erotica in Indian Temples







(6) ভ্রমণ-সাহিত্য

*11 দণ্ডকশবরী '62
*16 পথের মহাপ্রস্থান '65
*27 জাপান থেকে ফিরে '71

(7) স্মৃতিচারণধর্মী

*41 পঞ্চাশোর্ধ্বে '76
*64 ষাট-একষট্টি '84
*80 আবার সে এসেছে ফিরিয়া '89



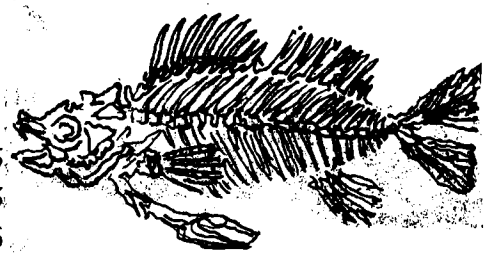
(8) মনোবিজ্ঞান-আশ্রয়ী

*18 অন্তর্লীনা '66
*20 তাজের স্বপ্ন '69
* 9 মনামী '60

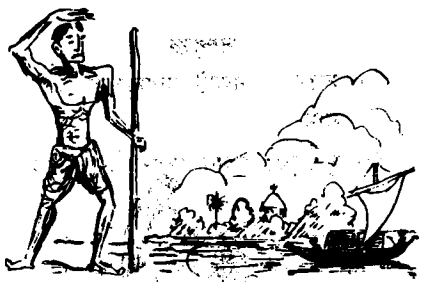


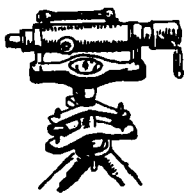
(9) গোয়েন্দা কাহিনী

*34 সোনার কাঁটা '75
*35 মাছের কাঁটা '75
*42 পথের কাঁটা '76



*46 ঘড়ির কাঁটা '78
*47 কুলের কাঁটা '78
*68 উলের কাঁটা '86
*77 সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা '89
*72 অ-আ-ক-খুনের কাঁটা '87
*84 কাঁটায় কাঁটায় (এক) '90
*85 কাঁটায় কাঁটায় (দুই) '90







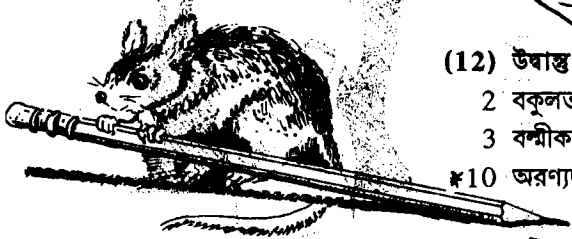
(10) প্রয়োগবিজ্ঞান

* 6 বাস্তুবিজ্ঞান '59
12 Handbook of Estimating '80
54 গ্রামের বাড়ি '80
76 গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা '80



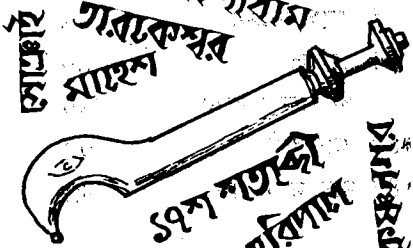
(11) গবেষণাধর্মী

* 22 নেতাজী-রহস্য সন্ধানে '70
43 চীন-ভারত লঙ-মার্চ '77
53 পয়োমুখম্ '87



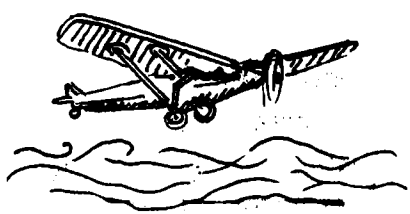
(12) উদ্বাস্তু-সমস্যা সংক্রান্ত

2 বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প '55
3 বন্মীক '55
*10 অরণ্যদণ্ডক '61



(13) ইতিহাস-আশ্রয়ী/ঐতিহাসিক

14 মহাকালের মন্দির '64
48 আনন্দস্বরূপিণী '78
*69 লাডলিবেগম '86
*82 রূপমঞ্জরী (এক) '90



(14) জীবন-আশ্রয়ী

* 23 আমি নেতাজীকে দেখেছি '70
31 আমি রাসবিহারীকে দেখেছি '73
*49 লিন্ডবার্গ '78

(15) দেবদাসী-সম্পৃক্ত

58 সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম '83

59 সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় '84





(16) নাটক

† মুশকিল আশান 54

(17) সামাজিক উপন্যাস

7 ব্রাত্যে '59

13 অলকানন্দা '63

17 সত্যকাম '65

*15 নীলিমায় নীল '64

*21 নাগচম্পা '69

*24 পাষণ্ডপণ্ডিত '70

28 আবার যদি ইচ্ছা কর '72

*36 অশ্লীলতার দায়ে '75

*37 লালত্রিকোণ '75

*45 প্যারাবোলা স্যর '77

65 মিলনান্তক '85

70 পূরবৈয়াঁ '86

75 অচ্ছেদ্যবন্ধন '88

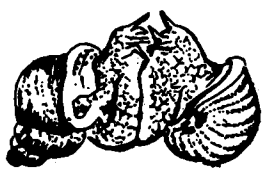
81 ছোঁবল '89

78 ছয়তানের ছাওয়াল '89

*88 আম্রপালী '92

*87 মান মানে কচু '92





(18) প্রবন্ধ-সংকলন

*89 লেঅনার্দোর নোটবই এবং... '92

90 স্বর্গীয় নরকের দ্বার এবং... '92

এমন দুর্দিনে অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকে একদল ভাগ্যবানের দিকে — ঈশ্বরের করুণায় যাঁরা দশের মধ্যে দশম। তাঁরা শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সাংবাদিক। নীল-বাঁদরের অত্যাচার দেখে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু, মাইকেল, ফাদার লঙ, হরিশ মুখুজ্জে। অথচ আজ ? লাল বাঁদর-সবুজ ঝাঁদর-গেরুয়া বাঁদরদের অত্যাচার দেখে এগিয়ে আসছেন না কোন শিল্পী-সাহিত্যিক। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত। হয় দক্ষিণপন্থী, নয় বামপন্থী ।

দিল্লিতে সফদার হাশমি খুন হলে প্রথম দল বুদ্ধি'জীবী চোখ বুঁজে থাকেন, হাজরা-পার্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠেঙিয়ে ধরাশায়ী করতে দেখলে মৌনব্রত পালন করেন দ্বিতীয় দল 'বুদ্ধ'জীবী ।

★ ★ ★

"ওটা কখনই শেষ-কথা হতে পারে না : 'এমনটা তো হয়েই থাকে!' শেষ-কথা : না ! এমনটা হবার নয়। এমনটা আমরা হতে দেব না! পারেন তো সে-কথাই বলুন । জোর গলায় । রাস্তায় নেমে এসে। বলান এই অধম বৃদ্ধকে দিয়ে । তাহলে এই উনসত্তর বছর বয়েসে সে বৃদ্ধ মহব্বতের কিস্‌সা লেখার ধাষ্টামো ত্যাগ করে গুটি-গুটি পথে নেমে আসবে। যেমন এসেছিলেন 'গরম হাওয়া' ছায়াছবির শেষদৃশ্যে প্রফেসার বলরাজ সাহানী ।

"কিন্তু একটা শর্ত আছে ।

"আপনাদের মিছিল দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী অর্থাৎ কায়েমীস্বার্থপন্থী হলে চলবে না। আপনাদের হতে হবে : সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী ! যতদিন আপনারা সে-ব্যবস্থা করতে না পারছেন ততদিন ক্যাডারপুত্রস্নেহে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এই নৈরাজ্যে 'একঘরে বিকর্ণের' ছোট্ট ভূমিকাতেই এ-বৃদ্ধকে অভিনয় করতে দিন না।"